যুগপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের পঞ্চসপ্ততিতম শুভ জন্মজয়ন্তী স্মরণে

ভবমুখে

ফাল্গুন ● তেরশ বিরাশি ● উনত্রিংশ বর্ষ ● শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ● সিউড়ী

Anandamayee Ashram Library
Bhadaini, Varanasi

শ্রীশ্রীসত্যানন্দ
ফাল্গুন : একাদশ সংখ্যা

জন্ম জয়ন্তী
উনত্রিংশ বর্ষ : তেরশ' বিরাশি

সূচীপত্র

গান	৩৯৩	শ্রীশ্রীঠাকুর
নাম-শক্তি	৩৯৪	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী
ঠাকুর	৩৯৬	স্বামী নির্ব্বেদানন্দ
দয়ার তোমার নাইকো শেষ	৩৯৮	সাধনাপুরী
সেবা	৪০০	স্বামী মৃগানন্দ
অভিনয়ও সত্য	৪১০	স্বামী বোধানন্দ
আমার সত্যব্রত দাদা	৪১২	স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (বেলানগর)
কুশল তো গোবর্ধন ?	৪১৪	ব্রহ্মচারী গদাধর চৈতন্য
সত্যানন্দ-বাণী	৪২০	স্বামী নির্বেদানন্দ
পাথেয়	৪২৫	শান্তি দেবী
গোপন লীলার ঠাকুর	৪২৬	শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মহান অভ্যুদয়	৪৩০	স্বামী রামানন্দ
ঠাকুর সত্যানন্দ	৪৩৩	শ্রীগোপাল দাস কাব্যভারতী
তোম্যার ও নিটোল বুকে	৪৩৪	স্বামী অরুণানন্দ
অপরূপ দিব্য স্মৃতি	৪৩৫	শ্রীকামাখ্যা নাথ সেনগুপ্ত
সত্যানন্দ	৪৩৬	শ্রীকালীপদ বাগচী
ঈদ ও বাকরা ঈদ	৪৩৭	মৌলভী আব্দুর রহীম
আবার তুমি এসো	৪৩৮	শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ
গণ্ডিতপুর ঘুরে এলাম	৪৩৯	শ্রীকিশলয় ঘোষ
সত্যানন্দ স্মরণে	৪৪১	শ্রীশুচিতা ব্যানার্জী
আমি তোমার মাঝারে হারিয়ে যেতে চাই	৪৪২	শ্রীমতী মায়া দত্ত
অলৌকিক	৪৪৩	শ্রীশরণাপুরী
দীনকে প্যারে	৪৪৫	শ্রীশুভাপুরী
শ্রীশ্রীঠাকুর	৪৪৬	গৌতম চ্যাটার্জী
সৎসঙ্গ	৪৪৭	স্বামী হীরানন্দ
যুগের সারথি	৪৫২	যোগদাপুরী

ভারতের মোটর পার্টস্ ব্যবসায়ে
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

= লিমিটেড =

রেজিস্টার্ড অফিস—১৬৫, শরৎ বোস রোড
কলিকাতা-২৬

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড
কলিকাতা—১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটি

DE LUXE

ORPHAN'S TEA

For

Health & Economy

ORPHAN TEA SYNDICATE

133, Cornwallis St. Shyambazar

Phone : 55-2704

যুগে যুগে যার আসা

স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব জীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব আলেখ্য এই গ্রন্থখানি। গ্রন্থটী শুধুমাত্র জীবন কাহিনী নয়, জীবন বর্ণনাচ্ছলে জীবন আলোচনা এবং ভাষ্য।

[২য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত] মূল্য—সাত টাকা।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D. RATAN & Co.
Photographers
PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST, CAL. 6
PHONE : 34-3711

★

ডি, রতন এণ্ড কোং
ফটো
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪-৩৭১১
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ-৬

ধ্যানের আবছায়া	৪৫৬	আনন্দ
সাধক সত্যানন্দের কাব্যপ্রতিভা	৪৫৭	শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক
শ্রবণ মঙ্গল	৪৬৬	স্বামী উমানন্দ
শুধু গোপালের জন্য	৪৬৮	শ্রীসুখেন্দু মল্লিক
পুষ্পাঞ্জলি	৪৬৯	শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী
চিরন্তন	৪৭০	সন্ন্যাসিনী শ্রীঅর্চ্চনা মা
লোকে লোকে	৪৭২	শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত
কাব্য—সেকাল ও একাল	৪৭৪	স্বামী মহানন্দ
ভাববার সময় এসেছে	৪৭৭	স্বামী অরুণানন্দ

মানিক বনের বুলবুলি :

আশীর্ব্বাণী	৪৮১	শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব
সত্যানন্দ স্বামী	৪৮১	স্বপনবুড়ো
সত্যব্রত	৪৮২	প্রবুদ্ধ
প্রার্থনা	৪৮২	শ্রীকৃষ্ণকুন্তল বসু
খেলার ঠাকুর—ছোটদের	৪৮৩	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী
চিঠি	৪৮৬	বড় ময়ূর
ফুলের মত হও	৪৮৮	শ্রীমনকুমার সেন
শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ—সন্তজনের উপলব্ধিতে	৪৯০	স্বামী মৃগানন্দ
অশ্রু	৪৯২	ডাঃ পতিতপাবন মিত্র
গান ও স্বরলিপি	৪৯৪	কথা : শ্রীঅর্চ্চনাপুরী সুর ও স্বরলিপি } শ্রীপ্রবীর মজুমদার

Advent of Immortality (English rendering of Sri Archana-puri's Bengali poem "Amrita Avyudaya")	91	Sri Jyotsna Nath Mullik
World Psychology	92	Sreemat Swami Satyananda Deva
Thakur Swami Satyananda As A Writer of English Verse	95	Dr. S. P. Sengupta

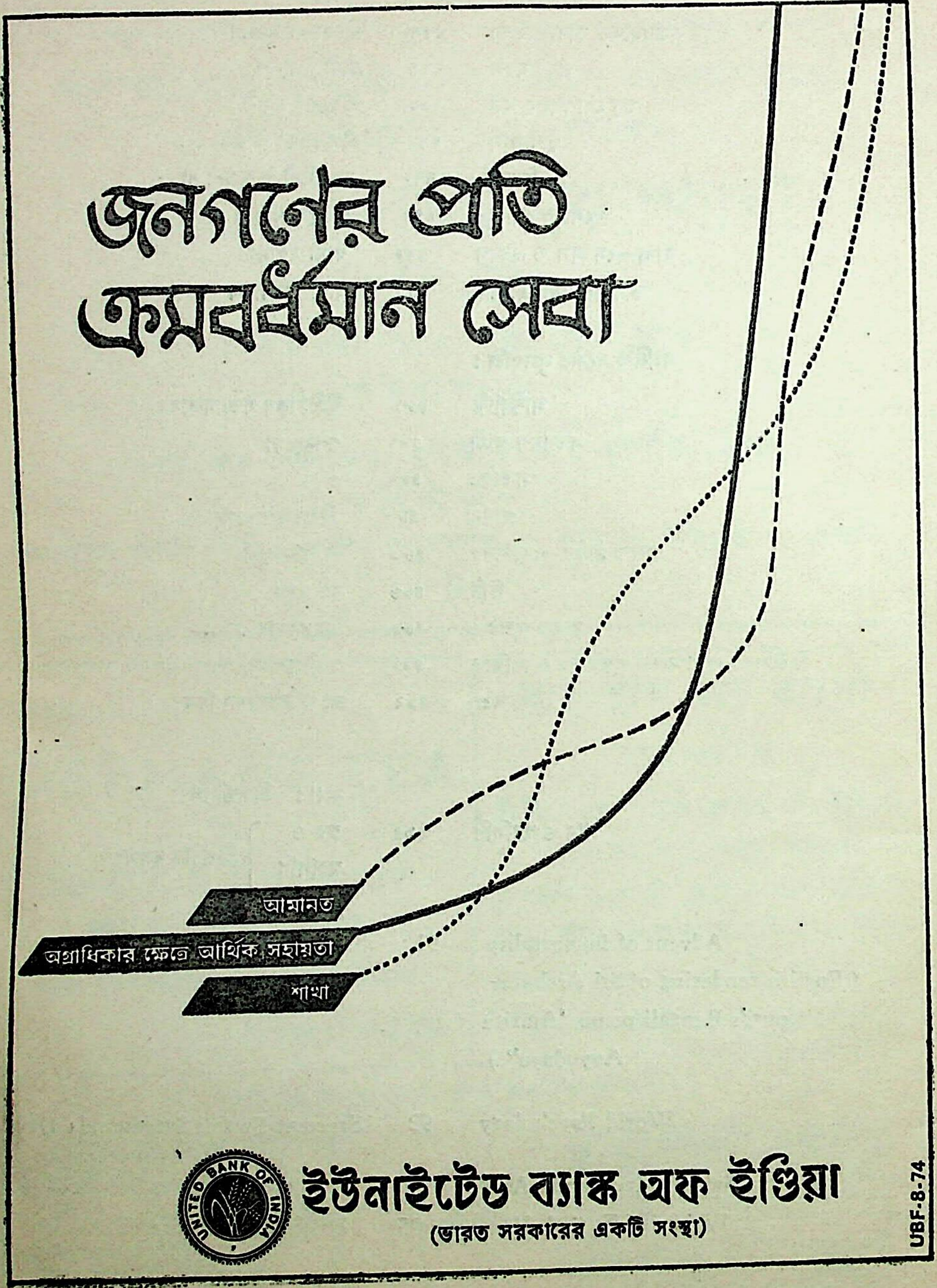
জনগণের প্রতি
ক্রমবর্ধমান সেবা
আমানত
অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা
শাখা
UNITED BANK OF INDIA
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
UBF-8-74

Pilgrimage to Udipi, Sringeri and Kollur	100	Sri P. S. Rao
Eternal (English rendering of Sri Archana-puri's Bengali poem "Chirantan")	105	Sri Jyotsna Nath Mallik
Homage to Swami Satyanandadev	107	Principal K. C. Karmakar
Swami Satyananda and His works	110	Swami Neelananda
Bammera Bhakta Potana	112	V. Ganesh Rav
We Have Seen Him	115	S. N. Sanyal
Satyanandadev	117	Prasad
Sri Satyanandadev Wins	118	Sri Asit Biswas
Spiritual Talks	120	From R. L. Goel's Diary.

* আশ্রম পর্ব্ব পঞ্জী : চৈত্র, ১৩৮২

১৬ই মার্চ	২রা	চৈত্র,	মঙ্গলবার	—শ্রীশ্রীঠাকুরের দোল যাত্রা ও পূর্ণিমার হোম।
২৬শে "	১২ই	"	শুক্রবার	— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
৩০শে "	১৬ই	"	মঙ্গলবার	— অমাবস্যার হোম।
৭ই এপ্রিল	২৪শে	"	বুধবার	— বাসন্তী পূজা।
৮ই "	২৫শে	"	বৃহস্পতিবার	—অন্নপূর্ণা পূজা।
৯ই "	২৬শে	"	শুক্রবার	—রামনবমী।
১১ই "	২৮শে	"	রবিবার	—একাদশীর উপবাস ও হোম।
১৩ই "	৩০শে	"	মঙ্গলবার	— সন্ধ্যার পর বর্ষশেষের হোম।

* বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।

GRAM : DISWASHING   PHONE : Office : 24-1236, Works: 55-1738

PELICAN ENGINEERS

FABRICATORS OF STAINLESS STEEL CHEMICAL PLANTS,
PHARMACEUTICAL & FRUIT PRESERVATION EQUIPMENTS.

4, Hartford Lane, Calcutta-16

Works : 161, UPPER CHITPUR ROAD
Calcutta-5

মডার্ন ডেকরেটর্স

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের
প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

১১এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জী স্ট্রীট • কলি-৬ • ফোন- ৫৫-২৫৪৯, ৫৫-৬৫৬৫

ভক্তগণের বহুদিনের প্রতীক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত সদ্য প্রকাশিত

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের জীবনী

করুণাবতার

শ্রীশরণাপুরী   মূল্য : ১১'০০

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলি—৩৬

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺বামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৯

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

—•:•:•—

৮৭ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৩৫-৪১২৪, ৩৫-৪১২৫

॥ স্বত্বাধিকারী ॥

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র, মিলবস্ত্র, সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুইঙ্কিল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা—৭

ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD, BELGHARIA.
CALCUTTA-56

Phone : 58-1575

ফোন : ৩৪-৭৯৫৬

এন, কে, স্পোর্টস

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

যাবতীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং কাপ 'শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা
বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

Be Like A Flower
—Sree Sree Thakur Satyananda

"The Complete Garden Shop"

Sutton & Sons. (India) Pvt. Ltd.

13D, Russell Street,
Calcutta-71

Seeds ★ Plants ★ Fertilizers ★ Pesticides ★ Garden Tools
★ Books ★ Garden Advisory Service ★

Phones { 24-0422, 24-0525, 24-4030

G. P. S.—GOD PURITY SERVICE
—Sree Sree Thakur Satyananda

MATERIAL CARRIERS

29/1, PHEARS LANE,
CALCUTTA-700073
Phone : 34-6784

Everybody is moving on in pursuit of his own satisfaction. Try to find out this 'own' self and you will discover 'Him'

—Sree Sree Thakur Satyananda

KELVIN JUTE COMPANY

TITAGARH,
24 PARGANAS.

Phone : BARRACKPORE 95 & 771
(53 Exchange)

Q. *What is the say for this age ?*

Ans. **Purity is the say. If you acquire purity you obtain everything.**

—Sree Sree Thakur Satyananda

With the Compliments

of

VOLTAS LIMITED

8 Netaji Subhas Road. Cal-1

8, Netaji Subhas Road

Calcutta-700001

Space Donated by :

Bengal Timber Corporation

TIMBER MERCHANTS, GOVT. CONTRACTORS
AND GENERAL ORDER SUPPLIERS

Head Office : 115/8/1, Bidhan Sarani, Shyambazar, Calcutta-700004.

Stock-Yard : Noapara, Barasat, 24 Parganas (North Zone)

Phones : { Head Office : 55-4092
Stock Yard : 617-469

With best Compliments :

MANUFACTURERS & ENGINEERS

D. GHOSH & SONS

143/1, N. S. DUTTA ROAD,
HOWRAH-711101.

WE ALSO HELP
BUILD UP A NEW BENGAL

★ We finance the poor farmer in his cultivation through Co-operatives

★ We finance Engineers' Co-operatives

AND

★ Industrial Co-operatives to provide gainful employment to the unemployed Youth of Bengal

★ We assist transport workers' through Co-operatives

★ We also help hold the price line through financing of Consumers' Co-operatives

WE ARE HERE TO SERVE BENGAL EVEN WITH OUR SMALL MEANS.

K. D. Sengupta, M. L. A.
Chairman

West Bengal State Co-operative Bank Limited
24-A, WATERLOO STREET, CALCUTTA-700001.

FOR BETTER HEALTH AND MORE MILK FEED YOUR COWS AND BUFFALOES

EPIC

EPIC ESSENTIAL FOR POULTRY　INDISPENSABLE FOR CATTLE

Manufactured at : **Kalyani Feed Milling Plant**

West Bengal Diary and Poultry Development Corporation Ltd
(A State Governmet Undertaking)

16, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001.

Pray for the Welfare of all
—Sree Sree Thakur Satyananda

M/s. Sanker Roadways & Co.

42, Pathuriaghata Street, Calcutta-700006.

Phone { 33-0367
33-3564

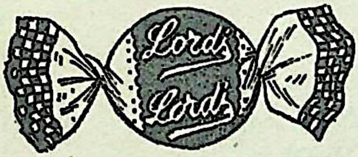

লজেন্স ও টফি

জেম্‌স্‌ লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ কলিকাতা-১

JL-24B

চাষ বাস ও ঘর গৃহস্থালীর নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে

এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

আধুনিক প্রথায় চাষ ও আরো বেশী ফলনের জন্য পাবেন :

উন্নত মানের বীজ, রাসায়নিক সার, জৈব সার, রোগ ও কীটনাশক ঔষধ, মাটি সংশোধন করার সরঞ্জাম, জেটর ট্রাক্টর, কিউবোটা পাওয়ার টিলার, সুজলা পাম্প, হস্ত চালিত বেনাগ্রো স্পেয়ার, বেনাগ্রো পাওয়ার থ্রেসার

ঘর গৃহস্থালীর দৈনন্দিন সামগ্রীর মধ্যে পাবেন :

ফলজাত জিনিষের বিভিন্ন রকম মুখরোচক খাবার এবং সূর্যমুখী ও তিলের তেল।

আমাদের অগ্রগতিতে আপনাদের শুভেচ্ছা কামনা করছি।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

২৩ বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

গ্রাম : এগ্রিনপুট

ফোন : ২২-২৩১৪
(৩টি লাইন)

N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of :

Alloy Steel Castings

SUCH AS

NICKEL CHROME STEELS
HEAT RESISTING STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC MANGANESE STEELS
MADE IN
INDUCTION FURNACE

ALSO

FINEST GREY IRON CASTINGS
HEAT RESISTING ALLOY IRON
HIGH DUTY IRON
THIN WALLED CASTINGS
GRADED IRON CASTINGS
OF
ALL SPECIAL GRADES & SIZES

●

QUALITY GUARANTEED

Head Office :
N. G. Chakrabarti & Co.,
3D, Nandy Street,
Calcutta-29
Phone : 47-5248

Works :
K-65, Howrah Industrial Estate,
P.O. Balitikuri
Howrah, (*West Bengal*)
Telephone : 66-4843

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মবাসরে শ্রীঠাকুরের অর্ঘ্য

ভাবমুখে

শ্রীসত্যানন্দ ৭৫তম জন্মজয়ন্তী

উনত্রিংশ বর্ষ	তেরশ' বিরাশি	ফাল্গুন	একাদশ সংখ্যা

গান

শ্রীশ্রীঠাকুর

চন্দিম বর্ষিত
নন্দন নৃত্যে
গদাধর গোপাল
জাগো এ চিত্তে ॥

অম্বরে বিম্বিত মুক্তার মুক্তি
পদ্ম প্রভাতে এলো শিশির নেত্রে
দুকূল উচ্ছল অন্তর গঙ্গা
পুষ্পল হোক দিঠি মর্ত্তের বিত্তে ॥

নূপুর চুম্বিত গুণ্ঠিত কান্তি
চেল বিলম্বিত চারু নিতম্বে
চিত বিড়ম্বিত বাহুর বৃন্তে ॥

26-1-64.

নাম-শক্তি

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

শ্রীঠাকুরের বেদছন্দা মুখে নাম সম্বন্ধে আমরা পাই—"এক একটী বাসনার বিরুদ্ধে নামকে প্রয়োগ করতে হয়। নামের শক্তি বাড়াবার জন্য নামকে প্রথমে বাইরের বস্তুর ভিতর প্রয়োগ ক'রে পরে ভিতরে প্রয়োগ ক'রতে হয়।" এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে বাসনার জড় কেন মরে না, তার মূল উৎপাটন করা কেন এত কঠিন। মনে হয়, বাসনার আদি বীজ ব্রহ্মের সিসৃক্ষা মুখে। আমি এক আছি, বহুরূপে বিলসিত হব। তাই সৃষ্টি যতক্ষণ বিলাস মুখে রয়েছে ততক্ষণ সমষ্টিগত ভাবে বাসনার নিবৃত্তি হবে না। তার নিবৃত্তি হ'তে পারে, বিরাট ব্রহ্ম মনে আবার যখন বহু হ'তে একে ফিরে আসার ইচ্ছে হবে, সেই মহাপ্রলয় লগ্নে। বিরাট মনের বাসনাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা রূপে ব্যষ্টির মনে স্থূল হ'তে স্থূলতর রূপে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্যষ্টি মনে তাই ব্যক্তিগত ভাবে বাসনার মূল উৎপাটন করা অতীব কঠিন এবং সেখানেও প্রয়োজন বিরাট মনের ইচ্ছা। আমাদের ক্ষুদ্র অহং দিয়ে তাকে বিনষ্ট ক'রতে গেলে বিনষ্ট তো হবেই না, উপরন্তু সে অবদমিত বাসনা বিপরীত ক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রে মনকে আরও অধিক মাত্রায় বিপর্যস্ত ক'রে তুলবে। তাই ঠাকুর বাসনাকে বিনষ্ট করার একটী সহজ পন্থা দিলেন—নামের আশ্রয় গ্রহণ করা। নাম এবং নামী অভেদ, তাই নামের আশ্রয় গ্রহণ করা মানে নামীরই আশ্রয় গ্রহণ করা। মূল উৎপাটন ক'রতে হ'লে, মূলের উৎপত্তি স্থলকেই প্রার্থনা ক'রতে হবে। তাঁরই দেওয়া বাসনা যখন তাঁকে ভুলিয়ে দিচ্ছে, তখন তাঁকেই প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় কি? অহংকার দিয়ে জোর না ক'রে শরণাগতির জোরকেই আঁকড়ে ধর'তে হবে। আর নামই তার একমাত্র পথ। কলিযুগে এই নাম হচ্ছে জীবের একমাত্র গতি। নাম ছাড়া জীবের আর দ্বিতীয় রক্ষক কেউ নাই। নামই অন্তরের বাসনা জালকে ছিন্ন করার অস্ত্র। আবার বহিরাগত বাসনার আক্রমণকে প্রতিহত করার ঢাল। নামের জোরে বাসনাকে বিনষ্ট করার অর্থ তাঁর ওপর ভার দেওয়া। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নামই দিয়ে গেলেন কলির জীবকে—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

আমাদের ঠাকুর তাঁর "নাম ও কম্পন" তত্ত্বে বলেছেন, "সাধকের উচিত হ'চ্ছে মনরূপ cyclotron যন্ত্রের সাহায্যে সংস্কাররূপী atomকে ধ্বংস করা। মহাশক্তিমান ইষ্ট নাম হ'চ্ছে এই মন-cyclotron-এর প্রয়োগ শক্তি। নামই মনরূপী cyclotron যন্ত্রটিকে পরিচালিত করবে সংস্কারকে ধ্বংস ক'রতে—যে সংস্কার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে মস্তিষ্ক এবং শরীরের প্রতিটি কোষে বা অণু পরমাণুতে। এই সংস্কার হ'চ্ছে জীবের বন্ধনের কারণ। নামশক্তির প্রয়োগে এটী নির্মূল হ'লে সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপে জীব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।" এখন প্রশ্ন আসে, বাসনার বিরুদ্ধে নাম শক্তির প্রয়োগ বিধি কি রূপ? শ্রীঠাকুর বলতেন, "ধর, তোমার সামনে একটি রসগোল্লা রাখা আছে। তোমার প্রচণ্ড লোভ হ'চ্ছে সেটী খাবার, বিশেষ ক'রে একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রবে যখন তুমি রসগোল্লার লোভ পরিত্যাগ ক'রতে চাইছ, তখনি সে লোভ তোমায় পেয়ে বসবে। সে লোভকে প্রতিহত ক'রতে সাধককে তখন নিতে হবে নামের আশ্রয়। অর্থাৎ প্রথম রসগোল্লাটির দিকে চেয়েই নাম সুরু করবে, জপ তীব্র হ'তে তীব্রতর বেগে চলবে অন্তরে, তার সঙ্গে থাকবে প্রবল ইচ্ছাশক্তি, যেন নামশক্তি প্রবলতর হ'য়ে রসগোল্লার ভেতর যে আকর্ষণ সত্তা আছে তাকে ভেঙে চুরমার ক'রে দেয়। কিছুক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত করলে দেখা যাবে, বাসনা যেন স্তিমিত হ'য়ে আসছে। তখন চোখ বন্ধ ক'রে নামশক্তিকে প্রয়োগ ক'রবে অন্তরের বাসনার প্রতি। অর্থাৎ তখনও চলবে তীব্র বেগে জপ এবং প্রার্থনা। দেখবে কখন ধীরে ধীরে বাসনা অন্তর্হিত হয়েছে।"

শ্রীঠাকুরের এই প্র্যাক্টিক্যাল নাম প্রয়োগ বিধিটি সমস্ত বাসনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য বাসনার এমন শক্তি যে, সব সময় স্থূল উদ্বোধক যে কিছু থাকবে এমন কথাও নয়। সাধকের জীবনে এমন সময়ও আসে, যখন কোন উদ্বোধক হয়ত নাই অথচ বাসনা তীব্র আকার ধারণ ক'রে স্থূল উদ্বোধক খুঁজে নেয়। সে ক্ষেত্রে সাধককে খুব সাবধানে থাকতে হবে এবং নাম শক্তিকে তীব্র বেগে জাগিয়ে তুলতে হবে। তার সঙ্গে প্রার্থনাটী যুক্ত ক'রে ধ্বংস ক'রতে হবে বাসনাকে। কবীরজীর একটা বাণী ঃ "কাম ক্রোধ মদ ও লোভের সহিত এই দেহ ক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ সুরু হ'য়েছে। শীল এবং সত্য ও সন্তোষের রাজ্য মধ্যে এই যুদ্ধ চলছে। নাম খড়্গ সেখানে খুব ধ্বনিত হচ্ছে। কবীর কহেন, যদি কোন বীর যুদ্ধ ক'রতে অগ্রসর হয়, তাহলে সেই কাপুরুষের ভিড় এক নিমেষে পলায়ন করে।" অতএব ভক্তের সাধন রাজ্যে একমাত্র অস্ত্র হ'চ্ছে নাম। নামই ভক্তকে সাধন রাজ্যে রক্ষা করে। তাই ঠাকুরও নামকে নিয়ে একটি বিশেষ সাধন নির্দ্দেশ দিলেন।

এখন আর একটী প্রশ্ন ওঠে, ঠাকুর বললেন নামের শক্তি বাড়ানোর কথা। নাম তো স্বয়ং শক্তি-স্বরূপ, তবে সাধকের নাম জপের ওপর কেন নির্ভর ক'রবে তার শক্তির বাড়া কমা ? এর অর্থ মনে হয়, যেমন জলের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি রয়েছে, সেটীতে বাইরে থেকে তীব্র ঘূর্ণনের বেগ সৃষ্টি করে জলের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়। সাধকের তীব্র বেগে জপের মধ্যে ঐ একই পদ্ধতি। সাধকের অন্তরের সঞ্চিত গুরু শক্তির দ্বারা মন্ত্রস্থিত গুরু শক্তিকে আরও অধিক ক্রিয়াশীল ক'রে তোলা। এক কথায় শক্তি দিয়েই শক্তি জাগানো। সেজন্য ঠাকুর আরও বহু জায়গায় সাধককে নাম করা বা নামকে অন্তরে বসিয়ে নেওয়ার নানা পদ্ধতি বলেছেন। যেমন, "সর্বদা নাম হবার একটা উপায় হ'চ্ছে কিছুটা সময় নামকে মুখস্থ করতে হয়।" মুখস্থ করার অর্থ নামটিকে অন্তরে সব সময়ের জন্য গেঁথে নেওয়া, বার বার গভীর স্মরণের ফলে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা।

গুরু শক্তি যুক্ত চেতন নাম সাধারণ ভাবে হয়তো ভুল হয় না, কিন্তু আধার বিশেষে নামের অকৃপা হওয়া সম্ভব। ঠিক ঠিক যদি নামকে মর্য্যাদা না দেওয়া যায় তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই নাম ভুল হ'য়ে যায়। ভক্তি শাস্ত্রে 'নামাপরাধ' ব'লে একটি কথা আছে। নামের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন মহা অপরাধ বলেই গণ্য হয়। ইচ্ছা মাত্র নাম স্মরণ হওয়া আর আপনিই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নাম স্রোত অন্তরে প্রবাহিত হওয়া, দুটীর তফাৎ আছে। নাম নিয়ে অজপা সাধনের চেষ্টা করলে এই নাম কৃপা আপনিই হয়। অতি সুখে এবং অতি দুঃখে নাম ব্যাহত হবার আশঙ্কা। তাই প্রার্থনা ক'রতে হয় নামীর কাছে বা নামের কাছে যে, মন একটা বিশেষ অবস্থায় না পৌঁছন পর্যন্ত যেন এমন কোন সুখ বা দুঃখ না আসে যাতে ইষ্ট নাম ব্যাহত হয়।

নাম শুধু একটি শব্দ মাত্র নয়, নাম চিন্ময়। তাই বৈষ্ণব শাস্ত্রে নাম ব্রহ্মের পূজা প্রচলিত আছে। গোপন ইষ্ট নাম অন্তরে চলবে এবং ঠিক গুরু প্রদত্ত বীজ সম্বলিত ইষ্টনাম ছাড়া শুধু মাত্র নামটী লিখে পূজার স্থানে রেখে নিত্য পূজাদি ক'রতে হবে এই বিধি বহু স্থানে আছে। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেবও নিত্য নামব্রহ্মের পূজার বিধি দিয়েছেন তাঁর সন্তানদের।

সর্বোপরি নাম নামী অভেদ জ্ঞানটী যদি অন্তরে গ্রথিত হ'য়ে যায়, তাহলে নামের চিন্ময় সত্ত্বা যে কী প্রচণ্ড শক্তিতে সাধকের সাধন রাজ্যে স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে, সে কথা সাধারণ মানুষ চিন্তাও ক'রতে পারে না। শ্রীঠাকুর তাই নানা উপায়ে নামের চিন্ময় সত্ত্বাকে জাগ্রত ক'রতে বা উপলব্ধি ক'রতে বার বার বলেছেন। আমাদের ঠাকুরের প্রতিটি সাধন তত্ত্বই প্র্যাকৃটিক্যাল। তিনি নিজে আচরণ করে তাঁর সন্তানদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। নাম ছাড়া এ যুগের মানুষের সহজ পথ আর কিছুই নাই।

★

ঠাকুর

স্বামী নির্ব্বেদানন্দ

কলকাতা হ'তে সিউড়ী গেছি, হঠাৎ একদিন প্রভাকর ব'ললো, "দাদা, একদিন চল আশ্রমে আমাদের ঠাকুরকে দর্শন ক'রবে। খুব আনন্দ পাবে।" শুনেছিলাম নতুন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হ'য়েছে সিউড়ীতে এবং সেখানকারই প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই ঠাকুর এবং তাঁর সম্বন্ধে তাঁরই পিতৃদেবের মুখে শুনেছিলাম অনেক কথা।

সেবার আর যাওয়া হয়নি আশ্রমে, পরের বার সিউড়ী গিয়ে হঠাৎ একদিন বিকেলের দিকে গেলাম আশ্রমের গলিতে, যেখানে সিউড়ীর ছেলে হ'য়েও কখনও যাইনি, পল্লীর কুখ্যাতির জন্য। শুনলাম ঠাকুর উপরে আছেন এবং একটু পরেই নিচে আসবেন। উঠানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রতেই সিঁড়িতে দেখি বাঁ হাতে একটি মৃগ চর্ম্ম নিয়ে গৈরিকাবৃত ঠাকুর দিক্ আলো ক'রে নামছেন—হ্যাঁ "ঠাকুরই" বটে। জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। শুভ্র মর্ম্মর তনু। দেবেন্দ্র লাঞ্ছিত রূপ। আমি প্রায় সম্বিৎ হারা—মানুষ না দেবতা! এক্ষণেই যেন মন গ্রহণ ক'রে নিল "ঠাকুর" ব'লে। এই একটীমাত্র নামেই তাঁকে অভিহিত করা যায়! প্রণাম ক'রলাম চরণে মাথা দিয়ে, বেশ কিছুক্ষণ সঙ্গ ক'রে ফিরলাম আনন্দে ভরপুর হ'য়ে। ক্রমে শুনলাম একটা অখ্যাত দীন ভক্ত হঠাৎ হৃদয়ের আবেগে "ঠাকুর" ব'লে তাঁকে ডেকেছিল এবং সেইক্ষণেই সকলেই অন্তর থেকেই গ্রহণ ক'রেছিল তাঁকে ঠাকুর ব'লে—তখন থেকেই ঠাকুর, ঠাকুর। মুখের ডাকা ঠাকুর নয় বুকে জাগা ঠাকুর। অচিরেই কৃপা লাভ ক'রলাম ঠাকুরের। তারপর বহুবার তাঁর শ্রীমুখে শুনেছি, দেখ, "ঠাকুর" এ যুগে একটাই এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। টেনে বুনে কাকেও ঠাকুর করা যায় না। কিন্তু প্রাণের পরতে পরতে যে নাম গাঁথা হ'য়ে গেছে, চিন্তায় ধ্যানে ও কথনে যে নামের শিহরণ জাগিয়েছে বা জাগায়, সে তো যাবার নয়, তাই ঠাকুর আমাদের কাছে "ঠাকুর" রয়ে গেলেন।

১৯৪১ সালের আশ্বিন মাস—শ্রীশ্রীঠাকুরের ঠাকুমা, যাঁকে ঠাকুর স্বয়ং ও তাঁর ভাইবোনেরা মা ব'লেই ডাকতেন, সেই অশীতিপর বৃদ্ধা সিউড়ীতে প্রভাকরের গৃহে মৃত্যু শয্যায় শায়িতা। মৃত্যু সন্নিকট শুনে ঠাকুর গেছেন ঐ বাড়ীতে রাত্রি ১টার সময়, আমরাও আছি কেউ কেউ। ঠাকুর স্নেহ কোমল কণ্ঠে ব'ললেন, "মা, ঠাকুরকে মনে পড়ছে তো?" পিতা-মহীকে মা নামেই ডাকতেন ঠাকুর ও তাঁর ভাইয়েরা। বলছেন ঠাকুর, "মা, তাঁকে ডাকছিস তো? ভয় নাই, সোজা বেরিয়ে যাবি তীর বেগে তাঁর কাছে।" ক্ষীণ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর এলো—"ঠাকুর আবার কে রে? তুই-ই তো আমার ঠাকুর, অন্য ঠাকুর আমার নাই।" মৃত্যু পথযাত্রিণী, ধর্মে নিষ্ঠাবতী, ধর্মপ্রাণা, আজীবন তপস্বিনী মাতৃকণ্ঠ হ'তে এই কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত আমাদের মনে স্বতঃই প্রতীতি হ'লো এ যেন আমাদেরই হৃদয়ে জেগে থাকা "ঠাকুর" শব্দেরই প্রতিধ্বনি।

সিউড়ীর আশ্রম তখন বেশ বড় হ'য়ে উঠেছে। মায়েদেরও একটি শাখা গ'ড়ে উঠেছে। সেখানে ছোট ও বড় অনেকগুলি মা'ই সংসার ছেড়ে আশ্রমে যোগদান ক'রেছেন। আশ্রমে যোগদানকারী সাধু ব্রহ্মচারীদেরই কন্যা ভগিনী সহধর্ম্মিণীদের দ্বারাই এই মাতৃসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতার স্নেহ, আদর, ভালবাসা, শাসন ও শিক্ষাদানে তাঁর এই ছোট্ট কন্যাগুলিকে মানুষ করে তুলছেন, এমন কি তাদের প্রসাদ গ্রহণের সময় নিজ হাতে প্রসাদের গ্রাস তুলে দেন তাদের হাতে আর তারা আনন্দ কলরোলে গ্রহণ করে ঠাকুরের স্বহস্তে দেওয়া সেই প্রসাদ। এমনি একটা দিনে আমাদের ঠাকুমা শ্রীশ্রীঠাকুরের গর্ভ-ধারিণীদেবী কাশীশ্বরী ঠাকুরের আনন্দলীলা দর্শন করছেন। হঠাৎ তিনি হাত পেতে ব'লে বসেন, "বাবা গোপাল আমাকে দিবি না প্রসাদ, যেমন ছোট্ট মেয়েদের দিচ্ছিস?" ঠাকুর বলেন, "সে কি রে, তুই আমার মা—আর ওরা আমার মেয়ে। পারবি তুই ওদের মতো 'জয় ঠাকুর' 'জয় সত্যানন্দ' ব'লতে?" দ্বিধাহীন নিঃসঙ্কোচ ভাবে ঠাকুমা

বললেন, "জয় ঠাকুর। জয় সত্যানন্দ। এইবার দে বাবা।" মেয়েদের হাসি ও আনন্দ কলরোল—"ঠাকুমা আমাদের দলে ভাই, ঠাকুমা আমাদের দলে।" এরই মাঝে স্নেহে গ'লে ঠাকুর তুলে দিলেন মাতা কাশীশ্বরীর হাতে প্রসাদের গ্রাস।

"ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে।"

কথামৃতমুখে পাই ঠাকুরের কথা—সত্যিই তাই—নিজের মুখে না ব'ললে কার সাধ্য তাঁকে মানে। গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে", বাইবেল মুখে ভগবান ঈশামসী বললেন, "I and my Father are one." শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "এবার যে এসেছে সে স্বয়ং খোদ"—আর ঠাকুর আমার গর্ভধারিণীকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন "জয় ঠাকুর। জয় সত্যানন্দ।"

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লেছিলেন, "যাবার সময় হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাব"। তাই মহাপ্রস্থানের আগের দিন স্বামী বিবেকানন্দের মনের দ্বন্দ্ব—আজ যদি এই অবস্থায় উনি বলেন যে, উনি অবতার, তবেই বিশ্বাস হয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে সর্ব দ্বিধার নিরসন ক'রে উত্তর এলো—"ওরে এখনো অবিশ্বাস! যে রাম যে কৃষ্ণ সেই এবার রামকৃষ্ণ রূপে এ দেহ টা অবলম্বন ক'রে এসেছে।" আমার ঠাকুরও বহুবার শ্রীমুখে কত ভাবে কত পরিচয় তাঁর দিয়ে গেছেন—মহাসমাধির আগের দিনও কোনও ভক্তকে বললেন, "জানবে মন্দিরের ঐ ত্রিনয়নী আর আমি এক।" কখনও আধো তন্দ্রাঘোরে ব'লে উঠেছেন—"আমি সেই বিরাট শিশু যিনি এই বিরাট বিশ্ব নিয়ে খেলা করছেন।"

কাজেই তিনি আমাদের ঠাকুর—আমার সহস্র মুখ থাকলেও আমি সহস্র কণ্ঠেই বলব,—তিনি ঠাকুর—আমাদের প্রাণের ঠাকুর—আমাদের অন্তরে গাঁথা ঠাকুর।

ঠাকুরের আর একটা মাত্র ঠকুরালীর বিবরণ দিয়ে আজকের কথা শেষ ক'রব।

"ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ" ফিল্মের ডাইরেক্টর, যিনি ভার নিয়েছেন আমাদের ঠাকুরের একটি ডকুমেণ্টারী ফিল্ম prodcue করার, তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা মানিকজ্যাঠা, আমাদের ঠাকুর কি কখনও কল্পতরু হ'য়েছিলেন?" উত্তর দিলাম, "কল্পতরু হওয়া কিনা জানিনা, তবে ঘটনাটা এই:

ঠাকুর গেছেন বাতিকার আশ্রম, সঙ্গে গেছেন মায়েরা আর ছেলেদেরও সংখ্যা হবে প্রায় তিরিশ চল্লিশ। বাতিকার গেলেই ঠাকুরের লীলাচঞ্চল রূপের প্রকাশ হ'ত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন প্রকার। একদিন সকালের দিকে গ্রাম ও গ্রামান্তরের ভক্ত নিয়ে গেছেন একটা বড় পুষ্করিণীর ধারে যার নাম দিয়েছিলেন যমুনা—যমুনার জলে একটা বিরাট নাদ (আখের রস জ্বাল দেবার পাত্র) নামান হয়েছে। আরোহী ঠাকুর ও পালাক্রমে দু'চারটা ক'রে ভক্ত। বেশ কিছুক্ষণ নামগান হওয়ার পর নাদটা ফিরে আসছে তীরের দিকে। হঠাৎ এক অভাবনীয় ব্যাপার। প্রথমে দু একটা ক'রে মাছ লাফিয়ে পড়ল নাদের ওপর—ঠাকুরের পাদস্পর্শ করেই পুনরায় লাফিয়ে পড়ল জলে। প্রথমে দুটো চারটা, পাঁচটা দশটা, পরক্ষণেই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ জল থেকে লাফিয়ে পড়তে লাগল ঠাকুরের চরণে—ঠাকুর নাদের ওপর দাঁড়িয়ে ভাবস্থ—আর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছগুলি পুনরায় জলে লাফিয়ে পড়তে লাগল—ক্রমে নাদটা তীরে এসে লাগলো। ভাবস্থ অবস্থাতেই ঠাকুর ধীরে ধীরে ভক্তদের সাহায্যে উঠলেন তীরে। ভক্তদের অনেকেই প্রণাম করতেই ঠাকুর তাদের শির স্পর্শ ক'রে "চৈতন্য হোক্ চৈতন্য হোক্" এই আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করতে লাগলেন। ভাবাবস্থাতেই এসে বসলেন পুষ্করিণীর তীরে তাঁরই জন্য নির্ম্মিত বেদীর পরে। নাম আরম্ভ হ'ল। বেশ কিছুক্ষণ নাম চলার পর ঠাকুর চাইলেন বিতরণের জন্য প্রসাদ। প্রসাদ আসার পরই ঠাকুর যেন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন ও আনন্দ কোলাহলের মাঝে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন—এর নাম আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী যা হয় দিন।

দয়ার তোমার নাইকো শেষ

সাধনাপুরী

আমাদের শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ হরির নীল নয়নের সামনে একবার যে এসে দাড়িয়েছে সেই জানে কত করুণাঘন ছিল সেই তনুমন। শ্রীঠাকুর আমাদের স্থুল দৃষ্টির আড়ালে সরে গেলেও তাঁর কল্যাণ দৃষ্টি তাঁর দীন দুঃখী আর্ত্ত সন্তানদের জন্য আজও সদা জাগ্রত—প্রতিদিন কত যে ঘটনা ঘটছে, কত ঘটে যে তিনি করুণা বিলিয়ে যাচ্ছেন সে কথা বসে শেষ করা যায় না —তিনি যে অশেষ—

আমাদের দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী শক্ত্যানন্দ সেবার বি, টি. পরীক্ষা দিলেন ভূবনেশ্বর বি টি. কলেজ থেকে—তারপর তিনি ভাবলেন— যাই একটু হিমালয়ে— কিছুদিন চেপে জপ ধ্যান করে আসি—অধ্যায়ন আর অধ্যাপনা এ তো আছেই—শ্রীঠাকুর (সত্যানন্দদেব) তো বলতেন, 'মাঝে মাঝে সব ছেড়ে মনটাকে সুইচ অফ্ করে ভগবানকে চিন্তা করবে, একটু করে সব চেপে জপ ধ্যান করবে।' আর শ্রীঠাকুরের পটমূর্ত্তি তো সঙ্গে আছেই। একথা কাজে পরিণত করতে মোটে দেরী হল না। হৃষিকেশ হরিদ্বারের কাছাকাছি একটি স্থানে শক্তি মহারাজ খুব জপ ধ্যান সুরু করেদিলেন। সেখানে আরেকটি সাধুও থাকেন বেশ বুদ্ধিমান। কয়েকদিন পর পরস্পরের মধ্যে যখন সৌহার্দ্দ গড়ে উঠলো তখন সেই সাধুটি শক্তি মহারাজকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা আপনার সঙ্গে এই সাধুর মূর্ত্তিটি কার বলুন তো?' শক্তি মহারাজ উত্তরে বলেন, 'ইনি আমার গুরুদেব স্বামী সত্যানন্দদেব। আমরা এঁকে ভগবান বলে জানি।' সাধুটি তখন বলেন, 'মহারাজ, আমি সাধু নই সাধুর বেশ পরেছি বাঁচবার জন্য। আমাকে এ্যারেষ্ট করবার জন্য সি. আই. ডি ঘুরছে, আমি কোন পার্টির লিডার, খুনীও বলতে পারেন দলের স্বার্থে খুনও করেছি। আপনার কাছে এই মূর্ত্তি দেখবার অনেক আগে থেকেই তো এখানে আছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই মূর্ত্তি কয়েকদিন রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমায় বলেছেন, "তুমি শুধু সাধুর বেশ পরে থেকো না, সত্যিকার ধার্ম্মিক হও, দেখবে কত শান্তি পাবে। ওসব হিংসা খুনোখুনির পথ ছেড়ে দাও—ওতে শুধু ধ্বংসই ডেকে আনে। সত্যিকার ধার্ম্মিক হও" তারপর এখানে আসার পর আপনার সঙ্গে দেখছি সেই স্বপ্নে দেখা সাধুর প্রতিকৃতি। কিন্তু স্বপ্নের কথা এতদিন বলি বলি করেও বলতে পারি নি। শক্তি মহারাজ তখন বলেন, "হ্যাঁ উনি সকলকে সত্যকার খাঁটি মানুষ হতে বলতেন, আরও বলতেন 'Be true to yourself" উনি কিছুদিন হল লোকান্তরিত হয়েছেন। সাধু বেশধারী সেই খুনী লিডারটি তখন অবাক হয়ে ভাবেন, তার মত পাপীর প্রতিও সত্যানন্দ ঠাকুরের কত করুণা! সৎ করার কত প্রচেষ্টা।

১৯৭২ সালে পূজার ছুটিতে শ্রীঠাকুরের ভক্ত পশুপতিনাথ মুখার্জী ও গৌরীদি গেছেন কেদার বদরির পথে—মাঝে ঝড়-বৃষ্টি হয়ে ধ্বস নেমেছে। যাত্রীরা অনেকে খুব বিপন্ন হয়েছেন—মন্দাকিণীর খরস্রোতা রুদ্রাণী রূপ দর্শন করে ভক্ত পশুপতি মুখার্জীর মনে জাগে ভয়। মনে মনে কিছু প্রার্থনাও জানান। রাত্রে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেন —বিপুল জলরাশি ছল ছল বেগে বয়ে চলেছে—তারি মাঝে দণ্ডায়মানা অপূর্ব্ব সুদর্শনা দেবী মন্দাকিণী—তখন স্বপ্নের মাঝেই পশুপতি প্রার্থনা জানান 'দেখিস মা, তুই যেন আমায় ভাসিয়ে দিসনী।' তখন শোনেন দেবী মূর্ত্তি আমাদের শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেবের কথা উল্লেখ করে বলছেন—বাবা তুমি যার আশ্রিত, তিনি ইচ্ছা করলে আমাকেই জগতের বুক থেকে discharged করে দিতে পারেন, তিনিই তোমায় রক্ষা করছেন—কাজেই আমি ভাসাবো তোমাকে! আনন্দে পশুপতিবাবুর ঘুম ভেঙ্গে যায়—করুণাময় শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ মহিমা স্মরণে বুক ভরে ওঠে গর্ব্বে ও আনন্দে।

এই কেদারনাথেরই প্রধান-পুরোহিত আমাদের ঠাকুরের পটমূর্ত্তি গৌরীদির কাছে দেখে আনন্দে চমকে ওঠেন ও বলেন, 'মাঈজী এই মূর্ত্তি আমায় দাও আমি রোজ আরতি করব, পূজা করব, ইনি তো স্বয়ং কেদারনাথ।' গৌরীদি দিতে রাজী হননা বলেন, 'আপনি শ্রদ্ধা করলেও কেদারনাথের অন্যান্য পুরোহিত বা অন্য অনেকে হয়তো শ্রদ্ধা দিতে পারবে না—তখন অপরাধ হবে—তাছাড়া নিজের পূজিত গুরুমূর্ত্তি অপরকে দিতে নাই—পরে বরং পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করব।' পুরোহিত বলেন, 'মা তোমরা ধরতে পারো নি—স্বয়ং কেদারনাথ এসেছিলেন—এতো সাক্ষাৎ কেদারনাথ।' পুরোহিতের কথায় পশুপতি মুখার্জী ও গৌরীদি দুজনের মনেই খুব আনন্দ হল।

১৯৭৩ সালেরই আরেকটি ঘটনা। বিপদ তারণ হরি সত্যানন্দ দেবের কৃপার কথা ভাবলে রোমাঞ্চ হয়। কমলেশ মিত্র—ডাক নাম জহর—খুব ছোট থেকেই শ্রীঠাকুরের খুব ভক্ত। এই জহরকে এর আগেও দুবার মৃত্যুমুখ থেকে শ্রীঠাকুর বাঁচিয়েছেন। জহর ওরফে কমলেশ মিত্র হলদিয়ায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে—জীপ গাড়ীতে চড়ে—সঙ্গে অন্যান্য আরও অফিসারও আছেন—রাস্তা তেমন ভাল নয়। হঠাৎ সেই গাড়ীখানি এ্যাকসিডেন্ট করে—বেসামাল হয়ে পাশেই জলাশয়ে দশফুট গভীরে যখন পরছে তখন জহর নিজের ডান পাশ থেকে সেই চির চেনা শ্রীঠাকুরের গম্ভীর সতর্ক বাণী শোনে—'জহর লকেটটা চেপে ধর'—জহর তো আশু মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ভয় পেয়েছিল, শ্রীঠাকুরের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে সাহস ভরে শক্ত মুঠে চেপে ধরে গলার চেনে ঝোলানো শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব ও মা ভবতারিণীর লকেট। গাড়ী পরল জলের দশফুট গভীরে—কিন্তু আশ্চর্য্য! ঠাকুরের কৃপা—সরকারী প্রচেষ্টায় গাড়ীকে জল থেকে তোলা হলে দেখা গেল জহর প্রমুখ কিছু আঘাত পেলেও কেউ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। লোকান্তরে গেলেও শ্রীঠাকুরের করুণাঘন আঁখি সদা-জাগ্রত কোথায় ভক্ত বিপদে পরেছে।

মাধুরী ব্রহ্ম বেতার শিল্পী—তাঁর স্বামী ডাক্তার ব্রহ্ম শ্রীঠাকুরের কাছে আসতে সুরু করেন শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেবের লীলা পর্য্যায়ের শেষের দিকে। শ্রীঠাকুরকে ডাক্তার ব্রহ্ম খুবই শ্রদ্ধা করেন—দীক্ষা নেবায় প্রার্থনাও জানান—কিন্তু শ্রীঠাকুরের শরীর তখন ভাল যাচ্ছিল না বলে দীক্ষা নেওয়া হয়ে ওঠেনি। তারপর শ্রীঠাকুর তো সারা জগৎ অন্ধকার করে হঠাৎ একদিন লীলা সংবরণ করলেন। ডাক্তার ব্রহ্ম শ্রীঠাকুরের দেহান্তের কিছুদিন বাদে হিমালয় অঞ্চলে বেড়াতে যান। সেখানে এক খুব শক্তিমান সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়—ভালও লাগে সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেন ডাক্তার ব্রহ্মকে তার দীক্ষা হয়েছে কিনা—তাতে ডাক্তার ব্রহ্ম বলেন, 'না দীক্ষা হয়নি তবে আমি এক বিশেষ শক্তিমান মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করেছি—আর তাঁকেই মনে মনে গুরু বলে বরণ করেছি আর তাঁরই নাম জপ করে যাই—তাঁর শারীরিক আসাচ্ছন্দতার জন্য আমার দীক্ষা নেয়ওা হয়ে ওঠেনি।' তখন হিমালয়ের সাধুটি বলেন, 'কই দেখাতে পারবেন আমাকে সেই মহাপুরুষের কোন ছবি।' ডাক্তার ব্রহ্ম বলেন, 'নিশ্চয় পারব, তাঁর পটমূর্ত্তি নিত্য সঙ্গে রাখি, প্রতিদিন তাঁকে পূজা করি।' এই বলে আমাদের শ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি বার করে দেখান ডাক্তার ব্রহ্ম। সাধুটি খুব অবাক হয়ে যান। বলেন, 'এই সন্ন্যাসীকে আমি বহুবার দেখেছি, আমি হিমালয়ে যে চূড়ায়, যে গুহায়, যে গাছতলায় আসন লাগিয়ে জপ ধ্যান করেছি দেখেছি এই সাধু একটি মৃগচর্ম্ম বিছিয়ে ঠিক তখন সেইখানে মৌন হয়ে ধ্যান করেছেন, ইনি তো মস্ত বড় যোগী।' ডাক্তার ব্রহ্ম বলেন 'তা কি করে সম্ভব? তিনি বাংলা ও বিহারে নিজের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলিতে ছাড়া কোথাও যান নি। হিমালয়ে তো কখনও আসেন নি।' সাধুজী আবার প্রশ্ন করেন, 'তপস্যা জীবনেও কখনও আসেন নি?' ডাক্তার ব্রহ্ম বলেন, আমি খুব ভাল করে জানি তাঁর ইচ্ছা ছিল খুবই কিন্তু হিমালয়ে তাঁর আসা হয়ে ওঠেনি। আর এখন তো লীলা সংবরণ করেছেন—আপনি কেমন করে দেখলেন।' সাধুজী বলেন, 'হ্যাঁ বাবা একেবারে এই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিকেই দেখেছি বহুবার তখন মনে করেছি কোন মৌন সাধক। এখন বুঝছি ইনি ভগবান, আমার ওপর কৃপা করে সাধক বেশ ধারণ করে আমার পাশে থেকেছেন। তোমাকে আমি তাঁরই নাম দীক্ষা দেবো—দেহশুদ্ধির

জন্য গুরু করণ প্রয়োজন। তুমি দীক্ষা নাও" —বলে ডাক্তার ব্রহ্মকে সাধুজী দীক্ষা দিলেন সৎ স্বরূপ, চিৎ স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ সেই সত্যানন্দ মহানাম মন্ত্রে।

গিরিজাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় আমার পূর্ব্বাশ্রমের দাদা শ্রীঠাকুরের দীক্ষিত সন্তান বিবাহ করেন নি—সহজ সরল জীবন তার তাই শ্রীঠাকুর তাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। কিছুদিন আগে আশ্রম আসবেন বলে তিনি বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে দাড়িয়েছেন—বাস এসে থামলে তিনি বাসে উঠতে যাবেন এমন সময় পাশ থেকে শ্রীঠাকুরের কণ্ঠস্বর—'এ বাসে উঠিস না।' চির চেনা শ্রীঠাকুরের কণ্ঠ শুনে চমকে ওঠেন—অপেক্ষা করেন আধঘণ্টা আর একটি বাস এলে উঠলেন বাসে। পরে খবর পেলেন যে বাসটিতে শ্রীঠাকুর উঠতে বারণ করেছিলেন সে বাসটি কিছুদুর গিয়ে এ্যাকসিডেণ্ট করেছে আর যাত্রীরা আহতও হয়েছে বেশ। সেই সূক্ষ্ম রাজ্যে চলে গেলেও অসহায় সন্তানদের প্রতি শ্রীঠাকুরের আজও কত করুণা ভেবে গিরিজাশঙ্করের চোখে আনন্দ ও বেদনা মিশ্রিত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল—অন্তর নিঙরে বলে উঠলেন—'দয়ার তোমার নাইকো শেষ'—

সেবা

স্বামী মৃগানন্দ

পরমতত্ত্বকে জানার বা তাঁকে লাভ করার উপায় কি? এ প্রশ্নের একটি প্রকৃষ্ট উত্তর আমরা পাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়। শ্রীভগবানের বাণী—

"তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানিনস্তত্ত্ব দর্শিনঃ॥"

গুরু চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা, নানা বিষয়ে প্রশ্ন দ্বারা এবং গুরুসেবার দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন—(গীতা ৪।৩৪)। জ্ঞান লাভের উপায় বলতে এখানে তিনটি করণীয় বিষয় নির্ধারিত করে দিলেন। প্রণাম, পরিপ্রশ্ন, সেবা। কাকে প্রণাম করবো? কার কাছে প্রশ্ন করবো? কার সেবা করবো? এর উত্তর—একজন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির শরণে যেতে হবে। কারণ, যে নিজে পেয়েছে সে-ই পারে অপরকে দিতে। অর্থাৎ সৎগুরুর কাছে যেতে হবে। প্রণাম নিবেদন পূর্ব্বক নতি জানিয়ে তাঁকে বিনীত ভাবে প্রশ্ন করতে হবে। এবং তার ওপর তাঁর তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত করতে হবে তাঁর সেবা। এগুলির বিশেষ প্রয়োজন আছে, যে জ্ঞানলাভ করতে চায় তার আধার প্রস্তুতির জন্যে। কামনা-বাসনাদি সংস্কারশূন্য নিরহঙ্কার আধার না হ'লে ভগবৎ কৃপা ধরবে কেমন ক'রে? তাই এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীভগবান সত্যানন্দদেব বললেন,—"আগে প্রণিপাত তারপর পরিপ্রশ্ন তারপর সেবা, এগুলির ক্রম ব্যবহারিক জগতে খুবই স্পষ্ট এবং প্রয়োজনীয়। আমরা স্বতঃই দেখতে পাই যে, যখনই আমরা কোনও মহাত্মা, সাধু, গুরু, বা গুণী ব্যক্তির কাছে যাই বা তাঁদের সন্তোষ আকাঙ্খা করি, তখন প্রথমেই প্রণিপাত প্রয়োজন; এইভাবে কিছুদিন যাতায়াতের পর তাঁর প্রীতি হ'লে তখন তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার সাহস হয় বা প্রশ্ন করাটা ঠিক হয়। আরও যখন এগিয়ে যাই, আলাপ জমে ওঠে, তখন সেবার অধিকার পাই। এইটির দুটি অর্থ হ'তে পারে। যেমন প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা যাঁর কাছে আমরা জ্ঞান বা কৃপা লাভ করবো, তাঁর হৃদিস্থিত হৃষীকেশের তুষ্টি বিধান করতে পারলে জ্ঞান লাভের পথ সরল হ'য়ে যাবে; আর একটা হচ্ছে যে, প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা

মনকে নিরহঙ্কার নম্র বিনয়ী করে নিতে হয়। ঠাকুরের বলা আছে, উঁচু জমিতে জল জমে না, নীচু জমিতে জল জমে। কাজেই কৃপা লাভ করতে হ'লে এই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা মনকে নীচু করা, কৃপা জমবার মত আধার তৈরী করা। এই তুটি একসঙ্গে না হ'লে কৃপালাভ করা যায় না"—(বেদছন্দা, শ্রীসাধনাপুরী সঙ্কলিত 'গীতার বাণী'—১ম খণ্ড)।

বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে স্কুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জগতে সিদ্ধ সাধক-মহাপুরুষদের জীবন-বেদ অনুশীলন করলে দেখা যায় যে, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে গুরু সেবা রূপী সাধনার বলে অগণিত ভক্ত সাধক চরম ও পরম অভীষ্ট লাভে ধন্য হয়েছেন। বহু উদাহরণের মাঝে তু'একটি মাত্র এখানে তুলে ধরি। পৌরাণিক যুগে দেখি—ঋষি আয়োদধৌম্য তাঁর শিষ্য আরুণিকে শস্য ক্ষেত্রে জল নির্গমন স্থলে আল বাঁধতে বললেন। নিষ্ঠাবান সেবক বহু চেষ্টা করেও আল বাঁধতে অসমর্থ হয়ে, শেষে আলের যে স্থান দিয়ে জল নির্গত হচ্ছিল, সেখানে শয়ন পূর্ব্বক জল-স্রোত রক্ষা করতে লাগলেন। আরুণি ফিরছে না দেখে গুরু তাকে খুঁজতে খুঁজতে ক্ষেতে এসে পড়লেন। শিষ্যের ঐ অবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তার এরূপ করার কারণ। সব শুনে তিনি খুবই তুষ্ট হ'লেন শিষ্যের সেবা-নিষ্ঠায়। বললেন, "তুমি কেদারখণ্ড ভেদ করে উঠেছো ব'লে আজ থেকে উদ্দালক হ'লে, আর আমার আজ্ঞা পালন করেছ ব'লে সমস্ত বেদ সমস্ত ধর্মশাস্ত্র তোমার অধিগত থাকবে।" গুরুসেবার দ্বারা উদ্দালক ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হলেন। এ যুগেও দেখি আরুণির মত আর এক মহান চরিত্র রামকৃষ্ণ-সন্তান সারদা-সেবক স্বামী ত্রিগুণাতীতকে। সারদা মা দূর পাল্লায় স্থানান্তরে যাচ্ছেন গো-যানে। সঙ্গে রয়েছেন সেবক ত্রিগুণাতীত। ক্লান্ত পথে মা হ'য়ে পড়েছেন তন্দ্রিত। হঠাৎ ত্রিগুণাতীত দেখেন, সামনেই মাঝ রাস্তায় একটা বড় মানুষ-প্রমাণ গর্ত্ত, যার ওপর দিয়ে গাড়ী চললে মা'র আচমকা তন্দ্রা ভেঙ্গে যাবে আর হয়ত দেব শরীরে লাগবে গুরুতর আঘাত। মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না ক'রে ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি ওই গর্ত্তে, যাতে গাড়ী পেরিয়ে গেলেও মা'র কোনও কষ্ট হবে না। একি সেবকের পরীক্ষা লগ্ন? না শ্রীশ্রীমায়েরই পরীক্ষা লগ্ন? চকিতে মা'র তন্দ্রা যায় ছুটে, নাড়ীর কোন্ অজানা টানে, কে জানে? তড়িৎ বেগে গাড়ী থামাবার আদেশ করেন জননী। ছুটে গিয়ে বুকে তুলে নেন ধূলি লুণ্ঠিত মহান সেবককে। ধন্য হয় সেবক, স্বয়ং ভগবতীর কৃপালাভে।

এযুগে গুরুসেবার আর এক মহান নিদর্শন সিদ্ধ সাধক কৃষ্ণপ্রেম। বিদেশী শরীর কিন্তু শিরায় শিরায় যেন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার রক্ত প্রবাহ। গুরু যশোদা মায়ের একনিষ্ঠ সেবায় জীবন আহুতি দিয়ে জগতের বুকে হ'য়ে রইলেন চিরস্মরণীয়। গুরু সেবার বহু উদাহরণের মধ্যে মনে পড়ছে জৈন আচার্য্য শ্রীবিজয়েন্দ্র সুরির কথা। তিনি মাত্র আঠারো বছর বয়সে সিদ্ধিলাভ ক'রে আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর এই অসাধারণ অবস্থার মূলে ছিল তাঁর আবাল্য একনিষ্ঠ গুরুসেবা। সামান্যতম ত্রুটী বিচ্যুতির জন্যও গুরু করতেন কঠোর শাসন ও তিরস্কার। সুকোমল সুদর্শন বালক বিনা প্রতিবাদে গোপনে করতেন নীরব অশ্রুপাত, আর চেষ্টা করতেন আরও বেশী মনোযোগ সহকারে সেবা কর্ত্তব্য সম্পাদন করার। তাঁর আচার্য্য জীবনেও তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন লোক কল্যাণ ব্রতে।

আবার গুরু সেবা ছাড়াও আমরা দেখি, মন্দির বিগ্রহ সেবা, মন্দির-প্রাঙ্গণ মার্জ্জনা প্রভৃতির দ্বারাও বহু সাধক কৃপা উপলব্ধির চরমে পৌঁছে গেছেন। গোস্বামী শ্যামানন্দ, জটাধারী, গোপালের মা প্রমুখ বহু সাধক সাধিকা এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থল। গোস্বামী শ্যামানন্দের আর এক নাম ছিল তুঃখী কৃষ্ণদাস। এই ভক্ত সাধক উপলব্ধি করেছিলেন, সেবাই ভক্তিশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত। গুরুর নির্দ্দেশে বিগ্রহ সেবার ভার পেয়ে, মাথায় ক'রে গঙ্গাজল বয়ে আনতেন নিত্যদিন। এই কাজে তাঁর মাথায় ক্ষত সৃষ্টি হ'ল। সেটা তিনি গোপন ক'রে রাখলেন, পাছে সেবার কাজে বিঘ্ন হয়। তাঁর সেবায় প্রীত হ'য়ে গুরু একদিন মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে জানলেন সে কথা। এর পর গুরুর নির্দ্দেশ নিয়ে কৃষ্ণদাস চলে এলেন বৃন্দাবনে শ্রীজীবের

কাছে। বৃন্দাবনে এসে নিকুঞ্জ মন্দির মার্জ্জনার কাজে ব্রতী হলেন মহাজ্ঞানী কৃষ্ণদাস। মন্দির অঙ্গন বারে বারে ঝাঁট দিতেন আর মগ্ন থাকতেন রাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণে। একদিন রাত্রির শেষ প্রহরে উঠে নিকুঞ্জ মন্দির পরিস্কার করতে গিয়ে হঠাৎ কুড়িয়ে পেলেন একগাছি অপরূপ সোনার নূপুর। আর রাধারাণীর সে নূপুরের সঙ্গেই পেলেন ললিতা সখীর দেখা আর পেলেন নিকুঞ্জ মন্দিরের অধীশ্বরী শ্রীমতীর সাক্ষাৎ দর্শন ও কৃপা স্পর্শ।

জটাধারীর রামলালা যখন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসতে চাইলেন তখন বিগ্রহ সেবক জটাধারীর মনে উপস্থিত হ'ল দারুণ কষ্ট। তিনি যে রামলালাকে জানতেন জীবন্ত বলে। তাই তার বিরহ সইবেন কেমন ক'রে। কিন্তু লীলার ঠাকুর ভক্তের হৃদয়কে করে দিলেন চিরপূর্ণ, যে পূর্ণত্বের পর আর বিচ্ছেদ নাই, যে মিলন একাত্মতার মাঝে চিরন্তন হ'য়ে রইলো।

গোপালের মা ছিলেন আজীবন গোপাল সেবিকা। গোপালের কৃপায় সর্ব্বভূতে গোপাল দর্শনের চরম অনুভূতিতে ধন্য হয়েছিলেন গোপালের মা, যে দর্শনের সত্যতা বিবেকস্বামীকেও মানতে হয়েছিল আর গোপালের সেবার দ্বারা ভগবৎকৃপা আস্বাদন ঠাকুর সত্যানন্দের এই আশ্রমের গোপাল প্রাণা মায়েরা যেমন করেছেন, তেমন বোধ হয় কোনও কালে কেউ করেনি। শ্রীঠাকুরের আদরের গোপালজী তাঁদের কাছে জীবন্ত মানব শিশুর মতই লীলায় টলমল। নিজের অহংএর দিকে দৃষ্টি না রেখে, বিগ্রহকে জ্যান্তজ্ঞানে সেবার দ্বারা প্রীত করার এমন অপরূপ দৃষ্টান্ত কল্পনার অতীত। এ সম্ভব হয়েছিল শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের মহাশক্তিতে এবং তাঁর অশেষ কৃপায়। তিনি বেদছন্দা মুখে বললেন, "একদিক দিয়ে শুধু ধ্যান জপ করাটাও স্বার্থপরতা। ঠাকুর আমায় পবিত্র কর, আমায় লোভ মোহ বিমুক্ত কর, আমায় শান্তি দাও, এই সব ইচ্ছা নিয়েই তো আমরা ধ্যান জপ করি। কিন্তু, পূজা আরতি শুধু তাঁর সেবা করা, তাঁর প্রীতির জন্য করা চলে—অহংএর দিকে দৃষ্টি না দিয়েও।" এ বাণীর যাথার্থ্য তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁর নিজের এবং তাঁর মানসকন্যা শ্রীঅর্চ্চনামা ও স্নেহের সন্ন্যাসিনী কন্যা ও সন্ন্যাসিনী মায়েদের দেব জীবনে।

বিবেক স্বামী যুগপ্রয়োজনে একদলকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেছিলেন, "রেখে দে তোর ঘণ্টা নাড়া....". যুগের জড়তাকে কাটানোর জন্যে হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের ঠাকুর সব কিছুকেই পূর্ণ মর্যাদা দিতে, সব কিছুকেই রাখতে এসেছিলেন। কোনও কিছুকেই তিনি বাদ দেননি। বাইবেলে উক্ত যীশুর কথা প্রায়ই ধ্বনিত হ'ত তাঁর শ্রীমুখে: I am not come to destroy, but to fulfil—আমি ভাঙতে আসিনি, গড়তে এসেছি। অবশ্য শিবাবতার স্বামিজীকে খেলতে হয়েছিল ভাঙা-গড়ার খেলা এবং তাঁর ক্ষেত্রে সেটাই সেজেছিল।

যাই হোক, কি গুরু সেবা, কি মন্দির বিগ্রহ সেবা, সবেরই উদ্দেশ্য কিন্তু নিজের অহংকে নামিয়ে আনা, এমন কি সেই অহংএর দিক্ থেকে দৃষ্টিই সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়া, বিনয় নম্রতা অবলম্বন ক'রে কৃপালাভের উপযুক্ত নীচু জমি তৈরী করা। কিন্তু এখানেই বাধে যত গোল। অহং গিয়েও যায় না। কোথা থেকে যেন এসে পড়ে অজান্তে, আর সৃষ্টি করে বিরাট ব্যবধান, যাকে লঙ্ঘন ক'রে ইষ্ট সান্নিধ্যে যাওয়া মানুষের সাধ্যের অতীত হ'য়ে পড়ে। এ বিষয়ে মনে আসে শ্রীঅর্চ্চনা মায়ের একটি বাণী: "সেবা করতে করতে অনেক সময় অহংকার চলে আসে। মনে সে আকর্ষণ বা টান থাকে না, সেবাটা হয়ে ওঠে দায় সারা গোছের—করতে হবে বলেই করে যাওয়া। আসলে উদ্দেশ্যটা ভুল হয়ে যায়। ভালবাসা যে সেবার মূল কথা, সেটাই ভুল হ'য়ে যায়"- (ছড়ানো মুক্তো, ১ম খণ্ড)। এখন, যাকে ঠিক ঠিক ভালবাসি তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য একটা আকুলতা স্বভাবতঃই আসে এবং এই আকুলতাই প্রেরণা দেয় সেবার। গুরুর প্রতি কি ভগবদ্ বিগ্রহের প্রতি, বা ইষ্টরূপের প্রতি স্বভাবতঃই একটা অন্তরের টান থাকে। তাই সেবার মূল প্রেম ভালবাসায় বিধৃত। কিন্তু এই প্রেম ভালবাসায় যেমন জোয়ার আছে তেমনি আছে ভাটা। আর যখন ভাটা পড়ে তখনই হ'তে হয় সতর্ক। প্রেমের অহংকার একটা আছে। সেটা

আসে গভীর একাত্মতা থেকে। কিন্তু প্রেমে ভাটা পড়লে একটা অবজ্ঞার ভাব এসে পড়ে। এই বিষয়েও মনে পড়ে শ্রীঅর্চ্চনা মায়েরই আর একটি বাণী: "প্রেমের অহংটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এই অহংকার আসে প্রেমাস্পদের সঙ্গে গভীর একাত্মতা থেকে। তখন প্রয়োজন বোধে, ভালবাসার দায়ে প্রেমাস্পদকে নিজের চেয়ে ছোট মনে ক'রে ফেলে কখনও কখনও। তাতে দোষ নেই। ... কিন্তু সেবা করতে করতে যখন অহংকার আসে অশ্রদ্ধা আসে তখনই সাবধান হওয়া দরকার। কোনও একটি মঠে একজন পূজারী-সেবক একদিন তার প্রভুকে জানালো —'মহারাজ, আমি কিছুদিন দূরে গিয়ে তপস্যা করে আসতে চাই। আমার অহংকার এসে যাচ্ছে। এখন দেখছি আগেকার সেই সমীহ শ্রদ্ধার ভাবটা নেই আমার সেবার মধ্যে। জলে পা ঠেকে গেছে, দায় সেরে সেই জলই ঠাকুরকে ভোগ দিচ্ছি।' এই সেবকটির বিবেক জেগেছিল, তাই সে নিজের ভুল নিজে বুঝতে পেরে তপস্যা করতে চলে গেল। সারদা মাও বলেছেন—'সেবা করতে করতে সেটা একসময় পুতুল খেলার মত হয়ে যায়।' সে তখন পূজার বিগ্রহ দেবতাকে মনে করে পুতুল মাত্র। একটা carelessness একটা অশ্রদ্ধা এসে পড়ে। তাই মনটাকে আগে বুঝতে হবে। সেবার অহং না প্রেমের অহং, একটু যাচাই করলেই মন ঠিক বুঝতে পারবে সে-কথা। তবে বিবেকটা জাগা চাই"—(ছড়ানো মুক্তো, ২য় খণ্ড)।

কাজেই বিবেককে জাগিয়ে রেখে, ধৈর্য্য ধরে এগিয়ে যেতে হবে এ পথে। মন্দির সেবা গুরু সেবা স্থূল কাজ ঠিকই। কিন্তু এটাকে নিতে হবে তপস্যা এবং সাধনা হিসাবে। দীর্ঘদিন নিঃস্বার্থ ভাবে সেবানুষ্ঠান করে গেলে গুরু-ইষ্টের কৃপায় তার সিদ্ধিলাভ আপনিই হয়। এর জন্য তাকে আলাদা কিছু জপ ধ্যান বা অন্য কোনও তপস্যার অনুষ্ঠান করতে হয় না। সদ্যসদ্য হয়তো সূক্ষ্ম অনুভূতি সকল না-ও আসতে পারে। তবু বিশ্বাস আর নিষ্ঠাটি শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখতেই হবে। স্থূল কাজ মনে হ'লেও, সেবারূপী এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তপস্যার জন্য চাই অসীম সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি ও উদারতা। এই সকল গুণ যখন হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি হয়ে যাবে তখনই সেবা হবে সার্থক। স্থূল কাজ হলেও অতি সূক্ষ্ম এই সেবা ধর্ম্মের গতি, সহজ হয়েও বড় কঠিন এই সেবারূপী সাধনা।

সাধন রাজ্যে সেবাকে সাধারণতঃ দাস ভাবেরই একটি রূপ বলে ধরা হয়। অনেকের ধারণা, ভাব সাধনার রাজ্যে এই সাধন অন্যান্য ভাবের চেয়ে একটু নীচের স্তরের। সমাজনীতিতেও সেবক শূদ্রজাতি বলে চতুর্থস্তরে পরিগণিত। আবার অনেকে মনে করেন...সেবা করা মানে চাকরের কাজ করা এবং সে ভৃত্যের প্রাপ্য অবজ্ঞারই ভাগী। দেখা যায়, মনুসংহিতায় সেবাকে আরো নীচে নামানো হ'য়েছিল: "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতাতস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ" (মনু ৪।৬) সেবাকে সেখানে শ্ববৃত্তি অর্থাৎ কুক্কুরের বৃত্তি বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু একটু অনুশীলন করলেই আমরা দেখতে পাবো, সেদিনের এই ধারণা আজ সম্পূর্ণ সেকেলে, অপ্রচলিত এবং মূল্যহীন হ'য়ে গেছে। কি সাধনার ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে কি সাধারণ ক্ষেত্রে, সেবা আজ অতি উচ্চ মর্য্যাদার দ্যোতক একটি শব্দ, একটি ভাব বলে পরিগণিত। কথিত আছে "ভারত ভূতলে যে করে যে বলে সব ঈশ্বরের সেবা"। প্রকৃত সেবার ভাব অতি উচ্চ অবস্থারই পরিণতি। অতি দুর্লভ এ ভাব মহাসাধনার বস্তু।

বৈষ্ণব ভাবসাধনায় শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর, এই পঞ্চভাবের উল্লেখ আমরা পাই। আর মধুর ভাবই এই ভাবগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চতম বলে পরিগণিত। এই মধুর ভাবের সুউচ্চ ভাবভূমি নিঃস্বার্থ প্রেম ভালবাসার প্রকাশে মহীয়ান। সে অবস্থায় ভক্ত কৃষ্ণ সুখে সুখী। তার নিজের জন্য কৃষ্ণ ছাড়া কোনও চাওয়াই নেই। যেখানে শুধুমাত্র ভগবানের জন্যই ভগবানকে ভালবাসা, সেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ যেন প্রেম সমুদ্রে বিলীন। শ্রীমতী ও গোপীগণ ছিলেন এই অবস্থার অধিকারিণী। কৃষ্ণের সুখ বিধানের জন্য তাঁদের প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল। কৃষ্ণের সাময়িক অদর্শনে তাঁরা ব্যাকুলিত চিত্তে বিলাপ করছেন আর ভাবছেন:

"চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্নলিন্ সুন্দরংতে পদম্
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতিতি নঃ কলিলতাং মনঃ
কান্ত গচ্ছতি।"

হে কান্ত! হে নাথ! পশুচারণ করিতে করিতে যৎকালে তুমি ব্রজ হইতে চলিয়া যাও, তোমার কমল কোমল চরণযুগল করক ও তৃণাঙ্কুর হইতে যন্ত্রণা পাইবে এই চিন্তায় আমাদের মন ব্যকুল হইয়া ওঠে'—(ভাগবত, দশম স্কন্দ)। তাই তো শ্রীমতী ও অন্য গোপীগণ তাঁদের সূক্ষ্ম দেহ বিছিয়ে দিতেন কৃষ্ণের চলার পথে। মহাশক্তি স্বরূপিণী প্রেম যোগিনী রাধা ও তাঁর সখীদের কৃষ্ণসেবার এই অপূর্ব নিদর্শনের কোনও তুলনাই মেলে না। মধুর ভাবের চরম অবস্থায় প্রেমের প্রকাশ এই সেবার মধ্য দিয়েই ঘটেছে। আবার গোপীরা কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, "ভবৎ কিঙ্করীঃস্ম নো" আমরা তোমার দাসী। শ্রীকৃষ্ণ জননী যশোদাকে আমরা বলতে পারি বাৎসল্য ভাবের সিদ্ধ সাধিকা। মা যশোদা তাঁর প্রাণের গোপালের সেবায় দিন রাত এক ক'রে তন্ময় হ'য়ে রয়েছেন। কি ক'রে গোপালকে সুখী করবেন, কি ক'রে তার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হবে, এই চিন্তায় নিজ স্বার্থ বা দেহ সুখাদি সব তুচ্ছ করেছেন। সখ্যভাবে যাঁরা দেখছেন তাঁদেরও প্রাণে সেই একই আকুলতা কি করে সখা কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়া যায় সুখী করা যায়, তার কি ক'রে একটু সেবা করা যায়।

ভক্তপ্রাণে এ ভাব আসে প্রেমাস্পদের সঙ্গে গভীর একাত্মতার অনুভূতির পর। ভগবানকে যখন নানাভাবে সেবার দ্বারা তুষ্ট ও আনন্দিত করার আকাঙ্খা ভক্তের প্রাণে জাগে, তখন বুঝতে হবে সে লীলার রাজ্যে দ্বিত্ব বোধ নিয়ে রয়েছে। এমন কি দেহত্যাগের পরও সে চায়, যেন নিত্যলোকেও তার এই দ্বিত্ববোধ বজায় থাকে এবং ভাব অনুসারে সাজুয্য সামীপ্য সালোক্যাদি অবস্থায় থেকে ভগবৎ সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকে। এ যেমন এক দিক; তেমনি আবার যার কৃষ্ণোপলব্ধি* হয়েছে কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মবোধ এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে এও উপলব্ধি করেছে যে, তার প্রেমাস্পদ কৃষ্ণই আবার সর্ব্বভূতে সর্ব্বজীবে সর্ব্বমানুষে নানারূপে অবস্থান ক'রছেন, তার ক্ষেত্রে সেবার আর এক মহীয়ান রূপ ফুটে ওঠে। সে তখন দেখে এক ভাবে—তার প্রাণের কৃষ্ণ ঐ পীড়িত মানুষটীর মাঝে দুঃখ পাচ্ছেন, ঐ আর এক মানুষের মধ্যে থেকে তিনিই আর্ত্তি জানাচ্ছেন, ঐ জীবের রূপ ধরে ঐ প্রাণীর রূপ ধরে তিনি সেবা চাইছেন সুশ্রুষা চাইছেন। তখন প্রেম যোগে কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত প্রেমিক সাধক আর কি পারে স্থির থাকতে; ব্যাকুল চিত্তে সে ছুটে যেতে চায় প্রতিটি রূপে তাঁরই সেবার জন্য, তাঁর কষ্ট কিছুটা লাঘব করার জন্য. গীতায় আছে: "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ"—সর্ব্বভূতে ভগবান দর্শনকারী জ্ঞানী মহাত্মা সুদুর্লভ –(গীতা ৭। ৯)। পরে সর্ব্বভূতে ভগবানকে দর্শনের পর ভগবৎজ্ঞানে জীবের সেবা তাই মনে হয় আরও দুর্লভ আরও এক ধাপ পরের কথা। এই অবস্থা অতি বিরল অবতার মহাপুরুষদের জীবনেই দেখা যায়। ঈশ্বরোপলব্ধি হ'লে, কি ভক্তিমার্গী কি জ্ঞানমার্গী সবার ক্ষেত্রেই আসতে পারে এই প্রেমের অবস্থা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন জীবে দয়ার কথা। জৈন ধর্ম্মেও দেখি জীবে দয়াকে পরমধর্ম্ম বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে হঠাৎ উচ্চারিত হ'ল এক নূতন বাণী। অর্দ্ধবাহ্যদশায় একদিন হঠাৎ বলে উঠলেন: জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শ... কীটাণু কীট তুই জীবকে দয়া করবি? 'দয়া করবার তুই কে? না না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথ। রামকৃষ্ণের বাণীর গূঢ় মর্ম্ম কেবল তিনিই ঠিকঠিক হৃদয়ঙ্গম করলেন বললেন..."কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। শুষ্ক কঠোর ও নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্ত জ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন। ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে

* এখানে "কৃষ্ণ" বলতে যার যা ইষ্ট তাই ধর্তব্য। যেমন, জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসত্যানন্দ ইত্যাদি রূপ।

অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে সে সকলই করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল...ঈশ্বরই জীবজগৎ রূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন"—(লীলাপ্রসঙ্গ)। জগতের সামনে উদ্‌ঘাটিত হ'ল শিবজ্ঞানে জীব সেবার এক নূতন দিক, রচনা হ'ল নূতন শাস্ত্র ক্রম-বিবর্ত্তনের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। এ শাস্ত্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শাস্ত্র, যে শাস্ত্র জ্ঞান-কর্ম-প্রেমের সমন্বয়ে এক নোতুন আলোড়ন এনেছে জগতে। বিরাট উদার বুকের প্রেম নির্ঝরিণীতে বয়ে গেছে সেবাদর্শের মহাপ্লাবন।

বিবেকস্বামীর জীবনের একটি ঘটনায় মেলে তাঁর উদার দরদী বুকের গভীর পরিচয়। সেদিন স্বামিজী শিষ্যকে বেদ পড়াচ্ছেন। বেদ বেদান্তের আলোচনায় সকলেই তন্ময় হ'য়ে রয়েছেন। এমন সময় শ্রীগিরিশ ঘোষ মহাশয় সে-সময়ের সমাজের বিভীষিকা, অত্যাচার ও দুঃখদৈন্যের কতকগুলি ছবি স্বামিজীর সামনে তুলে ধরে বললেন—"এ সকল রহিত করবার কোনও উপায় তোমার বেদে বলা আছে কি?" স্বামিজী চুপ। গিরিশ ঘোষের কথা শুনতে শুনতে তাঁর দুচোখ বেয়ে নামলো ঘন মেঘসার। তিনি উঠে চলে গেলেন পাশের ঘরে। গিরিশ ঘোষ বলে উঠলেন—"দেখলি বাঙ্গাল! কত বড় প্রাণ! তোর স্বামিজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ওই যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহা-প্রাণতার জন্য মানি।" সদানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করে সেদিন বিবেকানন্দ বললেন..."ওরে এই জি. সির মুখে দেশের দুর্দ্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু কচ্ছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস?" তারপর কি কি করতে হবে সব ব'লে বললেন—"জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নাই। সেবা ধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসার বন্ধন কেটে যায়, মুক্তিঃ করফলায়তে।" আর গিরিশ ঘোষকে বললেন—"মনে হয় এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো.... মনে হয় খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে?" মানুষের দুঃখে সত্যিই কেঁদেছিল প্রেমিক বিবেকের প্রাণ। তাই তো একদিন বলে উঠলেন—"মানুষ হ'য়ে মানুষের জন্য যাদের প্রাণ না কাঁদে তারা কি আবার মানুষ?"—(স্বামী শিষ্য সংবাদ)। নিত্যসিদ্ধ এই বিরাট পুরুষ বলতেন—ভগবৎলাভ মানে কি, তা বুঝলাম না, তবে বুকটা বড় হয়ে গেছে, সারা পৃথিবীর মানুষকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। এ ইচ্ছা তাঁর কার্য্যে রূপ নিল। গড়ে উঠলো শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, সেবা ভিত্তিক এক মহাপ্রতিষ্ঠান। এই সেবা আরও মহীয়ান, কারণ, এটা ধর্ম্মমণ্ডিত, আধ্যাত্মিকতা-মণ্ডিত এবং ঈশ্বরলাভের উপায় স্বরূপ নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান। এ সেবা ঈশ্বরের সেবা, ঈশ্বর প্রীত্যর্থে নিঃস্বার্থ আত্মাহুতি। স্বামিজী মন্ত্র দিলেন....

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

মনে পড়ে পরিত্রাতা যীশুর মহাবাণী..."To serve man is to serve God"...মানুষের সেবা করা মানেই ঈশ্বরের সেবা করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গিনী রামকৃষ্ণ জগতের অধিষ্ঠাত্রীদেবী জগন্মাতা সারদার জীবন সেবা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করলো। যে মাকে ঠাকুর বল্লেন....ও সারদা সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে, যে মা আনন্দময়ী মন্দিরে রয়েছেন সেই তিনিই সাক্ষাৎ মানবীরূপে অবতীর্ণা, সেই মা ভক্ত সন্তানদের সেবা করলেন, দীন দরিদ্রের সেবা করলেন, দীনাতিদীন মূর্ত্তিতে। গিরিশের বিছানা পরিষ্কার করতেও দ্বিধা আসেনি তাঁর মনে। সেবাকেই তিনি গ্রহণ করলেন তাঁর জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম একমাত্র আদর্শ বলে। মানুষের প্রতি তাঁর অন্তরে ছিল গভীর ভালবাসা। আদর্শ স্থাপন করতেই তো তাঁদের আসা। সেবার এই আদর্শ সূক্ষ্ম প্রেরণার কাজ করেছিল গৌরীমার মধ্যে, নিবেদিতার মধ্যে। এঁরাও সেবা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মুগ্ধ করলেন জগৎকে।

স্মরণে আসে বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস। মহাজ্ঞানী অথচ মহাপ্রেমিক বুদ্ধদেব। তাঁর যুগও ছিল সেবা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মহীয়ান। বুদ্ধের সাধনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল

জীবের ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণ। মানুষের প্রতি করুণায় তাঁর অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। তাই তাঁর প্রেরণা কাজ করলো তাঁর শিষ্যশিষ্যাদের মধ্যে। একটি চিত্তাকর্ষক মহান দৃষ্টান্তের কথা বলি। ধনী কন্যা সুপ্রিয়া অতি অল্প বয়সে জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুর উপদেশে মুগ্ধ হ'য়ে ভিক্ষুণী হ'লেন। তীব্র ইচ্ছা শক্তির বলে অতি শীঘ্রই তিনি অর্হতী পদ প্রাপ্ত হলেন। সর্ব্বজ্ঞা সুপ্রিয়া কিন্তু এই চরম বোধি লাভের পরই নিজেকে নিযুক্ত করলেন জন-সেবা ব্রতে। রোগ দুর্ভিক্ষ মহামারী ক্লিষ্ট নরনারীর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে করতে লাগলেন ত্রাণকার্য। বুভুক্ষিত মানুষের অন্ন সংগ্রহ করতে তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরতেন ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে। একবার শ্রাবস্তি নগরে দেখা দিল মহা দুর্ভিক্ষ। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গিয়েছে। সে সময় অসীম সাহস ও আত্মবিশ্বাস অবলম্বন ক'রে কি ভাবে তিনি ভার নিয়েছিলেন দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সেবার, সে-কথা রবীন্দ্রনাথের 'নগরলক্ষ্মী' কবিতায় বড় সুন্দর চিত্রিত হয়েছে। বুদ্ধদেব নিজভক্তগণকে জনে জনে ডেকে শুধালেন…'ক্ষুধিতের অন্নদান সেবার ভার তোমাদের মধ্যে কে নিতে পারো?' শেঠ রত্ন'কর, সামন্ত জয়সেন প্রমুখ একে একে সকলেই মাথা হেঁট করলেন অবশেষে উঠে দাঁড়ালেন সুপ্রিয়া। উন্নত শিরে বললেন…

"ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া
কাঁদে যারা আত্মহারা আমার সন্তান তারা
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজ লইলাম ভার॥……
আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা
মিটাবো দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা॥"

সেদিন সত্যিই তাঁর ভিক্ষালব্ধ অন্নে সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। কত বিরাট বুকের এ কথা—কাঁদে যারা আত্মহারা, আমার সন্তান তারা। জগতের প্রতি এমনি ভালবাসা এলে তবেই প্রেরণা আসে সেবা ধর্ম্মের।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর, বিবেকস্বামী এবং এঁদেরও পরে শ্রীভগবান সত্যানন্দদেব নোতুন করে প্রতিষ্ঠিত করলেন সেই প্রেম ভালবাসার ধর্ম্ম, যেখানে আধ্যাত্মিকতার উদ্দেশ্য শুধু নিজের মোক্ষ নয়—আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। তাঁদের দেওয়া এ মন্ত্র ধর্ম্ম জগতে নিয়ে এল মহান উদারতার প্লাবন। জগতের হিত সাধন হ'য়ে গেল আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান অঙ্গ। তাঁরা জানতেন গীতার উপদেশের মর্ম্ম এবং জানতেন বলেই তাঁরা প্রথম থেকেই প্রকৃতির ধর্ম্মকে মেনে নিয়ে ধরিয়ে দিলেন নিষ্কাম কর্ম্মের দিক। মানুষ যতদিন বাঁচবে তাকে কিছুনা কিছু কর্ম্ম করতে হবে। কর্ম্মহীন অবস্থায় প্রাণধারণ সম্ভব নয়। সে অবস্থায় লয়ই অবশ্যম্ভাবী।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।"

কেহই কখনও ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, কেননা প্রকৃতির গুণে অবশ হইয়া সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় (গীতা ৩।৫)। সাধারণ মনে প্রশ্ন উঠবে কর্ম্ম যদি করবো তবে কর্ম্ম বন্ধনও তো অনিবার্য্য ভাবেই সৃষ্ট হবে—তাহ'লে মুক্তির পথে এগিয়ে যাব কি ক'রে? গীতায় এরও উত্তর রয়েছে। কি ভাবে কর্ম্ম করলে কর্ম্মবন্ধন হয় না, পরন্তু মোক্ষ পদের অধিকারী হওয়া যায়, সে-কথা বহু ভাবে শ্রীভগবান নির্দ্দেশ করেছেন গীতার শ্লোক মন্ত্রে। তিনি বলছেন: "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।" যোগস্থ হইয়া ফলাসক্তি বর্জ্জন পূর্ব্বক সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া কর্ম্ম কর—(২।৪৮)।

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ॥"

বিবেক বুদ্ধি সহকারে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া কামনাশূন্য মমতাশূন্য হইয়া শোকত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর—(৩।৩০)। এখানে 'যুদ্ধ কর' কথাটা বৃহত্তর অর্থে নেওয়াই বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ স্ব স্ব ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। এখানে যুদ্ধ মানে জীবনের চলার পথে যে সকল কাজ করতে হবে যে

struggle করতে হবে, সেই struggle, সেই কাজ; কারণ কুরুক্ষেত্রের রণভূমি তো আজ আর নেই, অনেক যুগ পেরিয়ে বর্ত্তমানের পটভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। তিনি আরও বললেন—

"ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥"

যিনি ব্রহ্মে সমুদয় কর্ম্ম স্থাপন পূর্ব্বক ফলাসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন তিনি পাপে লিপ্ত হন না, যেমন পদ্মপত্র জল সংস্পৃষ্ট থাকিয়াও জলদ্বারা লিপ্ত হয় না—(৫।১০)। নির্দ্দেশ দিলেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥"

কর্মে তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়। কর্মফল যেন তোমার কর্মের হেতু না হয়, কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়—(২।৪৭)। এখন গীতোক্ত কর্ম বলতে আমরা কোন্ কাজকে বুঝবো, সেটা যেন একটু অস্পষ্ট রয়েছে। সে যুগে বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদি কর্মকেই কর্ম বলে ধরা হ'ত কিন্তু আজ এই বিবর্ত্তিত যুগে আমরা আরও ব্যাপক এবং উদার দৃষ্টিতে গ্রহণ করবো। কর্মকে আমরা দেখবো শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ও কর্মের আলোয়, কর্মকে আমরা দেখবো শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের বাণী এবং কর্মচক্র প্রবর্ত্তনের নবীন দৃষ্টি ভঙ্গিতে। এই কর্ম নিঃস্বার্থ ভাবে জগতের কল্যাণ কল্পে অনুষ্ঠিত কর্ম, যে কর্মে কামনা নেই, কর্তৃত্বাভিমান নেই। এ কর্ম সর্ব্বভূতে সর্ব্বজীবে সর্ব্ব মানুষে অবস্থিত শিবস্বরূপের নিষ্কাম উপাসনা, এই কর্ম মানব মূর্ত্তিতে ঈশ্বরের সেবা

আমাদের ঠাকুর শ্রীসত্যানন্দদেব বেদছন্দা মুখে গীতোক্ত কর্মের ব্যাখ্যার শেষে বললেন—"যুগ কর্মচক্রের গতি কিন্তু সমষ্টির কল্যাণ বা সম্মিলিত জাতীয় কল্যাণের দিকে। কাজেই ব্যষ্টির আত্মোন্নতি যখন সমষ্টির কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং ভগবৎ মুখী হবে, তখনই সেটাকে আদর্শ কর্ম বলে ধরা হবে"—(শ্রীসাধনাপুরী সঙ্কলিত 'গীতার বাণী' (১ম খণ্ড, ২।৪৭)। এই বাণীকে তিনি কার্য্যে রূপ দিলেন। তাঁর জীবন যজ্ঞের অর্চিপ্রভায় উদ্ভাসিত হ'ল সেবারূপী নিষ্কাম কর্মের নব নির্মিত পথ। এ তো সেবা নয়, এ তো জীবন্ত নারায়ণের পূজা। ধনহীন দুস্থ গরীব মানুষকে 'কাঙাল' ব'লে অবজ্ঞা করা নয়; তারাই তো অভিহিত হ'ল 'দরিদ্রনারায়ণ' নামে। আমাদের ঠাকুরের সেবা কর্মের একটি দিক এই দরিদ্রনারায়ণ সেবা। এ সেবায় তৃপ্ত হবেন নারায়ণ, আর শুধু তৃপ্ত হবেন না, তিনি জাগবেন, জাগবে দেবত্ব। সেবার ভিতর দিয়ে মানুষের মধ্যে সুপ্ত দেবত্বকে যে জাগানো যায়, এটা প্রমাণ করলেন আমাদের ঠাকুর। নিত্য দরিদ্রনারায়ণ সেবা আজও সিউড়ী দুবরাজপুর প্রভৃতি আশ্রমে অব্যাহত ভাবে চলছে। উৎসবে তো সহস্র সহস্র সংখ্যায় তারা প্রসাদ পেতে আসে বিভিন্ন আশ্রমে। যারাই আসতো প্রসাদ পেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, শ্রীঠাকুর তাদের কিছুক্ষণ 'রামকৃষ্ণ' নাম করিয়ে নিতেন। ক্রমে সে-নাম তাদের মধ্যে গেঁথে যেত। গ্রামে গ্রামে নিজে যেতেন সন্তানদের নিয়ে অথবা সন্তানদের দলকে পাঠাতেন ওষুধ পথ্য বস্ত্র ইত্যাদি বিলি করতে। সেখানেও তাদের আগে নাম করিয়ে নিয়ে তবে দিতেন ওষুধ। নামের বীজ এ ভাবেও ছড়িয়ে দিতেন সর্ব্বত্র। কত মজা'র ঘটনাও ঘটে গেছে এই নিয়ে। মুসলমান প্রধান এক গ্রামে রুগীদের ত্রাণের জন্য ওষুধ বিলোতে গিয়ে আমাদের ঠাকুর পড়লেন মহাসমস্যায়। ওষুধ নিতে যারা সমবেত হ'য়েছে তারা আল্লা ছাড়া কিছু বলবে না আর রামকৃষ্ণ না বললে ঠাকুরও ওষুধ দেবেন না। শেষে ঠাকুর বললেন, "বেশ, এস আমরা তোমাদের ঠাকুরের নাম বলি, তোমরা আমাদের ঠাকুরের নাম বল।" সমবেত কণ্ঠে উচ্চধ্বনি উঠলো 'আল্লারামকৃষ্ণ'। আনন্দ হুল্লোড়ের মাঝে বিলি হ'ল ওষুধ পথ্য। অন্য একদিন আমাদের ঠাকুর দরিদ্রনারায়ণদের মাঝে বিতরণ করছেন নোতুন জামা কাপড়। একটি ছোট্ট দরিদ্রনারায়ণীকে স্বহস্তে পরিয়ে দিলেন নোতুন ফ্রক। ঠাকুরের দেব স্পর্শ পেয়ে মেয়েটির ভেতর কি যে হয়ে গেল কে জানে। দেখা গেল তার দুচোখ বেয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়ছে নীরব অশ্রু। এ অশ্রু তো দিব্য স্পর্শের ফলে দিব্য ভাবের জাগরণেরই অশ্রু। যাঁরা দেখেছিলেন সে দৃশ্য তাঁরা চাক্ষুষ

উপলব্ধি করেছিলেন সে কথা। নারায়ণের শুধু পরিতৃপ্তি নয়, জাগৃতিও চেয়েছিলেন আমাদের ঠাকুর। তাঁর পক্ষে এটা সহজ ছিল। কিন্তু তাঁর সন্তানদের কাছেও তিনি আশা করেছেন সেবা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তারা ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে দিক কল্যাণ দীপ, নারায়ণকে জাগিয়ে তুলুক ঘটে ঘটে।

সমস্ত সাধনার শেষে নির্বিকল্প ভূমিতে যখন দেহ বিলীন করা পণ করেছেন আমাদের ঠাকুর, তখন মা ইচ্ছা ক'রে জোর ক'রে তাঁর দেব দেহকে জগতের বুকে রাখলেন, ভাবমুখে থেকে কিছু কাজ করার জন্য। এ অবস্থায় জগতের নিঃস্বার্থ কল্যাণ সাধনই হ'ল তাঁর অবলম্বন। বিরাট সেবা চক্রের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হ'ল সক্ষম মানুষ গড়ার। তাই গড়ে উঠলো শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গড়ে উঠলো শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন। এক এক ক'রে গ'ড়ে উঠলো বিদ্যাপীঠ, মহাবিদ্যালয়, সঙ্গীত বিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, মাতৃমঙ্গল, সেবামঙ্গল হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়। প্রতিষ্ঠিত হ'ল মণিমন্দির, শ্রীঠাকুর যাকে বললেন—'আমার শেষ কৃত্য'। প্রতিষ্ঠিত হ'ল শ্রীমন্দির, আর প্রতিষ্ঠিত হ'ল শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন। ঠাকুর সত্যান্দের শক্তি ও প্রেরণায় শক্তিমান. দেবদূত তুল্য এই সন্ন্যাসীগোষ্ঠী ঠাকুরের স্বপ্নকে কাজে রূপ দিয়েছেন। ঘোর দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, রোগ প্রকোপে পীড়িত সহস্র সহস্র নরনারী শিশু বৃদ্ধকে অন্নবস্ত্র ঔষধ পথ্যাদি বিতরণের কাজ অপূর্ব্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতা সহকারে নিঃস্বার্থ ভাবে কঠোর ত্যাগ স্বীকার ক'রে এমন কি জীবনের ঝুঁকি পর্য্যন্ত নিয়ে, করেছেন তাঁরা। সদ্য কিছুদিন আগেই বীরভূম অঞ্চলে মহা দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হ'ল আমাদের সিউড়ী আশ্রমের স্বামী সুরেশ্বরানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীরা অগ্রণী হলেন বড় বড় দশখানি লঙ্গরখানা পরিচালনার ভার নিতে। তাঁদের সঙ্গে, সঙ্গেই যোগ দিলেন দুবরাজপুর ও বরানগর আশ্রমের কর্মবীর সন্ন্যাসীরা। শ্রীঠাকুরকে ভোগ নিবেদন ক'রে সুরু হ'ল প্রসাদ বিতরণ। সহস্র সহস্র বুভুক্ষিত নরনারীর মধ্যে ভিক্ষালব্ধ অন্নপ্রসাদে পরিতৃপ্ত হলেন নারায়ণ। দীর্ঘ দেড় মাসের একটানা দীয়তাং ভুজ্যতাং দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামে এনে দিল নতুন প্রাণ। সময়ে সময়ে বন্যা পীড়িতের ত্রাণার্থে প্রয়োজনীয় অন্ন বস্ত্র অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহের নিমিত্ত গৈরিকধারী দেবদূতের দল দ্বারে দ্বারে গিয়েছে ভিক্ষার জন্য। কি অপূর্ব্ব সে দৃশ্য! সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের প্রসারিত দুটি হাতের মাঝে বিস্তৃত গৈরিক অঞ্চল, আর মুখে শ্রীঠাকুরের রচিত গান—

অন্নদে অন্নদে অন্নদে গো অন্নদে
ভুখারী শিব পুকারি ফিরে
দুয়ারে মা তোর কেঁদে কেঁদে, সেধে সেধে॥
নয়ন ভরিয়া এনেছি জল
অথৈ ব্যথার নাহি যে তল
করুণার ঢল উছলি উঠুক, আকুল আনন্দে॥
দাও মা তোমার প্রসাদ দৃষ্টি
হাসি সকরুণে রাখ মা সৃষ্টি
সব ভুল দোষ ভুলে যদি যাস
ভুলি সব ক্ষুধা পরমানন্দে॥

শ্রীঠাকুর তাঁর সন্তানদের তৈরী করার প্রথম দিকেই একটি সাংকেতিক মন্ত্র দিয়েছিলেন R.S.D. এর দুটি অর্থও বলে দিয়েছিলেন। একটি Ramkrishna, Service, Death, আর একটি Renunciation, Service, Divinity. আবার রবিনহুড নাটকের মাধ্যমে আর একটি সাংকেতিক মন্ত্র দিলেন G. P. S. অর্থাৎ God, Purity, Service, কাজেই "Service" বা সেবা হ'ল সব কাজ সব চিন্তার সব উদ্দেশ্যের অনিবার্য্য অঙ্গ অনিবার্য্য মন্ত্র। ঠাকুরের সন্তান স্বামী অরুণানন্দ ও স্বামী পরমানন্দজীর মুখে শুনেছি এই 'R. S. D.' তাঁদের মধ্যে এত গভীর দাগ কেটেছিল যে, সে সময় তাঁরা এবং অন্য বহু সন্ন্যাসীরাই কার্বলিক এ্যাসিডে নিজেদের হাতে বড় বড় ক'রে ঐ অক্ষর তিনটি লিখে রাখতেন। এ্যাসিডে হাত পুড়ে গিয়ে অক্ষর তিনটি খোদাই হ'য়ে যেত হাতে হাতে। কি অভূতপূর্ব্ব নিদর্শন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সেবার মন্ত্রকে দেহে, মনে আত্মায় গেঁথে রাখার।

ঠাকুর চান নি যে, পাশের মানুষ, প্রতিবেশী মানুষ অসহায় দুঃখে কাঁদবে, অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে থাকবে,

মুমূর্ষু মুহূর্ত্তে একটুখানি সাহায্যের আর্ত্তি জানাবে, আর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ব'লে আমরা দোহাই দেবো—দুনিয়া ত্রিকালমেঁ নহীঁ হ্যায়, সব মায়া হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়। না তা কখনই নয়। ঠাকুর চেয়েছিলেন, দরদী মন, বিরাট বুক উদার প্রেম ভালবাসা সহানুভূতিতে ভরা অন্তর। তিনি ছিলেন করুণাবতার প্রেম-পুরুষ। সে করুণা সে প্রেম প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লীলাকালের প্রতিটি মুহূর্ত্তে। নির্ব্বিকল্প ভূমিতে নিরন্তর সমাধি সুখের আস্বাদনে বিভোর শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ যখন রাস্তার ধারে ফেলে যাওয়া অবহেলিত মানব শিশুর ক্রন্দনে বিচলিত পদক্ষেপে নেমে এসে, দিনের পর দিন তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে করেছেন মায়ের বাড়া স্নেহ দিয়ে সেবা যত্ন, তখন তাঁর সে-অপরূপ প্রেম মূর্ত্তির পানে চেয়ে মানুষ হয়েছে মুগ্ধ। গুরু রূপে আচার্য্য রূপে শ্রদ্ধা ভক্তির উচ্চাসনে বসে যেন তাঁর তৃপ্তি হ'ত না। সন্ন্যাসী শিষ্যদের, সন্ন্যাসিনী কন্যাদের কারও এতটুকু অসুখ হ'লে, সামান্য কিছু কষ্ট হ'লে, ছুটে যেতেন নিজেই স্বহস্তে তার সেবা পরিচর্য্যা করতে। তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে শিয়রে দাঁড়িয়ে থেকে জপ ক'রে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করেও ক্ষান্ত হতেন না। মুহুর্মুহুঃ খোঁজ নিতেন সে কেমন রয়েছে। উঠে উঠে চলে আসতেন তার কাছে। দিন রাত্রি তাঁর কাছে এক ছিল। তিনি থাকতেন সদা সজাগ। শুধু স্থূলে নয়, সূক্ষ্ম ভাবেও কত শিষ্য ভক্তের রোগ শয্যা পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তার ইয়ত্তা নাই। কত কত ভক্ত হাস-পাতালে বা রোগ শয্যায় পেয়েছে তাঁর আগমনের অনুভূতি। তাঁর সেই সূক্ষ্ম অমোঘ স্পর্শে তারা হয়েছে ভয় মুক্ত, হয়েছে রোগ মুক্ত।

মানুষের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, তাঁর সেবার ক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল পশুপাখী গাছপালা প্রভৃতি সর্ব্বজীবের মধ্যে। সেই কলেজ যাওয়ার দিনে পথের ধারে সাইকেল থেকে নেমে রুগ্ন কুকুরকে সযত্নে খাওয়ানোর মত দরদী ঘটনা তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে বহুবারই ঘটেছে। এসব কথার ইতি নেই। তাঁদের জীবনের এক একটি ঘটনা এক একটি নজির। মানুষের কাছে তিনি কি চান, তাই দেখিয়ে দিয়ে যান নিজের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের আচরণে। ঠাকুর সত্যানন্দের জীবনাদর্শ শিবজ্ঞানে জীব সেবায় নিষ্কাম আত্মোৎসর্গের আদর্শ। তাঁর শক্তিতে তাঁর কৃপায় আমরাও যেন চলতে পারি সেই আদর্শের পথে। নিষ্কাম সেবা কর্ম্মের অনুষ্ঠান অতি দুরূহ কাজ। পদে পদে ভয় রয়েছে আসক্তি এসে পড়ার, লোকমান্যের চাহিদা এসে পড়ার, অহংকার এসে পড়ার ঃ

"যেমন দরিদ্র সেবা করিয়া যখন
ভাবিতেছ হ'ল এবে অনাসক্ত মন।
কিন্তু এ কঠিন ভারি পদে পদে ভয়
অজানিতে আসক্তি যে এসে পড়ে হায়।"

(শ্রীঅর্চ্চনামা রচিত "শ্রীরামকৃষ্ণ গীতা" ২য় অধ্যায়)

তখন আমাদের মত সাধারণ শক্তিহীন মানুষের একটাই উপায়—প্রার্থনা। শ্রীরামকৃষ্ণ গীতায় যেমন রয়েছে ঃ

"কিন্তু নয়নের জলে ডাকি ভগবানে
চাহিবে নিষ্কাম ভাব আকুল পরাণে।" (ঐ)

প্রার্থনা জানাতে হবে আকুলিত চিত্তে যেন তাঁর কৃপায় তাঁরই শক্তিতে নিষ্কাম ভাব অটুট থাকে।

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেব সর্ব্ব রকমের সেবাকে দিয়ে গেছেন উচ্চ মর্য্যাদা। গুরু সেবা, মন্দির বিগ্রহ সেবা, সাধুসেবা, ভক্তসেবা, দরিদ্রনারায়ণ-আর্ত্তনারায়ণের সেবা, এ সবই তাঁর দেব জীবনে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘে মূর্ত্ত রূপ নিয়েছে এবং আজও চলছে। সেই ক্ষমা সুন্দর সেবা মূর্ত্তি সত্যানন্দের সন্তান আমরা। তাঁকে বুকে রেখে, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে, তাঁর গুণগান করতে করতে এগিয়ে যাবো আমরা। নিষ্কাম সেবানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই জগতের বুকে প্রতিষ্ঠা হবে সত্য-শিব-সুন্দরের, প্রতিষ্ঠা হবে শান্তি ও আনন্দের, আর সারা পৃথিবী মুখর হয়ে উঠবে বিশ্বহিত-কারী সত্যানন্দের জয়গানে—

"জয় সত্যানন্দ জ্ঞান গরীয়ান
সেবা ব্রতধারী
ত্যাগের মহিমায় চিরমহীয়ান
সত্য ব্রতচারী॥
মধুর সরল তোমার বাণী
হরিল সকল কলুষ গ্লানি
জীব সেবা তরে ধরি নরদেহ
ছড়ালে অমৃত বারি।
আচণ্ডালে বিলালে করুণা বিশ্বহিতকারী
ক্ষমা সুন্দর অন্তরে মম চির অলখ বিহারী॥"

অভিনয় ও সত্য

স্বামী বোধানন্দ

দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে আমরা সবাই ছোট বড় মাঝারি ধরণের অভিনেতা আর অভিনেত্রী। আর আমাদের এই দলের নায়ক—Hero যিনি, তিনি তাঁর অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্যে আমাদের প্রাণে বিপুল প্রেরণা সঞ্চার করেন, যা'তে তাঁর সঙ্গে আমরাও আপন আপন অভিনয় অংশটি সুষ্ঠু ভাবে করতে পারি, পালাটি সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে পারি।·· ····তারপর একদিন পালা সাঙ্গ হ'লে একে একে সবাই রঙ্গমঞ্চ হ'তে বিদায় নিই। আবার নতুন পালা আসে। নয়া রোশ্‌নাই-এ অভিনয় রাত্রি ঝলমল করে।·······রঙ্গমঞ্চ কখনো শূন্য থাকে না।

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।'······শতদৈন্যের মাঝে আজ বাঙ্গালীর জীবন শুকিয়ে যেতে থাকলেও বাংলার মাটির রস এখনো মরে যায়নি। মাটির মায়ের বুকের সুধা কখনো ফুরিয়ে যাবে না। এ বিশ্বাস আজও করি। কারণ, এই মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন বাংলার দুই ঠাকুর। বাঙ্গালী হৃদয়ের সকল ঐশ্বর্য্য—সকল শ্রেষ্ঠ গুণের মূর্ত্ত রূপ—শ্রীগৌরাঙ্গ আর শ্রীরামকৃষ্ণ।

বাংলার এই দুই ঠাকুর অভিনয় ভালবাসতেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর গদাধর সুন্দর থিয়েটার দেখতে কোলকাতা যেতেন। গিরীশ থিয়েটার ছাড়তে চাইলে তাকে বারণ করতেন, আর বলতেন—না ছেড়োনি, ওতে লোকশিক্ষে হবে। ভাবের রাজা ঠাকুরের বিচিত্র লীলাভিনয় দেখে নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্র নিজের মুখেই হার মেনেছিলেন।····আবার নবদ্বীপের ঠাকুর গৌরসুন্দর তো নিজেই থিয়েটারের বন্দোবস্ত ক'রে নিজে লক্ষ্মী ঠাকুরণ সেজে মাতৃভাবে বিভোর হয়ে স্তন্যদান করেছিলেন।

তেমনি আর একজনের কথা কোনদিন ভুলবো না। যাঁর হাসিখুসী, ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা, চলাফেরা—সবকিছুতেই ছিল অপূর্ব ছন্দমাধুর্য্য, আশ্চর্য্য শিল্পবোধ। তাঁকে না দেখলে ঠিক বোঝানো যায় না কথাটা। তাঁর নাম শ্রীসত্যানন্দ। আমরা নাম দিয়েছিলাম সত্যানন্দ সুন্দর। তিনি ছিলেন এক বিরাট জীবন-শিল্পী। দেশবিদেশের শিল্পীরা তাঁর দিব্য শিল্পময় জীবনের সান্নিধ্যে এসেছে। তিনি তাদের আপন আপন পথে আলোর সন্ধান দিয়েছেন। সে আলো সত্যম্, শিবম্ সুন্দরম্-এর আলো। সে আলো শিল্পীর জীবনে জেলে দেয় জ্যোতির দীপালিকা।

তাঁর সোনার কাঠির ছোঁয়া দিয়ে আমাদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা অভিনয়ের শক্তিকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন। ·······আজ মনে পড়ে—কত উৎসব রাত্রে দিব্য নাটক অভিনয়ের দৃশ্য।····· অভিনয় মঞ্চের কাছে মন্দির দুয়ারে ব'সে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি আমাদের অভিনয় দেখতেন। অভিনয় সুরু হওয়ার আগে তাঁকে প্রণাম করতুম। মাথায় আশিস্ স্পর্শ দিয়ে প্রেরণা দিতেন, শক্তি দিতেন। প্রণাম ক'রে যখন উঠতুম তখন শ্রীঠাকুরের আনন্দঘন মূর্ত্তি দর্শন ক'রে দেহমনের সমস্ত জড়তা, ভয় আর সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিমেষে দূর হয়ে যেত ; হৃদয়ে জেগে উঠত অপূর্ব এক ভাবের উদ্দীপনা।·······অভিনয় সুরু হত। দেখেছি—দৃশ্যে দৃশ্যে তাঁর শ্রীমুখের ভাবও হয়ে উঠ্‌ত অনুরূপ।····· এমনি একটি অভিনয় রাত্রির কথা। আশ্রম রচিত 'সাধক কমলাকান্ত' নাটকের শেষ দৃশ্যে 'রাজকবি'র চরিত্রে এই সন্তানের অভিনয়ের সময় শ্রীঠাকুরের মুখখানি আজও মনের পটে আঁকা আছে।—পৃথিবীর লীলাখেলা সাঙ্গ ক'রে শ্যামামায়ের ছেলে কমলাকান্ত মায়ের কোলে চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। নেপথ্য হ'তে বেহালার সুর থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। দৃশ্য শেষ হ'তে আর বেশী দেরী নাই। এমন সময় ধীরে ধীরে রাজকবি মঞ্চে প্রবেশ করলেন। ব্যথাহত হৃদয়ের অন্তস্তল

হ'তে ব'লে উঠলেন তিনি মহাসাধক কমলাকান্তকে স্মরণ ক'রে—"বেদনার কালীদহে……কমলে কামিনীর চরণতলে… ফুটে উঠেছিল একটি নিখাদ স্বর্ণকমল।……শরতের সোনার আলোয়…তার সব ক'টি দল মেলে…… উজাড় ক'রে দিয়ে গেল তার সৌরভ। তারপর নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে……ঝরা দলগুলি ঝরিয়ে দিয়ে গেল মায়ের চরণতলে।"— অভিনয়-শেষের মুহূর্ত পরেই ছুটে গেলুম শ্রীঠাকুরের চরণ প্রান্তে, দুই চোখে তখনো আমার অশ্রুধারা। ভাবে উদ্বেল হয়ে তাকিয়ে দেখি—শ্রীঠাকুরের পদ্মনেত্র দু'টিও অশ্রু ছল ছল। আবার প্রণাম করলুম আমার জীবন দেবতার চরণান্তিকে। তাঁর দিব্য শ্রীমণ্ডিত মুখখানি তখন আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠ্‌ল। মুগ্ধ দু'টি নয়ন মেলে চাইলেন। এই দীন সন্তানের মাথায় দু'খানি পদ্মহস্তে স্পর্শ করলেন। আশিস্ সুধায় ভরিয়ে দিলেন দেহ মন প্রাণ।…

জীবনের নূতন অধ্যায়ের দিনগুলিতে দেখেছি—অনন্ত শক্তিধর জ্যোতির্ময় পুরুষের শান্ত সমাহিত, ধ্যানসুন্দর মূর্ত্তি ……নিবাত নিষ্কম্প সমাধি নিথর রূপ।……আবার সেই দিব্য শিশুর মুখে হাসির ঝর্ণাধারাও দেখেছি—অভিনয়ের কত কৌতুক দৃশ্যে। ওই চন্দ্রিম মুখে পরমহংসের উচ্ছল হাসি আর অফুরাণ আলো দেখবো বলেই তো তাঁরই রঙ্গমঞ্চে মহা-কৌতুক রঙ্গে মেতে উঠেছি!

আবার দেখেছি—কোন নাটকে এক দ্বন্দ্বসংঘাতের চরিত্র সৃষ্টি করতে, চরিত্রটিকে ঠিক মতো ফুটিয়ে তুলতে— তিনি এক-দৃষ্টিতে তাঁর এই বিহ্বল সন্তানের দিকে চেয়ে—অভিনয়ে প্রাণ সঞ্চার করছেন।

এমনি ক'রে কত অভিনয়ই হ'ল।……তাই একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম শ্রীঠাকুরকে—"শুধু অভিনয়ই করা হ'ল!" শ্রীঠাকুর তখন উত্তর দিয়েছিলেন—"অভিনয়ও সত্য,—দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের একথাটি মনে রেখো; 'আসল নকল এক দেখছি'—এটিও তাঁরি কথা জেনো। তবে, সেই চোখ দিয়ে দেখতে হবে।……একটি দিব্য চরিত্রে রূপ দিতে হ'লে তদ্ভাবে ভাবিত হ'তে হবে। সেই দিব্য অভিনয় যারা দেখবে, তাঁদের মনেও একটা বিশেষ ছাপ থেকে যাবে।…… আমি চাই—তোমাদের মধ্যে যে সকল গুণ আছে সেগুলিকে নিয়ে দিব্যতার দিকে এগিয়ে চল। দিব্য হ'তে দিব্যতর হও তোমরা।

সেই মরমী শিল্পীর শুভ্র সুন্দর চন্দ্রমুখে ছিল আনন্দের অমিয় ধারা। দৃষ্টি-প্রদীপে ছিল মুগ্ধ আবেশ। মন প্রাণ ভ'রে উঠ্‌ত উদ্দীপনায়। অভিনয় হয়ে উঠত প্রাণস্পর্শী। একাকার হয়ে যেতুম তার মধ্যে।

ফেলে আসা সেই সব আলো ঝলমল রাত আর কি ফিরে আসবে?

জীবনের পত্রালিকা কত বর্ণে, কত সুষমায় রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছিল তাঁরই মোহন তুলিকা স্পর্শে। জীবন এক আনন্দলোকে জেগে উঠেছিল তাঁরই স্নেহ মাধুরীতে।……সেই মধুময় ক্ষণ কি স্বপ্নই হ'য়ে থাকবে? এখন হ'তে কি চোখের জল আর মুখে হাসি দিয়ে জীবনের ছিন্নপত্রেই আল্পনা আঁকব? আর তাঁর গানের কথাগুলি এমনি ক'রেই মনের মালায় গেঁথে রাখ্‌ব?—

"জীবনের ছিন্ন পত্রালিকায়
কে গো রং-এর তুলিকা বুলায়!"

আমার সত্যব্রত দাদা

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (বেলানগর)

স্বামী সত্যানন্দ আপনাদের গুরুদেব। তিনি আমার গুরুভাই। আমি বরাবর, চিরকালই তাঁকে সত্যব্রত বলে ডাকতাম। সত্যব্রতদা যখন কলেজে পড়তেন, তখনই আমাদের শ্রীগুরুদেব পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তদবধি তিনি স্বামীজী মহারাজের নির্দেশানুসারেই সাধন ভজন করতে থাকে মাঝে মাঝে বেদান্ত সমিতিতে এসে শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করতেন। যখনই উনি শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করতে আসতেন,- কখনও শূন্যহাতে আসতেন না। ফল-ফুল, কাপড়-মিষ্টি-অর্থাদি-শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে অর্পণ করতেন। যখনই তি শ্রীগুরুদেবের কাছে আসতেন, তাঁর সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করতেন, তাঁকে প্রশ্ন করতেন। শ্রীগুরুদেবও তাঁর প্রশ্নের উ দিতেন। এরূপভাবে বহু বৎসর সত্যব্রত দা গুরুসংঙ্গ লাভ করেন।

বাড়ীতে সত্যব্রতদা অতি দীনভাবে দিন যাপন করতেন। বাড়ীতে সর্বদা উনি কাপড়ের খোট গায়ে দি থাকতেন। বারমাসই তাঁর এই পোষাক। এমন কি, শীতকালেও তিনি কোন রকম কাপড় ব্যবহার করতেন না। তা একটি পুরাণো কোট ছিল। আশ্রমে আসার সময় সেইটি গায়ে দিয়ে আসতেন।

সত্যব্রতদার চরিত্র, পাণ্ডিত্য এবং তপস্যা দেখে শ্রীগুরুদেব একবার তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি আমাদের দার্জি আশ্রমে যোগদান কর।" তাইতে তাঁর পিতা মহেন্দ্রবাবু কেঁদে কেঁদে স্বামিজী মহারাজকে বলেছিলেন, "সত্যকে ছে আমি জীবন ধারণ করতে পারব না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সত্য বাড়ী থাকুক। আমি বাড়ীর ছাদে ত জন্যে পৃথক ঘর ক'রে দিচ্ছি। সেখান থেকেই সে তপস্যা ও অধ্যয়ন করুক।" মহেন্দ্রবাবুও স্বামিজী মহারাজকে গভী শ্রদ্ধা করতেন। বৎসরে একবার করে শ্রীগুরুদেব এবং বেদান্তমঠের সমস্ত সাধুদের তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতেন,- সাধুসেবা করতেন।

সত্যব্রতদার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা মধুর ভালবাসার ভাব ছিল। তিনি আমাকে বলতে "কাশীপুর শ্মশানে এলেই আমাদের বাড়ী আসবেন। সেখানেই খেয়ে যাবেন। যদি আমাদের বাড়ী না আসেন, আমাদে বাড়ী না খান, তবে বুঝব যে আপনি আমাদের ভালবাসেন না। আপনি পর। অন্য কোন গুরুভাইকে সঙ্গে ক যখনই কাশীপুর শ্মশানে আসবেন, আমাদের বাড়ী আসবেন,—আমাদের বাড়ীতেই আহার করবেন।" গুরুভাইদের প্র এমনই ছিল তাঁর গভীর মমতাপূর্ণ ভালবাসা। আজও আমার মনে পড়ে তাঁর গভীর ভালবাসার কথা। তিনি এক মহান্ প্রেমিক পুরুষ ছিলেন।

একবাড়ীতে বাস করেও বাড়ীর কোন মেয়েদের মুখের দিকে তিনি তাকাতেন না। এমন কি, নিজের বৌদি মুখের দিকেও তিনি তাকাতেন না। বাড়ীতে খড়ম পায়ে চলাফেরা করতেন। তাঁর খড়মের আওয়াজ শুনলে সক মেয়েরা সরে যেত। আমরা রামায়ণে পড়েছি, লক্ষ্মণ রামসীতার সঙ্গে একত্রে চৌদ্দ বৎসর বাস করলেও একদিনের জন্য তিনি সীতার মুখ নিরীক্ষণ করেন নাই। এই যুগে এমন ব্রহ্মচর্য আর লক্ষ্মণের মত এমন ভাব আর দেখা যায় না, যেমন আমি দেখেছি সত্যব্রতদার মধ্যে। সকল স্ত্রীলোককে তিনি হয় 'মা' আর না হয় 'দেবী' মনে করতেন।

সত্যব্রতদার মধ্যে কোন জিনিষের প্রতি কোন লোভও ছিল না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্লোভী পুরু একবার আমি হাওড়া ষ্টেশনে দেখলাম, সত্যব্রত দা সিউড়ী যাচ্ছেন। তাঁর ভগ্নীপতি, রামবাবু একঝুড়ি আতাফল নি গেছেন স্টেশনে তাঁকে দেবার জন্য। তিনি সেই ঝুড়ি হতে একটিমাত্র আতাফল তুলে নিয়ে বললেন, "এইটি আ নিয়েছি। আর আমার লাগবে না। রাম, তোমরা বাড়ীতে সকলে এই আতাফল সেবা ক'রো, তা'হলেই আমার সে হবে।"

আহার সম্বন্ধেও সত্যব্রতদা খুব সংযমী ছিলেন। এমন মিতাহারী পুরুষ দেখা যায় না। সাধনার প্রথম অবস্থায় এক মুষ্টি তণ্ডুল মাত্র কুকারে নিজে ফুটিয়ে খেতেন। সঙ্গে থাকত একটা আলু বা পটল সিদ্ধ। নুন না দিয়ে তাই খেতেন। কখনও দুধের সঙ্গে—একটু ময়দা গুলিয়ে খেতেন। পরবর্তীকালে শুধু জলে সিদ্ধ করে একটু বেগুন আর একটু দুধ ছিল তাঁর আহার। সত্যি এমন ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ জীবন বর্তমান যুগে দুর্লভ। বহু বছর ধরে বাড়ীর ছাদের ঘরে থাকতেন তিনি। সেখানে একাকী তিনি তপস্যা করেছেন, ধ্যানধারণা করেছেন, প্রাণায়াম-যোগসাধনা করেছেন। এমন তপস্বীও আজকাল আর দেখা যায় না। সত্যব্রতদার ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাধনা সকলের অনুকরণীয়।

পিতার জন্য সত্যব্রত দা বেদান্ত সমিতিতে যোগদান করতে পারলেন না সত্য, কিন্তু এক হিসাবে, শ্রীগুরুদেবের মনোবাসনা তিনি অন্যভাবে পূরণ করলেন। তিনি নিজে বীরভূমের নানাস্থানে, বরাহনগরে জনসেবাকর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে স্বামিজী মহারাজের মনোবাসনাকেই রূপদান করেছেন। তাঁর গুরুভক্তি ছিল অতুলনীয়। সত্যব্রত দা তাঁর জীবনে যা কিছু করে গেলেন, তা সবই তাঁর শ্রীগুরুদেব স্বামী অভেদানন্দজীর আশীর্বাদে।

আমি পৃথিবী পর্যটন করেছি। অনেক সাধু সন্ত মহাত্মা আমি দেখেছি। আমার মনে হয়—বর্তমান সময়ে সত্যব্রতদার মত এমন ত্যাগ-তিতিক্ষা পরায়ণ সাধু আমাদের দেশে বিরল। তাঁর ছিল ত্যাগময় ও তপস্যাময় জীবন। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের সমন্বয় সাধন করেছিলেন তিনি। সতব্রতদার জীবনের সাধনার মূলভাব ছিল ভালবাসা-পবিত্রতা-তপস্যা। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় ভাব প্রচার করা। দিব্য জীবনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম-জীবনেরও প্রেরণার উৎস ছিলেন তিনি। সত্যব্রতদার লেখা অসংখ্য জীবনী-নাটক-ধর্ম-দর্শন-সঙ্গীত প্রভৃতি পুস্তকের মধ্যে World Philosophy ; World Ethics গ্রন্থ দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বরাহনগরে মণিমন্দির প্রতিষ্ঠা করে তিনি এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন।

বরাহনগরের এক মহিলা ভক্ত এবং সাহিত্যিক আমাকে একদিন বলেন, "আপনার গুরুভাই বরাহনগরের উজ্জ্বলমণি স্বরূপ।" এই কথা শুনে, আমি তাঁকে উত্তরে বললাম, "তিনি শুধু বরাহনগরের উজ্জ্বল মণি হবেন কেন? তিনি বীরভূমেরও উজ্জ্বল মণি। আমি আরও বলি, তিনি ভারতের সাধুসমাজের এক উজ্জ্বল রত্ন।"

সত্যব্রতদা জন্মগ্রহণ করেন ১৯০২ সনে, দেহত্যাগ করেন ১৯৬৯ সালের ৫ই আগষ্ট। ৬৮ বৎসর কাল তিনি মর্তকায়ায় ছিলেন। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি তাঁর ভক্ত শিষ্যদের ইঙ্গিতে বলেছিলেন, তাঁর মহাপ্রস্থানের সময় আসন্ন। আমার এই গুরু ভাইয়ের নাম ছিল সত্যব্রত। আজীবন তিনি সেই সত্যস্বরূপকে ধরে, তাঁর স্মরণ মনন করে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে গেলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামী অভেদানন্দও বলেছেন,—

"মনুষ্যরূপেতে হরি করেন বিহার,
জানি এই সত্য, সবে কর সেবা তাঁর।"

সারাজীবন সত্যব্রতদা স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের আদর্শকে গ্রহণ করে জীব সেবা করতে করতে নিজ জীবন উৎসর্গ করলেন। সার্থক গুরু, আর সার্থক তাঁর শিষ্য।

———

কুশল তো গোবর্ধন ?

ব্রহ্মচারী গদাধর চৈতন্য

সেদিন মাণিক জ্যাঠার ঘরে একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী এসেছিলেন। মৃগেনদা (স্বামী মৃগানন্দ) তাঁর সঙ্গে গান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এমন সময় দিদি (অর্চনা দি) মানিক জ্যাঠার ঘরে এলেন সেই সঙ্গীত শিল্পীটি অর্চনাদিকে গান করতে অনুরোধ জানালেন। তারপর অর্চনাদি গান গাইতে আরম্ভ করলেন এবং তবলা বাজাবার জন্যে আমার ডাক পড়ল। গান শেষ হলে সেই সঙ্গীত শিল্পীটি অর্চনা দিকে বললেন, কি সুন্দর কণ্ঠ আপনার, এমন সুন্দর গান আর কোথাও শুনতে পাওয়া যায় না। আমার তবলা বাজানো শুনে বললেন, কি সুন্দর আপনার হাত, আমার তবলা বাজানো শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন। তখন মৃগেনদা (স্বামী মৃগানন্দ) বললেন, যেখানে সুর, যেখানে গান, সেইখানে সুর আর লয়ের প্রয়োজন। আমাদের আশ্রম গানের সিদ্ধপীঠ। এখানে বহু সঙ্গীত শিল্পী গাইতে আসেন। গদাই দার তবলা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়েছেন ও প্রশংসা করেছেন। গত বৎসর ৭ই শ্রাবণ পূজনীয়া অর্চনা দি'র জন্মদিন ছিল। সারা ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেতার শিল্পী পণ্ডিত রবিশংকরের সুযোগ্য ছাত্র কার্ত্তিক কুমার ও আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের অন্যতম গীটার শিল্পী শ্রীবরুণকুমার পাল এসেছেন। তাঁরা অর্চনাদিকে তাঁর জন্মদিনে সুরের ভেট দিতে এসেছেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ওঁরা অর্চনাদি'র গাওয়া একটি ঠুংরী ও দুটি ভজন টেপ করে নিলেন। সঙ্গত করলাম আমি। কার্তিক দা আমার বাজনা শুনে খুব খুশী হলেন। এরপর ছিল তাঁদের ডুয়েট প্রোগ্রাম। কার্ত্তিক দা ধরে বসলেন আমাকে, আপনি আমাদের সঙ্গে বাজাবেন। আমি আর কোনও তবলচি চাই না। আমি যেন থতমত খেয়ে গেলাম। স্বাভাবিক ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে বলি আমি ও পারব না। আমি দিদির সঙ্গে বাজাই অন্য কোন আসরে বাজাই না। কার্ত্তিক দা তবু জোর করেন। কিন্তু আমি কোন রকমে এড়িয়ে পালিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। বাস্তবিক কোন ওস্তাদের কাছে নিয়মিত তালিম তো নিই নাই। যেটুকু বাজাই মন্দিরের আরতিতে সেটুকু পূজো আরতির গানের সঙ্গেই ফুটে ওঠে ঠাকুরের কৃপায়। আমার জীবনের সবটুকু ঠাকুরের কৃপা। আমার তবলা সঙ্গতের শুরু হয়েছিল ১০ বছর বয়সেই। সেবার সিউড়ীতে সারদা মায়ের সেন্টেনারির সময় অর্চনা দি আরতিতে গান গাইছেন, পাশের ঘরে তবলা টেনে নিয়ে আমি একটা আড়ালে বসে বাজাতে লাগলাম। বাজনা ঠাকুরের খুব ভালো লেগেছিল। জিজ্ঞেস করলেন কে বাজাচ্ছে। গৌরিদা (স্বামী গৌরানন্দ) ঠাকুরকে জানালেন, গদাই বাজাচ্ছে ঠাকুর। বেশ তাল লয়ে বাজাচ্ছে ! ঠাকুর খুশী হয়ে আমাকে দিলেন একটা আশীর্বাদী লকেট। আর বললেন, তুই আরতিতে এবার থেকে রেগুলার বাজাবি। সে আশীর্বাদ আজও রয়েছে আমার মাথার ওপর। একদিন আরতিতে একজন ভাল ওস্তাদের কাছে তালিম পাওয়া তবলচি আমার কাছ থেকে তবলা চেয়ে নিয়ে বাজাতে লাগল। কিন্তু তার বাজনা একেবারে হচ্ছে না। ভুলভাল যা খুশী বাজাচ্ছে। কিছুতেই তালে আনতে পারছে না। দিদিও গান গাইতে গাইতে খুব বিরক্ত হয়েছেন, ঠাকুর খুব বিরক্ত হয়ে গিয়েছেন। আসলে সে তখনও বোঝেনি আমরা বাজাই না, বাজান তিনিই। তাঁর শক্তি আর তাঁর কৃপায় সবকিছু হয়। ঠাকুর সেদিন আদেশ করলেন অর্চনা মা'র সঙ্গে আশ্রম ব্রহ্মচারীরা ছাড়া অন্য কেউ না যেন বাজায়। অবশ্য এর বহু ব্যতিক্রম তিনিই পরে করেছিলেন। আমি ছাড়া অমল দা, শ্যামল দা, বিমল দা, অরুণ দাও অর্চনাদির সঙ্গে তবলা বাজাতেন। কিন্তু বহু বিখ্যাত শিল্পীকেও ঠাকুর বাজাতে দিয়েছেন পরে দিদির সঙ্গে। এদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে রথীন ঘোষ, কানাই দত্ত, শঙ্কর ঘোষ, নিমাই ভট্টাচার্য, বিনয় অধিকারী, অজিত মৈত্র (সঙ্গীত

বিশারদ, শ্রীরামকৃষ্ণ সুর ভারতী সিউড়ী', তবলা বাজানোর কথায় অনেক মজার ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে আজ। একদিন দিদি গাইছেন আরতিতে তন্ময় হয়ে। শ্রীঠাকুর আসনে বসে রয়েছেন, মাঝে মাঝে ধ্যানের গভীরে ডুব দিয়ে আবার উঠে এসে প্রেম মুদিত নয়নের মধুর দৃষ্টিতে গোপালজীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন। ভক্তরা কেউ জপ নিষণ্ণ, কেউ গান শুনছেন মুগ্ধ হয়ে—দিব্য ভাবময় সুরময় পরিবেশ, আমার কিন্তু সেদিন খুব ঘুম পেয়েছে, তবলা বাজাতে বাজাতে ঢুল হাসছে, অনেক কষ্টে সামলে নিতে গিয়েও বাঁ হাত থেমে যাচ্ছে বাঁয়ার গায়ে, ডান হাত ঝুলে পড়ে যাচ্ছে তবলার গায়ে। দিদি (অর্চনা দি) দু'একবার তাল কাটতেই ঘুরে তাকিয়েছেন দরজার কাছে উপবিষ্ট আমার পানে। হাসি চেপে গেয়ে চলেছেন। বার কয়েক এরকম হওয়ার পর আর থাকতে না পেরে ইশারায় দেখিয়ে দিলেন শ্রীঠাকুরকে আমার কাণ্ড। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে জোরে বলে উঠলেন মন্দিরের ভেতর থেকে, এই ভোঁর শিয়েল, ওঠ্‌রে ভাল করে বাজা। হ্যাঁরে তোর এত ঘুম ! সচেতন হয়ে বাজাতে শুরু করি, ভয়ে লজ্জায় ঘুম এখন কেটে গ্যাছে উপস্থিত সকলের হাসির খোরাক হয়ে।

আরও হাসির ব্যাপার হয়েছিল একদিন। তবলা বাজাছি অর্চনাদির সঙ্গে। গান জমেছে বেশ। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন তাল লয় সব গুলিয়ে যাচ্ছে। দিদি সচকিতে ফিরে তাকালেন। আমি তখন হাসছি আপন মনে, বাজনায় আমার মন নেই, মন একটা চিন্তার ডানায় ভর করে উড়ে উড়ে গেছে দূর অজানা পথে। বকুনি খেয়ে ঠিক করে বাজালাম। গানের শেষে দিদি জিজ্ঞেস করেন "হ্যাঁরে গদাই কি ভাবছিলি তখন", হেসে উঠে লজ্জিত ভাষায় বলি, একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। একজন মাথায় জলের একটা জালা নিয়ে যাচ্ছে। মাটির জালা ভর্ত্তি জল, কেউ একটা লাঠি নিয়ে তার পেছন থেকে এক বাড়ি মেরে হাঁড়িটা ভেঙে দিলে। লোকটার কি অবস্থা হবে তাই ভেবে হাসি পাচ্ছিল। শুনে প্রথমত দিদি খুব হাসলেন, তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে ঠাকুরকে বললেন ঘটনাটা। শুনে ঠাকুরও হেসে গড়িয়ে পড়লেন। আর হাসলেন যারা শুনলেন সবাই। আর একদিন ঠিক এমনি ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। সেদিন তবলা বাজাতে বাজাতে আমার মনে ভেসে উঠেছে কোন গানের জলসার দৃশ্য। খেয়াল গান চলছে। বড় একজন নামকরা ওস্তাদ গান করছেন, আ-আ-আ করে তান দিচ্ছেন। ঠিক এই সময়ে একটা মশা ঢুকে পড়ল মুখে। তখন ওস্তাদের সে কি অবস্থা হবে তাই ভেবে হাসছি। আর সমানে তাল পিছলে যাচ্ছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে শুনে ঠাকুর খুব হেসেছেন। আর আজ অবধি সবাই হাসে কথাটা স্মরণে এলেই।

সেই বিরাট শিশু ছিলেন সাক্ষাৎ ব্রজের গোপাল। তাইতো আমাদের মত সঙ্গীদের নিয়ে জমে উঠত কত রঙ্গরসের খেলা। ব্রজের কৃষ্ণের প্রেম ঘন সত্ত্বায় আনন্দ সত্ত্বায় পূর্ণ আমাদের ঠাকুর প্রতি বছর করতেন গোষ্ঠের আয়োজন। বরানগরে গোপাল সায়রের দিকে বিস্তৃত বাগান এবং ফাঁকা জায়গাটিতে গোষ্ঠের লীলা হোত। সেবার ঠাকুর আমাকে আর মণ্টুকে বললেন, "তোরা গোয়ালা সেজে আসবি", ঠাকুর বলেছেন আর কি, মাল কোঁচা মেরে কাপড় পরে, গোঁফ লাগিয়ে, পাগড়ী বেঁধে পাঁচন (লাঠি) হাতে গরু খেঁদাতে খেঁদাতে হাজির হলাম গ্রাম্য দুটি গয়লা। আমাদের গোষ্ঠে আগমনে উঠল হাসির রোল। ঠাকুর খুশী হলেন খুব। সন্ন্যাসিনী মায়েরা, সাধু ব্রহ্মচারী আর ভক্তরা সবাই আনন্দ করলেন। প্রসাদ দিলেন বেশী করে আমাদের। বিকেলে আবার ঐ সাজ সেজে আসতে বললেন। রাখালরাজের এ লীলা যেন চির মধুর, চির নতুন। গোষ্ঠের মত রাসোৎসবেও খুব আনন্দ করতেন শ্রীঠাকুর। রাস রাসেশ্বরী শ্রীরাধা আর রাসেশ্বর গিরিধারীর অপরূপ মূর্তিযুগল সাজিয়ে গোপালজিকে গদাধরকে সাজিয়ে, বড়ো করে পূজা-আরতি, গান-বাজনা, আনন্দ-উৎসব চলছে রাকা রজনী জোছনা-মদির প্রহরে। সন্ন্যাসিনী মায়েরা করছেন পূজা-আরতি ভোগ নিবেদন, পরিবেশন করছেন গান-ভজন। কৃপাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট অধিকারী ভক্তরা ভিড় করে রয়েছেন সাধু ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব ছিল প্রসাদ বিতরণ। আমি থালা ধরে দাঁড়িয়ে আছি, শ্রীঠাকুর প্রসাদগুলি বিলিয়ে দিচ্ছেন ভক্তদের। তৃতীয় পর্ব ছিল সিঙাড়া। দু'তিন জনকে দিয়েই ঠাকুর আমাকে চুপি চুপি বললেন লুকিয়ে পড়তে এবং সুযোগও করে

দিলেন। ফাঁক বুঝে আমি সিঙাড়ার থালা সহ উধাও। খোঁজ খোঁজ রব উঠল। হৈ হুল্লোড় করে সব খুঁজতে লাগল। ঠাকুর আনন্দ করে দেখতে লাগলেন। কেউ বাগানে খুঁজছে, কেউ ঘরের কোণে, শেষে পশুপতি সেন খুঁজে বার করলেন আমাকে। ঠাকুর খুব খুশী হয়ে আমাকে আর পশুপতিদাকে প্রদাদ দিলেন। আবার হাসি আনন্দের মাঝে চলে প্রসাদ বিতরণ। সেবার রাস হয়েছিল দুবরাজপুরে।

দুবরাজপুরেই আর এক ছায়ামেদুর আসন্ন সন্ধ্যায়। আশ্রমে মায়েরা হোম করছেন মায়েদের কম্পাউণ্ডের বারান্দায় বসে। কেউ কেউ অন্য কাজে মগ্ন রয়েছেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁরা লক্ষ্য করলেন একজন অপরিচিত যুবক লং কোট, টুপি, চশ্মা ইত্যাদি পরে মায়েদের কম্পাউণ্ডে আনাগোনা করছে। বার কয়েক আড়চোখে দেখলেন মায়েরা, কারন ছেলের দিকে তো সরাসরি তাকাবেন না। মনে হয়েছে লোকটির হাব ভাব সুবিধা জনক নয় মোটেই। কেমন যেন সন্দেহ জনক চলাফেরা। মায়েদের কম্পাউণ্ডেই বা আসবে কেন সে। একটা চাপা গুঞ্জন উঠল ভয় আশঙ্কার। তাড়াতাড়ি ঠাকুরের কাছে ছুটলেন একজন খবর দিতে। রঙ্গময় দেবতা কৃত্রিম আশঙ্কায় খোঁজ নিতে লোক পাঠালেন। ডাকলেন স্বামী অরুণানন্দ এবং অন্যান্যদের। ধরা পড়ল সেই লোকটি। অরুণদার ওভারকোট, টুপি এবং চশ্মার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। তখন সবার সে কি হাসি সে কি আনন্দ। ঠাকুরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উপভোগ করছেন মায়েদের এই অপ্রস্তুত অবস্থা। অর্চ্চনাদি জানতেন ব্যাপারটা। কিন্তু মজা দেখার জন্য বলেন নি কাউকে। সে দিন খুব বেশী করে প্রসাদ পেয়েছিলাম শ্রীঠাকুরের হাতে। সেদিন আমাকে সাজিয়ে যেমন সবাইকে ঠকিয়েছেন, তেমনি একদিন আবার আমাকেই ঠাকুর খুব বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন সবার সামনে। ঠাকুর তখন প্রায় দিনই রাত্রে সন্ধ্যাভোগের পর সবাইকে গোপালের প্রসাদ দিতেন। সেদিন গোপালের ভোগ দেওয়া হয়েছে গরম চপ। অনেক কেই দেওয়া হয়ে গেছে প্রসাদ, থালার একপাশে তখনও দুটো খুব বড় বড় চপ রাখা হয়েছে একটু আলাদা করে। আমার বিশেষ নজর ঐ দুটোর উপর। ঠাকুর যেন ওই দুটো আমাকেই দেন, মনে মনে চাইছি আমি। ঠাকুরের নজরে তা এড়ায় নি। হাত বাড়িয়েই চাইলাম ঐ দুটো চপ। ঠাকুর দিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে, তাড়াতাড়ি মুখে ফেলে কামড় দিতেই 'ওরে বাবারে' বলে চেঁচিয়ে উঠেছি। এই চপ দুটি ছিল বড় বড় লঙ্কা, নিম পাতা আর আলুর চোকায় ভরা। মুখে দিতেই ছট-ফট করে উঠেছি, ঠাকুরের তখন সে কি আনন্দ। জোর হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, এপ্রিল ফুল, এপ্রিল ফুল। আর আগে থেকে যারা জানত, আর যারা জানত না সবাই পেল প্রভূত আনন্দ, অবশ্য তারপরে শ্রীঠাকুর দু'টি চপ দিয়েছিলেন আমাকে। সত্যিই সেদিন ছিল ১লা এপ্রিল, ১৯৫৭। এমনি হাসি রঙ্গের মাঝেও কিন্তু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের জীবন গড়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল শ্রীঠাকুরের। ঠাকুর ব্রহ্মচারীদের জন্য নিয়ম করেছিলেন, ভোর সাড়ে চারটে পোনে পাঁচটের মধ্যে সব এসে বারান্দায় বসে ধ্যান জপ করবে। শ্রীঠাকুর প্রত্যেকদিন সাড়ে চারটের সময় মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় ধ্যানে বসতেন। যদি কোন ব্রহ্মচারী আসতে দেরী করত শ্রীঠাকুর তাকে গঙ্গার ধারে দাঁড়াতে বলতেন। প্রায় দিনই দুজন তিনজন করে গঙ্গার ধারে কান ধরে দাঁড়াত। একদিন শ্রীঠাকুর বললেন পাঁচটার পর যারা আসবে তারা, সোজা ঘুম থেকে উঠেই কান ধরে দাঁড়াবে, শ্রীঠাকুর দেখলেন একদিন বারান্দায় জপ করছে মাত্র তিনজন আর গঙ্গার ধারে কান ধরে জপ করছে আটজন। তার মধ্যে আমি একজন। শ্রীঠাকুর পরে ধ্যান থেকে উঠে হেসে বললেন এবং সকলকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, দেখ মানিক (স্বামী নির্বেদানন্দ) এই বয়সে ওঠে রাত্রি আড়াই টায়, উঠে জপ করে নাম করে। আবার চানটান করে এসে বসে আমার কাছে। আমি তোদের সাড়ে চারটায় এসে একটু বসতে বলি, এটুকু তোরা করছিস না ? এই তো তোদের জপধ্যানের সময়। এখন যদি ঘুমোবি তো জপধ্যান করবি কখন ? সেদিনের সে শিক্ষা আমাদের এগিয়ে দিয়েছিল আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে। জপধ্যান ছাড়াও লেখাপড়া ছিল ঠাকুরের খুবই প্রিয়। স্কুল করলেন আশ্রমে, আরতিদি, সুমনাদি শরণাদি প্রভৃতি সন্ন্যাসিনী মায়েরাই পড়াতেন। শ্রীঠাকুর মাঝে

মাঝে ক্লাস নিতেন, বিশেষ করে ধর্মের ক্লাসটি ঠাকুর নিতেন। হাফইয়ারলি পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। শ্রদ্ধেয় সুমনাদি আমাদের ক্লাস করাতেন ও পরীক্ষা নিতেন। সুমনাদি অঙ্কের খাতা দেখেছেন। কেউ ১০০র মধ্যে ১০০, কেউ ৬০, কেউ ৫০, কেউ ৮০ এরকম নম্বর পেয়েছে। আমি অঙ্কে ১০০ এর মধ্যে ৬ পেয়েছি। সুমনাদি সেই সময় একহাতে আমার কান ধরে আর একহাতে অঙ্ক খাতা নিয়ে শ্রীঠাকুরের কাছে নিয়ে গেলেন। ঠাকুর দেখে বললেন খালি সারাদিন খেলে বেড়াবি তো পড়াশুনো করবি কখন? তুমি যখন অঙ্কে ৬ পেয়েছ তোমাকে তেমনি শাস্তি পেতে হবে। সুমনাদিকে বললেন যে ওর পীঠে একটা কাগজে বড় অক্ষরে লিখে দাও ও একটি আশ্রমের জীব, অঙ্কে ৬ পেয়েছে। তারপরদিন বললেন তুমি এ অবস্থায় বাজার যাবে এবং ভিক্ষে করে আনবে। বলবে আমি অঙ্কে ৬ পেয়েছি সেইজন্য আশ্রম থেকে ভিক্ষে করতে বলা হয়েছে। আমিও শ্রীঠাকুরের আদেশ মাথায় নিয়ে এমনাবস্থায় বাজারে গিয়ে ভিক্ষে করে নিয়ে এলাম এবং শ্রীঠাকুরের কাছে ভিক্ষার যা পেয়েছিলাম সব নামিয়ে দিলাম, স্বয়ং ভগবানের হাতে শাস্তি, এতো শাস্তি নয়। শাস্তির ছলে কৃপা। তাই তো আজ সে সব কথা স্মরণ পটে উদিত হলে এত মিষ্টি লাগে। ঠাকুরের কৃপায় আজ ম্যাট্রিক পাস করেছি। যে ইস্কুলে পড়েছি ছাত্র হয়ে, আজ সেই স্কুলেই প্রাইমারী সেকসানে ছোটদের পড়াই; শ্রীঠাকুরের কাছে শাস্তি পাওয়ার পর বলতেন, ভয় কি আমার কাছে আয় এবং অনেক ভাল কথা বলতেন, তারপর হাতভরে প্রসাদ দিতেন।

শাস্ত্রপাঠ ছিল ঠাকুরের খুবই প্রিয়। দিনে দুটো সময় অবশ্যই বসতেন সবাইকে নিয়ে সমবেত শাস্ত্র আলোচনার জন্য। রাত্রে একটা সিটিং হত। সাধু ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কে এলো কে এলো না তার খোঁজ নিতেন। রাত্রি ১০-১৫ এর মধ্যে সবাইকে বসতে হত মন্দিরের বারাণ্ডায়। আমি অবশ্য কোন কঠিন আলোচনা বুঝতে পারতাম না। আমি জানি আমার ঠাকুর আছেন, অর্চনা দি আছেন, আমার ঠিক হয়ে যাবে। সেদিন যারা আসেনি বা আসতে দেরী করেছে তাদের সবাইকে ডেকে ঠাকুর বকছেন। আমি ছিলাম সেই দলের সবচেয়ে পেছনে। চুপি চুপি সবার চোখ এড়িয়ে গুড়ি হয়ে গুড় গুড় করে পালাচ্ছি। কিন্তু সবার দৃষ্টি এড়াল, এড়ায় নি একজনের, তিনি ঠিক ধরে ফেলেন পলাতক যে। প্রথমে আমার পালানোর ভঙ্গী দেখে হেসে ফেলেন ঠাকুর, পরক্ষণে সন্তানের শিক্ষার জন্য কৃত্রিম গাম্ভীর্যের ভান করে কড়া শাস্তি দিলেন, যাও কান ধরে দাঁড়িয়ে জপ কর এক ঘণ্টা। মণিমন্দির প্রতিষ্ঠার পর রোজ সন্ধ্যা সাড়ে ছটার মধ্যে প্রার্থনা আরম্ভ করতে হোত। শ্রীঠাকুর আমাকে আর মণ্টুকে বলেছিলেন সবাইকে নিয়ে প্রার্থনায় বসবি। নমো নমো গুরু ভগবান থেকে শুরু করে কয়েকটি ভজন গান করতে হোত। ঠাকুর সময় সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। কাজেই সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ছুটত আশ্রমের সবাই বিভিন্ন বিভিন্ন কাজে, সেদিন সাড়ে ছটা বেজে গেছে, গান তখন হচ্ছেনা দেখে ঠাকুর ডেকে পাঠালেন আমাদের সতী মাকে দিয়ে। ঠাকুর ডাকছেন শুনেছে মণ্টু, একদিক দিয়ে ছুটে মণিমন্দিরে চলে গেল, আর আমি পেছনের বাগান দিয়ে ছুটে আসতে আসতে ঠাকুরের ঘরের জানালার সামনে থেকে নমো নমো গুরু ভগবান বলে জোরে জোরে গাইতে শুরু করে দিয়েছি। ঠাকুর বললেন এখন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গান করা হচ্ছে! এতক্ষণ কোথায় ছিলে বাবা, সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে খেয়াল আছে? আমি আর কথা না বলে মণ্টুর সঙ্গে গাইছি গানের পর গান। আমার তো জপ ধ্যান শাস্ত্রপাঠ এসব কিছু ছিলনা তাই ঠাকুর আমাকে দিয়ে ছিলেন মণিমন্দিরের নানা কাজের ভার, মন্দিরের সেবায় আমার বেশ আনন্দ হতো। অর্চনাদি শ্রীশ্রীমায়ের ও ঠাকুরের বেশ পরিবর্তন করতেন প্রত্যেক মঙ্গলবার আর শনিবার। তখন আমি অর্চনাদিকে যোগাড় করে দিতাম। ঠাকুর আমাকে বলে দিয়েছিলেন যখন অর্চনা মা মন্দিরে থাকবে তখন সঙ্গে সঙ্গে থাকতে। এতে শ্রীঠাকুর আমার উপর খুশী হয়েছিলেন। মণিমন্দির প্রতিষ্ঠার পর মন্দির ঠাণ্ডা করার জন্য ঠাকুরের ছিল ভীষণ উদ্বেগ। অর্চনা দি ঠাকুরের উৎকণ্ঠা দেখে ব্যস্ত হয়ে ভার নিলেন মন্দির ঠাণ্ডা করার। চারিদিকে খসের পর্দা দেওয়া হল, রোজ সেটাকে

দিদি (অর্চনাদি) পিচ্‌কারী করে জল দিতেন নিজহাতে, আমি তঁাকে সাহায্য করতাম। প্রায় একটা পর্যন্ত গোপালের পূজো সেরে অর্চনাদি মণিমন্দিরে আসতেন, সেখানে প্রায় আড়াইটা বাজত, পর্দা খাটানো জল দেওয়া ইত্যাদি সারতে। আমি দিদিকে সাহায্য করতাম, পরে একাও করেছি ঐসব কাজ, দিদি আমায় দোখয়ে দিয়েছিলেন কেমন করে করতে হয়। এখন বুলদা (ব্রহ্মচারী অজিত চৈতন্য মণিমন্দিরের সেবার ভার নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন। একসময় পশ্চিমের বারান্দা পরিষ্কার করার ভার ঠাকুর দিয়েছিলেন আমাকে। ঐ বারান্দায় স্বয়ং ভগবান বসতেন ভগবত ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে, ঐ বারান্দা ছিল যেন ভগবানের বৈঠকখানা, আমি ভার পেয়েছিলাম সেটি পরিষ্কার রাখার। কাজেই সে কাজে নিষ্ঠা তো থাকবেই কিন্তু একদিন ভুল হয়ে গেছে আমার। সময়মত মনে পড়েনি পরিষ্কার করার কথা। ঠাকুর বেরিয়ে এসে দেখেন বারান্দা তখনও পরিষ্কার হয় নাই। ডাকলেন আমাকে, হ্যাঁরে বারান্দা মুছিসনি, ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ি! বলি এই যা ঠাকুর আজ ভুলে গেছি একদম। ঠাকুর বলে ওঠেন খেতে তো ভুল হোল না, যা হোর জমিদারপো যেমন ভুল করেছ গঙ্গার ধারে কান ধরে দাঁড়িয়ে জপ কর গিয়ে। পরে ডেকে হাত ভরে প্রসাদ দিয়ে মিষ্ট করে বুঝিয়ে বললেন "দেখ, এখানে আমি এসে বসি, ধ্যান করি পাঠ করি, অপরিষ্কার জায়গায় কি করে বসি বল তো। ভগবানের নাম যেখানে হয় সেখানে ঠাকুরের আবির্ভাব হয়। স্মৃতিতে ভেসে ওঠে আর একদিনের কথা। ঐ বারান্দাতেই একদিন কোন নির্জন প্রহরে দিদি (অর্চনাদি) বসে আছেন শাস্ত্র অধ্যয়নে নিবিষ্ট চিত্তে, কিন্তু পায়ে ব্যথায় খুব কষ্ট হচ্ছে দিদির। বিঘ্ন হচ্ছে অধ্যয়নে। বুঝতে পেরে কাছে এসে বসে দিদির পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। আমাকে সেবা করতে দেখে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ঠাকুরের শ্রীমুখ। বললেন বারংবার, এই তো চাই, মন দিয়ে সেবা কর তাতেই তোর হবে। পরে অরুণদাকে একদিন বলেছিলেন ঠাকুর আমার সেবা করার কথা। বললেন "গদাই এর জপধ্যান বিশেষ কিছু নেই তাই সবার সেবা করতে বলি ওকে। সেবা করলেই সব হবে ওর আর কিছু দরকার নেই, তস্মিন তুষ্টে।" কাজেই শ্রীঠাকুর যে কাজে তুষ্ট হয়েছেন সেটা আমার শ্রেষ্ঠ তপস্যা। ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন আমাকে সব সময় অর্চনা মার কাছে কাছে থাকেতে। তাঁর সুবিধা অসুবিধা লক্ষ্য রাখতে। অর্চনাদিকে কখনও একা ছাড়তেন না ঠাকুর। কিছুক্ষণ একলা থাকলেই ঠাকুরের উদ্বেগ হোত, উৎকণ্ঠিত চিত্তে খোঁজ নিতেন 'অর্চনা কোথায়।' দিদি যখন একটু পায়চারি করতেন আমি থাকতাম সঙ্গে, ফাঁকা আশ্রম, ঠাকুর রয়েছেন নিজের ঘরে। মায়েরা সেসময় কাজে ব্যস্ত। তাই ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন সেসময় লক্ষ্য রাখতে। সেবারূপি তপস্যা যে ঠাকুরের কত প্রিয় ছিল তার বহু উদাহরণ আমরা অনেকেই দেখেছি। মনে পড়ে আর একদিনের কথা সেদিন ঠাকুরের বিশেষ কৃপা পেয়েছিলাম ঐ সেবা করার জন্যই।

মাণিক জ্যাঠাকে (সংঘের প্রেসিডেন্ট স্বামী নির্ব্বেদানন্দজীকে) বহুবার ঠাকুর রক্ষা করেছেন কঠিনতম অসুখের হাত থেকে। পেপ্টিক আলসার হয়ে গেছে বার তিনেক। হার্ট অ্যাটাকও হয়ে গেছে বার ছয়েক। সেবার প্রিয়তম সন্তান মাণিক জ্যাঠার ম্যালিনা হয়েছে সিরিয়াস ধরনের।' ঠাকুর কৃপা করে তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন। মাণিকের জন্য ঠাকুরের চিন্তার শেষ ছিল না, বলতেন "মাণিক আমার বুকের পাঁজর ও চলে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব।" অসুস্থতার সংকটময় মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টিরাখা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মাণিক জ্যাঠার অসুস্থতার সময় প্রায় রাত্রি বারোটা পর্যন্ত সারাদিন অফিস করে পশুপতি সেন এবং (বর্তমানে ব্রঃ পশুপতি চৈতন্য) হীরেনদা অমলদা শঙ্করদা এঁরা পালা করে সেবা করেছিলেন। খোকনদা সুরেশদাও করত। কিন্তু সেদিনকে আর কেউ আসে নাই। আমি প্রায় রাত্রি দুটো পর্যন্ত একা বসেছিলাম মাণিক জ্যাঠার কাছে। শ্রীঠাকুর মন্দির থেকে মায়েদের কাউকে দেখতে পাঠালেন যে মাণিকের কাছে কে বসে আছে দেখে আয়, মায়েরা ঠাকুরকে গিয়ে বলল "গদাই বসে আছে আর কেউ নাই"। শুনে তারপর দিন ঠাকুর সাধু ব্রহ্মচারীদের বললেন যে, আজ থেকে তোমরা সবাই পালা করে মাণিকের

সেবা করবে। একা গদাই-এর উপর ছেড়ে দিওনা। অবশ্য ওষুধপত্র দেওয়া ইত্যাদি আমি সব করতাম। আমার সেবার মনোভাবে ঠাকুর হয়েছিলেন খুশী। শ্রীঠাকুর কিছুদিন বাজারের মিক্সচারে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাই শ্রীঠাকুর আমাকে লাগালেন কম্পাউণ্ডিং এবং ডিসপেন্সিং-এর কাজে। আমি রবি ডাক্তারবাবুর কাছে মিক্সচারের ফর্মুলা শিখে নিলাম। শ্রীঠাকুর ফটিকদা ও অরুণদাকে মিক্সচারের ওষুধ ও অন্যান্য জিনিষপত্র আনিয়ে দিতে বললেন। আমি সেই থেকে ওষুধ তৈরি করতাম মিক্সচার তৈরি করতাম প্রেস্‌ক্রিপসান দেখে। অবশ্য এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয়া সুমনাদি আমায় সাহায্য করতেন। ডিসপেন্সারির নাম দিয়েছিলাম ব্রতক্লিনিক। আর একদিনের কথা। শ্রীঠাকুর আমাকে রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় ডেকে পাঠালেন, আমি বুঝতে পারলাম না কেন ঠাকুর ডেকে পাঠালেন আমাকে এইসময়ে। বুঝতে পারছিনা কেন ডেকে পাঠালেন, সারাদিন তো কোন দোষ করি নাই। যাইহোক ঠাকুরের কাছে গেলাম। ঠাকুর তখন ভোগ নিতে বসেছেন। আমাকে বললেন তোকে যে গীতার ওষুধ আনতে বলেছিলাম আনিস নি কেন? এখন পর্যন্ত একটা ওষুধও পড়ল না। আমি ওষুধ নিয়ে এসছি অনেকক্ষণ কিন্তু গীতাদিকে না দিয়ে অন্য কাকে দিয়েছে। তারপর শ্রীঠাকুর বললেন ও যখন এতক্ষণ ওষুধ পায় নাই তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যাও গঙ্গার ধারে এক পায়ে কান ধরে দাঁড়িয়ে জপ কর। আমিও শ্রীঠাকুরের আদেশে জপ করতে গেলাম গঙ্গার ধারে। কুড়ি মিনিট পর শ্রীঠাকুর ডেকে পাঠালেন, বললেন, আর কোনদিন এমনি করবিনা, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন এবং হাত ভর্তি প্রসাদ দিলেন। আমি বললাম, আর কোনদিন এমনি কাজ করব না। রাত জাগার এমনি অভ্যাসের ফলে ঘুম গিয়েছিল কমে। পাতলা ঘুম তাই সামান্য একটু ডাকেই ভেঙ্গে যেত। মাণিক জ্যাঠার কাছে তাই অনেকবার শুয়েছি রাত্রে উঠবার প্রয়োজনে। শ্রীঠাকুর বছরে একবার জুবরাজপুর যেতেন গোপালজীকে নিয়ে এবং সেখানে একমাস থাকতেন। তাই অরুণদা রাত্রি প্রায় দুটো পর্যন্ত পাহারা দিতেন যেখানে শ্রীঠাকুর ও মায়েরা থাকতেন। অরুণদার হাঁপানির জন্যে রাত্রি দুটো পর্যন্ত ঘুমোতেন না। শ্রীঠাকুর আমাকে বলেছিলেন অরুণ রাত্রিতে একা ঘোরে তুই ওর সঙ্গে থাকবি।" আমিও শ্রীঠাকুরের আদেশ পালন করেছিলাম। অরুণদার সঙ্গে থাকতাম। শ্রীঠাকুর প্রত্যেকদিন বাগানে পায়চারি করতেন তারপর মন্দিরে যেতেন। রোজ ভোরে শ্রীঠাকুর স্নানে যেতেন তখন আমি প্রণাম করতাম। ঠাকুর স্নেহভরা কণ্ঠে বলতেন, কুশল তো গোবর্ধন? আমি বলতাম হ্যাঁ। যেদিন না বলতেন, সেদিন মন খারাপ হয়ে যেত। প্রতিদিন ঐ নামেই সম্বোধন করতেন আমাকে। আমার চলার পথে পাথেয় ঐটুকু। অপার্থিব স্নেহকরুণা প্লাবনে ভেসে গিয়েছিলাম সেদিন। একটুখানি মিষ্টি সম্বোধনের আশায় আকুল হত প্রাণ। আজও জানি তাঁরই কৃপায় চলে যাচ্ছে কুশলে। সবই ভরিয়ে দিয়ে গেছেন তিনি। বিরামহীন পদক্ষেপে চলেছে জীবনযাত্রা। কিন্তু তবু বড় ফাঁকা লাগে এক এক সময়। কেন লাগে? জানি না। হয়তো একটুখানি মিষ্টি সম্বোধনের আশায় আকুল হয়ে থাকে প্রাণ, 'কুশল তো গোবর্ধন'?

...এই সব ভক্তদের সেবা সাধনায় শ্রীঠাকুর বলেছিলেন কাশীপুরের উদ্যানে, তোরা সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস্‌।

শ্রীসত্যানন্দ দেব (যুগে যুগে যার আসা)

সত্যানন্দ বাণী

গাণিতিক জপ

বিক্ষিপ্ত মনে গাণিতিক জপের প্রয়োজন……
এই জপের বিলাস ইষ্ট কেন্দ্রিক।
মনের অভ্যস্ততায় এই জপ প্রকারান্তরিত করা উচিত।

মন কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র এক বিষয়ে থাকতে পারে। কাজেই কিছুক্ষণ ধরে ইষ্টে সংযুক্ত রাখতে গিয়ে বিক্ষেপ আসে ও এই বিক্ষেপ কোন্ মুহূর্ত্তে এসে পড়ে তার ঠিকানা পাওয়া যায় গাণিতিক জপে। মানস সংখ্যা রেখে এই জপ করা উচিত ইষ্টকে কেন্দ্র করে।

—বেদছন্দা (৫ম্ পর্ব)

আলোচনা : স্বামী নির্বেদানন্দজী

ঈশ্বর লাভ করতে হ'লে সাধনা চাই। ধ্যান জপ সেই সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু ধ্যান জপের মধ্যে ধ্যান সকলের হয় না, সবাই পারে না। ধ্যানের পথ সকলের পথ নয়, সব আধারই ধ্যানের আধার নয়। কিন্তু সাধন মার্গে গুরু দত্ত ইষ্টনামের জপ সব সাধককেই করতে হয়। আর নাম জপ কমবেশী সকলেই করতে পারে। তাই সর্ব-সাধারণের ক্ষেত্রে মনকে ইষ্টমুখী বা ভগবৎমুখী করার পক্ষে নাম জপই একমাত্র সহজ সাধন, সহজ পথ। আর ঠাকুরেরও বলা আছে, কলিতে অন্নগত প্রাণ—এ যুগে নাম সার। কিন্তু এই সহজ নামজপটাও বহু আধারের ক্ষেত্রে দেখা যায় ধীর চিত্তে একাগ্র মনে করা সম্ভব হচ্ছে না। চঞ্চল মন সেখানেও প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি ক'রে মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলছে। পাশ্চাত্য মনোবিদরা বলছেন, সাধারণতঃ মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের বেশী একটা বিষয়ে মন স্থির থাকে না। মনের এই চঞ্চল প্রকৃতিকে বশে আনা যে কী দুঃসাধ্য ব্যাপার গীতায় মহাবীর অর্জ্জুনের উক্তিই তার স্পষ্ট প্রমাণ। মহাবাহো বলছেন কৃষ্ণকে—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥" ৬।৩৪

হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গুলির বিক্ষেপজনক মহাশক্তিধর ও দৃঢ়, সেজন্য মনে হয় বাতাসকে রুদ্ধ রাখা যেমন দুঃসাধ্য মনকে নিরোধ করাও তেমনি সুদুষ্কর।

মন সম্বন্ধে বেদান্তসারে বলা আছে—"মনো নাম সংকল্পবিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়াত্মিকান্তঃ-করণ বৃত্তিঃ।"—

অর্থাৎ মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা বৃত্তি, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। মন নানা রকম সঙ্কল্প বিকল্প করে, বুদ্ধি একটা নিশ্চয় করে দেয়। বুদ্ধিকে তাই দার্শনিক পরিভাষায় নিশ্চয়াত্মিকা বা ব্যবসায়াত্মিকা মনোবৃত্তি বা অন্তরিন্দ্রিয় বলে। মনের দুটী বিভাব, একটা সঙ্কল্প অপরটা বিকল্প। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংস্পর্শে মনে নানান জ্ঞান ও সংস্কার জন্মায়। এর থেকেই মনে এক মুহূর্তে উঠছে এটা করি আবার পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে না এটা না, অন্য আর একটীতে মন ধাবিত হতে চাইছে। এটাই হল মনের সঙ্কল্প বিকল্প ভাব। মনের সঙ্কল্প. বিভাব থেকেই যত কামনার উদ্ভব। আর তারই ফলে

মনের চাঞ্চল্য ও বিক্ষিপ্ততা—অর্জুনের ভাষায় যা চঞ্চল, প্রমাথি, বলবদ্দৃঢ়ম্—প্রমাথি—ভূতের মতন সব মথন করে দেয়, সব জিনিষ ওলোট পালট করে দেয়। বলবৎ দৃঢ়—মহাশক্তিশালী, লোহার মত কঠিন, অনমনীয়—এ হেন মনকে বশে আনা সুকঠিন, বায়ুকে যেমন বশে আনা সুদুষ্কর তেমনি মনকে বশে আনা দুঃসাধ্য। শঙ্করাচার্য মনের এই প্রকৃতি বোঝাতে একটি বেশ মজার উপমা দিয়েছেন। বলছেন, ক্ষ্যাপা বাঁদরকে শত বোলতা দংশন করলে তার যে অবস্থা হয় আমাদের মনের চাঞ্চল্য বা বিক্ষিপ্ত ভাবটিও ঠিক সেই ধরণের। বাঁদর স্বভাবতঃ চঞ্চলমনা—তায় ক্ষিপ্ত, তার ওপর তাকে শত বোলতা দংশন করেছে। এ অবস্থায় স্বভাব চঞ্চল বাঁদরের মনের চাঞ্চল্য বা বিক্ষিপ্তভাব যে কী ভীষণ তা কল্পনা করা যায় না। মানুষের মনের গতি প্রকৃতিটিও ঠিক এই রকম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও, দেখ, মেনে নিয়েছেন অর্জুনের সে কথা—বললেন, "অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।"—হে মহাবাহো, তুমি ঠিকই বলেছ, সত্যিই মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। তাকে নিরোধ করা যে দুষ্কর তাতে কোন সংশয় নেই। কিন্তু ভগবানই তো আবার ভবরোগের বদ্যি। কাজেই তাঁকে রোগের prescription—ব্যবস্থা পত্র একটা তো দিতে হবে। prescribe করলেন, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাকে বশীভূত করা যায়। গীতামুখে শ্রীভগবান অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে মন স্থির করার উপায় বলে বর্ণিত করলেন।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মন কি করে স্থির করা যায় এবার আমরা সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নেব। অভ্যাসটা কি? কোন একটি বিষয়ে বারবার চেষ্টা বা অনুশীলন করার নামই অভ্যাস। আমাদের ঠাকুর বলেছেন, অভ্যাস হচ্ছে এমন একটি জিনিষ যার ফলে মনে সংযম আসে। নিরন্তর লেগে থাকতে থাকতে স্বভাব গড়ে ওঠে। Habit is the second nature. অনবরত কোন কিছু অভ্যাস করতে করতে মানুষ অন্য স্বভাবের হয়ে যেতে পারে। সেজন্য এ্যারিষ্টটল্ অভ্যাসের ওপর খুব জোর দিয়েছেন। আর বৈরাগ্য কি? বৈরাগ্য সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন "ঈশ্বরে অনুরাগ ও বিষয়ে বিরাগ"। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে—শুধু বিষয়ে বিরাগ হলেই যথার্থ বৈরাগ্য হবে না, সে তো রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও দেখা যায়, কিন্তু ভগবানে অনুরাগ তাদের নেই। লোকমান্য, যশ, অর্থ ইত্যাদির জন্য বৈরাগ্য হলে হবে না, সে বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না। এর সঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ চাই।

আমাদের ঠাকুর অভ্যাস ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে আরও বলেছেন—অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে অভ্যাস হচ্ছে সাধনার positive দিক। ধর্মীয় চিন্তা, ভগবৎ চিন্তা, জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায়ের চেষ্টা এগুলি নিয়ে positive ভাবে চলার দিক, আর বৈরাগ্য হচ্ছে negative দিক। কারণ বৈরাগ্য সাধনে জাগতিক সমস্ত সুখ সমস্ত প্রলোভন থেকে 'নেতি নেতি' বিচার ক'রে মনকে জয় করার চেষ্টা রেখে যেতে হয়। নিত্য জপ, ধ্যান, তপস্যা অভ্যাসের ফলে brain-এর মধ্যে নতুন channel সৃষ্টি হয়। মনটা তখন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের জগতে সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে থাকে।

তাহলে দেখছো, ভগবৎ লাভ করতে হলে প্রথম কথা হচ্ছে মনকে ভগবৎ মুখী করতে হবে, ভগবানে যুক্ত করতে হবে। সেজন্যে জপ ধ্যানের বারবার শুকনো অভ্যাস করে গেলেই হবে না, তার জন্য বৈরাগ্য অর্থাৎ ভগবানে অনুরাগ প্রীতি ও অন্য জাগতিক বস্তুতে বিরাগ আসা চাই। যোগ মানেই তো কোন একটি বিষয়ে মনের ধৃতি বা নিবিষ্টতা, একটি বিষয়ে মনকে নিশ্চলভাবে ধরে রাখা। কিন্তু মন এতই চঞ্চল যে কোন বিষয়েই বেশীক্ষণ স্থির হ'তে পারে না, ভগবৎ বিষয়ে স্থির হওয়া তো দূরের কথা। তাই মনের দিকে চাই বৈরাগ্য কিন্তু বৈরাগ্যের স্থিতির জন্য চাই অভ্যাস, নইলে সাময়িক বৈরাগ্য এলেও আবার চলে যেতে পারে। তাই গীতায় ভগবান মনকে স্থির করার উপায় দিলেন অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

এখন কথা হচ্ছে, ভগবৎ প্রীতি, অনুরাগ বা ব্যাকুলতা না থাকলে শুধু সাধনার positive দিক অর্থাৎ শুকনো জপ ধ্যান নিয়ে পড়ে থাকলে কিছু হবে না ঠিক কথা, কিন্তু ভগবৎ প্রীতি, ব্যাকুলতা এসব তো চারটিখানি কথা নয়,

চট্ করে হয় না, সকলের যে গোড়া থেকেই থাকবে এমন কোন কথা নয়—কাজেই সেই ঈশ্বর প্রীতি, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা আনার জন্যই আবার জপ ধ্যান ইত্যাদির নিয়মিত অভ্যাস দরকার। এগুলো নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে নিরন্তর পড়ে থাকলে লেগে থাকলে এর থেকেই ক্রমে ঈশ্বরে অনুরাগ আসবে, মন ঈশ্বরমুখী হবে। সেজন্যই তো শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখনা কথামৃত মুখে অভ্যাস সম্বন্ধে কত জোরের সঙ্গে বলেছেন—"সে কি! অভ্যাস যোগ! অভ্যাস কর দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে সেই দিকেই যাবে।" "অনেক অভ্যাস করতে হয়, পূজা, জপ, ধ্যান এসব নিয়মিত অভ্যাস করতে হয়। "রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। একদিনে হয় না, রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।"

কাজেই জপ ধ্যান প্রথম অবস্থায় ভাল লাগুক বা না লাগুক ওষুধ খাওয়ার মত নিয়মিত অভ্যাস করে যেতে হবে। আমরা অভ্যাস ও বৈরাগ্যের আলোচনায় বুঝলাম এ দুটোর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে—জপ ধ্যানের অভ্যাসে বৈরাগ্য বাড়তে থাকবে আবার বৈরাগ্য যত বাড়বে মন তত স্থির হবে। কিন্তু মনের চঞ্চল গতি বা বিক্ষিপ্ত ভাবের যে পরিচয় পাওয়া গেল তাতে দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে বা আধারের পক্ষে নিয়মিত জপের অভ্যাস রেখেও মনকে সুস্থির করা সম্ভব হচ্ছে না, জপে তাদের মনের একাগ্রতা ঠিক আসছে না। বরং একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাচ্ছে যে, যখনই জপ বা ধ্যানে মনকে নিবিষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে তখনই রাজ্যের আজে বাজে চিন্তা ভাবনা মনে উঠে আসছে আর কখন যে তাতে মন তলিয়ে যাচ্ছে তা টেরই পাওয়া যাচ্ছে না। হাতের মালা ঘুরে যাচ্ছে কিন্তু মালায় মন নেই শেষে তমোগুণে মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, ঢুল এসে যাচ্ছে। মনকে concentrate করার এবং তমোগুণ কাটাবার কত উপায় ঠাকুর আমাদের বলেছেন, যেমন, কখন বলেছেন, যখনই দেখবে এক জায়গায় একভাবে বসে জপ করতে করতে ঘুম আসছে বা আজে বাজে চিন্তা আসছে, মন বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তখন আসন থেকে উঠে পড়বে, পায়চারি করে জপ করবে কখনও বলেছেন, স্থান পরিবর্তন করবে, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে গিয়ে জপ করবে। কখনও বলেছেন, নিজের অঙ্গে আঘাত দেবে, পিঠে এক ঘা দাও, ঘুম ছেড়ে যাবে অন্য সব চিন্তা সরে যাবে। নয়তো বলেছেন টুলে বসে জপ করবে তাহলে ঢুল এলে পড়ে যাবার ভয়ে ঘুম আর আসবে না। বলেছেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে জপ করবে। এরকম বহু উপায় ঠাকুর দিয়েছেন যার বলে তমোগুণ কাটিয়ে ওঠা যায়, জপে মনকে নিবিষ্ট করা যায়। এতে দুটো জিনিষ এক সঙ্গে হয়—তপস্যাও হয় আবার মনের একাগ্রতাও আসে।

মন যখন কিছুতেই স্থির হয় না তখন শরীরে কোথাও একটা আঘাত সৃষ্টি ক'রে সেখানেই জপে মনকে স্থির করার চেষ্টা করলে মন সহজে জপমগ্ন হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সাধন অবস্থার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে—ঠাকুরের সবই তো আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। ঘটনাটা হচ্ছে, অদ্বৈত বেদান্তী তোতাপুরীজীর কাছে ঠাকুর সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়ে তাঁর নির্দেশ মত অরূপের ধ্যানে মগ্ন হবার চেষ্টা করছেন কিন্তু কিছুতেই পারছেন না। যত অরূপের চিন্তা করার চেষ্টা করেন ততই তাঁর অপরূপ রূপময়ী মা ভবতারিণী দিক আলো করে এসে দাঁড়াচ্ছেন মনের সামনে। পুরীজীকে ঠাকুর জানালেন সে কথা। পুরীজী তখন ভাঙা একটুকরো কাঁচ কুড়িয়ে এনে সেটা তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্য বিন্দুতে খুব জোরে চেপে ধরে রইলেন আর ঠাকুরকে সেই আঘাতের স্থানে ধ্যান করতে বললেন। তখন ঠাকুর সেই আঘাতের বিন্দুতে মনকে নিবদ্ধ করে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে গেলেন। এ অবশ্য আদর্শ দৃষ্টান্ত, ঠাকুরের পক্ষেই সম্ভব। যাই হক, আমাদের ঠাকুর তমোগুণ কাটাবার এবং জপে মন বসাবার যে সব উপায় বললেন, সেই ভাবে জপের অভ্যাস করলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে এ সবই মন যাদের অপেক্ষাকৃত স্থির তাদের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশী উপযোগী। তারা এসব উপায় অবলম্বন করে জপের অভ্যাস করলে ক্রমে জপতন্ময়তা লাভ করে ইষ্টমুখী হয়ে পড়বে।

কিন্তু এমন অনেক চঞ্চল মন আছে যারা এসব উপায় অবলম্বন করেও জপে মন বসাতে পারে না—ঐ তমো-

গুণটাকে এই ভাবে কষ্ট করে হয়ত সরিয়ে রাখলো কিন্তু চঞ্চল মনের সঙ্কল্প বিকল্প ভাব অনবরত মনকে চঞ্চল করেই রেখেছে—পায়চারি করে বা এক পায়ে দাঁড়িয়ে জপ করছে বটে কিন্তু জপে বা ইষ্টে মন নেই। এরকম ক্ষেত্রে অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য বা বিক্ষিপ্ততা যেখানে বেশী সেই মনকে বশে আনতে হলে সাধারণ ভাবে জপ করতে গেলে তার বিক্ষিপ্ততা যাবে না। এ ক্ষেত্রে জপের সঙ্গে এমন একটি জিনিষের প্রয়োজন যার দ্বারা মন জপে সুস্থির হবে, জপে concentration আসবে। তাই জপের সঙ্গে ঠাকুর যোগ করে দিলেন গণিতকে। এ ধরণের চঞ্চল মনের জন্য ঠাকুর উপায় বললেন, গাণিতিক জপ! গাণিতিক জপের সাহায্যে এই বিক্ষিপ্ত মনকে সুস্থির করতে হবে। 'গাণিতিক জপ' সূত্রে তাই বললেন, "বিক্ষিপ্ত মনে গাণিতিক জপের প্রয়োজন···"। গণিতের অর্থাৎ অঙ্কের সাহায্য নিয়ে জপ চালাতে হবে।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে—গণিতের সাহায্য নিয়ে জপটা হবে বটে কিন্তু সেটা হবে ইষ্টকে কেন্দ্র করে, গণিতকে কেন্দ্র করে নয়। জপ মানেই ইষ্ট নামের জপ। সেটা স্বভাবতই ইষ্টকে কেন্দ্র করে হয়। কিন্তু মনের চাঞ্চল্য দূর করার জন্য গণিতের সাহায্য নেওয়া মানে এই নয় যে জপটি গণিতকে কেন্দ্র করে চলবে। সে ভুল যেন না হয়! আমার উদ্দেশ্যটা মনে থাকে যেন। আমার উদ্দেশ্য হ'ল ইষ্টনাম জপের সাহায্যে চঞ্চল মনকে ইষ্টমুখী করা। শুধু ইষ্টনাম জপে মন স্থির হচ্ছে না বলে একটি অতিরিক্ত সাহায্য, গণিতের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে মাত্র। সুতরাং গণিত লক্ষ্য নয়, কেন্দ্র নয়। জপের কেন্দ্র বা লক্ষ্য সব সময়ই থাকবে ইষ্ট। এই কারণেই বিক্ষিপ্ত মনকে স্থির করার জন্য গাণিতিক জপের উপায় দিয়েই ঠাকুর সূত্রটার পরের লাইনেই সাবধান করে দিচ্ছেন—"এই জপের বিলাস ইষ্ট কেন্দ্রিক" হবে ব'লে।

এখন, গাণিতিক জপটি কি ভাবে করতে হবে সেটা বোঝাবার জন্য এবার আমরা কয়েকটা উদাহরণের সাহায্য নেবো—বোঝবার সুবিধার জন্য প্রথমে স্থূল পূজা থেকেই সুরু করা যাক—ইষ্টমূর্তি সামনে রয়েছে। নানারকম পূজার ফুলও আছে। ঠিক করলাম প্রথমে ইষ্টের দক্ষিণ চরণে ১০টা সাদা ফুল জপ করে দেব তারপর বাম চরণে দেব দশটা লাল ফুল। প্রত্যেকটা ফুলই জপ করে করে দেব। এইভাবে যতগুলি ফুল দেওয়া হবে তত সংখ্যক জপ হয়ে যাবে। এইটিই গাণিতিক জপের ক্ষেত্রে করতে হবে মানসে। তখন ইষ্টকে চিন্তা করতে হবে মনে মনে, মনে মনেই তাঁর চরণ চিন্তা করতে হবে, মানসেই ফুলটি জপ করে ইষ্টের চরণে নিবেদন করতে হবে। কোন্ চরণে কত ফুল জপ করে নিবেদন করলাম তার হিসেবটিও মনে মনে রাখতে হবে। সব কিছুই তখন মানসে, সূক্ষ্মে হবে। তবেই জপে ও ইষ্টে ধীরে ধীরে মন বসবে, আর গণিত অর্থাৎ মানসে সংখ্যা রাখার কাজটি মনের সেই একাগ্রতা আনতে সাহায্য করবে মাত্র। মনে মনেই ইষ্টের চরণে ফুল দেবার পদ্ধতিটাকেও উল্টে নেবো, যেমন, এবার দক্ষিণ চরণে জপ করে গুণে গুণে ১০টা লাল ফুল দিলাম আর বাম চরণেও ঠিক ঐ ভাবে জপ করে সাদা ফুল দিলাম ১০টি। আবার অন্য রকম ভাবেও গণনা করে জপ করা যেতে পারে। যেমন, এবার ধর, দক্ষিণ চরণে প্রথমে ১০টি তারপর ৯টি, পরে ৮টি তারপর ৬টি তারপর ৫টি এইভাবে সব শেষে ১টি ফুল জপ করে দিলে, তেমনি বাম চরণে সুরু করলে প্রথমে ১টি, পরে ২টি তারপর ৩টি, তারপর ৪টি, তারপর ৫টি এইভাবে সব শেষে ১০টি ফুল জপ করে নিবেদন করলে।

তাহলে এইভাবে একবার জপে তোমার মোট জপ হল—

দক্ষিণ চরণে=১০+৯+৮+৭+৬+৫+৪+৩+২+১=৫৫
বাম চরণে= ১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০=৫৫　অর্থাৎ ৫৫+৫৫=১১০ বার

সুতারাং দুই চরণ চিন্তা করে এইভাবে ১০ বার জপ করলে তোমার মোট ১১০×১০=১১০০ শ জপ হয়ে যাবে।

এইভাবে যতক্ষণ জপ করবে সব সময় ইষ্টচিন্তাটি রেখে, ইষ্টকে কেন্দ্র করে মানসে যতরকম সম্ভব গণনার সাহায্যে জপটি করে যেতে হবে। প্রথম প্রথম দেখবে খুব গুলিয়ে যাচ্ছে, সংখ্যা রাখতে ভুল হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যে

মনে মনে একটা শর্ত রাখবে যে, ভুল হলেই, সংখ্যা রাখায় গোলমাল হলেই আবার প্রথম থেকে, গোড়া থেকে করতে হবে। এই শর্ত মনকে গাণিতিক জপে একাগ্র হতে সাহায্য করবে। চঞ্চল মন—অনবরত সঙ্কল্প বিকল্প উঠছে—কয়েক মুহূর্তের বেশী এক বিষয়ে স্থির থাকতে পারে না—সেই মনকে জপে বসাবার জন্য গণিতের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, কিন্তু মনের চঞ্চলতা তো সঙ্গে সঙ্গে দূর হবে না, তাই যখনই চঞ্চল হয়ে উঠবে, সঙ্কল্প বিকল্প ভাব উঠে অন্য চিন্তা উঠবে তখনই মন অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে, একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে, ফলে সংখ্যা রাখায় ভুল হবে, গোলমাল হবে। কাজেই এই শর্তটি থাকলে মনে একটা ভয় থাকবে যে, না, ভুল হলেই জপটি খণ্ডিত হয়ে যাবে, আবার করতে হবে। মনের এই সচেতন ভাবটি সঙ্কল্প বিকল্প ভাবগুলি ওঠার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করবে এবং নির্ভুল সংখ্যা রাখার একটা নিষ্ঠা চেষ্টাও জাগিয়ে রাখবে। ফলে গাণিতিক জপ বিষয়ে মন ক্রমে একাগ্রতা লাভ করবে। তখন আর ভুল হবে না। মন কিছুটা গণনায় যাবে বটে কিন্তু মনের চাঞ্চল্য এতে দমন হবে, মনের বিক্ষিপ্ততা নষ্ট হবে। এইভাবে শর্ত রেখে গণিতের সাহায্যে নির্ভুল সংখ্যা রেখে জপ করার চেষ্টা করলে দেখবে, একমনা না হলে মানসে অর্থাৎ মনে মনে নির্ভুল সংখ্যা রেখে জপ করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। এই শর্তটি মনকে ক্রমে দৃঢ় ও একাগ্র করে তুলতে সাহায্য করবে, মন ক্রমেই নির্ভুল সংখ্যা রেখে জপ করতে একমনা হয়ে উঠবে।

গাণিতিক জপে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে গণিতের একটি পদ্ধতি নিয়ে অর্থাৎ সংখ্যা রাখার একই ধরণের ক্রম অনুসরণ করে জপটি কিছুক্ষণ অভ্যাস করার পর দেখা যাবে ঐ পদ্ধতিটি বারবার অনুশীলনের ফলে বেশ সড়গড় হয়ে গেছে। তখন নির্ভুল সংখ্যা রাখার দিকে তত মন দিতে হচ্ছে না, সেটা তখন mechanical হয়ে পড়ে, আপনি হয়ে যাচ্ছে। এই যে মানসে সংখ্যার ক্রমটি নির্ভুল রাখার বিষয়ে সড়গড় হয়ে যাওয়ার ফলে মনকে আর সচেতন থাকতে হচ্ছে না এটাই বিপদের কারণ হয়ে উঠবে। কারণ মনের এই অলস অসতর্ক মুহূর্তে সঙ্কল্প বিকল্প ভাব বা আজেবাজে চিন্তা আবার উঠতে সুরু করবে, অন্যমনস্কভাব এসে পড়বে—জপ থেকে মন খসে যাবে। মন অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়ে আবার চঞ্চল বা বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। সেজন্য যেই একটি গাণিতিক পদ্ধতি খুব সড়গড় হয়ে যাবে এবং তার ফলে সঙ্কল্প বিকল্প ভাব আবার এসে পড়লে অমনি সেই পদ্ধতিটি change করে আর এক ধরণের গাণিতিক ক্রম বা পদ্ধতি নিয়ে জপ সুরু করতে হবে। যেমন, আমরা সুরু করেছিলাম ১০+৯+৮+৭+৬+৫+৪+৩+২+১ এবং ১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০ মানসে এই ক্রমে সংখ্যা রেখে দুই চরণে জপ নিবেদন। এটা বারবার অনুশীলনের ফলে বেশ সহজ হয়ে গেল—এই ক্রম পদ্ধতিতে মনে মনে নির্ভুল সংখ্যা রাখতে আর অসুবিধা হচ্ছে না—ঐ বিষয়ে তত মন দিতে হচ্ছে না—mechanical হয়ে গেছে, আপনি হয়ে যাচ্ছে। ফলে জপে মন আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। মন অন্য দিকে ছুটতে সুরু করলো—চঞ্চল হয়ে উঠলো। সেজন্য এবার ঐ ক্রমটিকে পাল্টে নিতে হবে, গাণিতিক ক্রমটিকে প্রকারান্তরিত করে নিতে হবে। তাই এবার ধর ক্রমটি এইভাবে সুরু করা হ'ল—প্রথমে ডান চরণে ৯+৭+৫+৩+১ পরে বাম চরণে ১+৩+৫+৭+৯ এই ক্রমে জপ সুরু হল। এই নতুন পদ্ধতিতে নির্ভুল সংখ্যা রেখে জপ করার জন্য মন আবার সচেতন হয়ে উঠবে। আবার সংখ্যা রাখা, ইষ্ট চিন্তা, জপ সবই বেশ হতে থাকবে। কিন্তু এটাও অনবরত অনুশীলনের ফলে এক সময় বেশ অভ্যস্ত হয়ে যাবে, সোজা হয়ে যাবে। তখন দেখা যাবে আবার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। তখন এই পদ্ধতিটিও change করতে হবে, আরএক রকম ক্রম ঠিক করে নিতে হবে কিংবা আরও একটু জটিল গাণিতিক পদ্ধতি গ্রহণ করলে। যারা গণিতের ছাত্র তারা তো আরও কঠিন গাণিতিক পদ্ধতি নিয়ে জপ করতে পারবে। এইভাবে সংখ্যার permutation combination করে যত রকমে সম্ভব গণনার ক্রম বা পদ্ধতি change করে প্রকারান্তরিত করে জপ করে যেতে হবে। তাহলে একটি পদ্ধতি সড়গড় হওয়ার ফলে মনে আবার যে চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ঠাকুর সূত্রটির শেষ লাইনে বলেছেন, "মনের অভ্যস্ততায় এই ক্রম প্রকারান্তরিত করা উচিত।"

চঞ্চল মন এক মুহূর্ত কোন বিষয়ে স্থির থাকে না—কিছুক্ষণ ইষ্টে মনকে জপের মাধ্যমে স্থির করতে গিয়ে তাই বিক্ষেপ এসে পড়ে। আজকের আলোচনায় আমরা দেখলাম, মনের ওই বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য কোন মুহূর্তে এসে পড়ছে তার হদিশ গাণিতিক জপের সাহায্যে খুব সহজে পাওয়া যায়। নির্ভুল সংখ্যা রাখার চেষ্টা এবং একটি গাণিতিক পদ্ধতি অভ্যস্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে কখন মনটা জপ বা ইষ্ট হতে খসে গেল। তখনই গাণিতিক জপের সাহায্যেই মনকে আবার জপে ও ইষ্টে নিবিষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে। কাজেই যাদের খুব চঞ্চল মন, মনের বিক্ষিপ্তভাব যাদের সবচেয়ে বেশী তাদের পক্ষে মনকে ইষ্টে সংযুক্ত রাখার বিষয়ে শ্রীঠাকুরের এই "গাণিতিক জপ" সূত্রটী একটি অমোঘ অস্ত্র—most efficacious drug—সবচেয়ে ফলপ্রদ ওষুধ। এই গাণিতিক জপ অনুশীলন করতে করতে তাদের মন ক্রমে জপতন্ময়তা লাভ করে ইষ্টের প্রতি একাগ্র হয়ে উঠবে, তখন আর গণিতের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হবে না, তখন ইষ্টের সঙ্গে এমন ভাবে মনটা গাঁথা হয়ে যাবে বা ইষ্টে এমন নিবিড়ভাবে ন্যস্ত হয়ে যাবে যে ইষ্ট দর্শনে ইষ্ট প্রাপ্তিতে মনপ্রাণ পরম আনন্দ পরম শান্তিতে ভরে উঠবে—জীবন অমৃতায়িত হয়ে উঠবে।

[অনুলিখন : স্বামী হীরানন্দ]

পাথেয়

শান্তি দেবী

হে ঠাকুর—
যুক্তকরে মাগিতেছি জীবনের প্রদোষ প্রাঙ্গণে
সায়াহ্নের স্নিগ্ধ অবকাশ।
যাত্রার পাথেয় লব তোমার করুণারাশি,
উছলিবে গীত তরঙ্গিনী।
বীণাযন্ত্রে পূরবীর উদাস-রাগিণী
নিশান্তের তারাময় তিমির তোরণ পার হয়ে
অন্তহীন আলোর বাসরে।
তারারা রহিবে চেয়ে সে নিশি পোহালে,
সেই লগ্নে—
উষার কিরণ রেখাটুকু, ভাতিবে কি আর বার এ ললাটে
নিবারি দুরন্ত দাহ। ঝরিবে আশিস ধারা।
কালের তিমির গর্ভে পশিবে কি আলোর প্রপাত—
পরায়ে সুরের মালা, স্তব্ধ আঁখি উঠিবে কি জাগি ?
ভরা ছিল অসীমের অসীম যৌতুকে কার পাণি,
মুদিত মুকুল হতে মেলেছিল দল কার লাগি,
সে জানে—
কাহার লাগি, নীল আকাশে-ছানিয়াছে আলোর অমিয়।
ছড়ায়ে কুসুমকুল অজানার খোঁজে,
বেদনার অন্তরালে আশাপথ চেয়ে
নিশিথের কজ্জল নয়নে, অরুণের আলো রেণু ঝরে।
জ্যোতির কমল লাগি।
আরতির দীপাবলী সাজাইয়া দোঁহে, সোনার থালায়,
মধুময় প্রভাত প্রহরে।

★

গোপন লীলার ঠাকুর

শ্রীসোমেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সব মাটিতে সব ফসল সমান ফলে না। কোন জমিতে ভাল ধান হয়, কোথাও ফল, কোথাও পাট, আবার কোথাও বা আর কিছু। ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটে। ভারতের মাটিতে ধর্ম্মের যেমন বিকাশ হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তেমন হয়না। তাই তো স্বামীজী বলতেন—"এদেশের প্রাণ ধর্ম্ম, ভাষা ধর্ম্ম, ভাব ধর্ম্ম ; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষ গ্রস্তদের অন্নদান, এসব এদেশে চিরকাল যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে জয় তো হবে ; নইলে ঘোড়ার ডিম····।" কিংবদন্তীর যুগ হতে ধর্ম্মের অনুশীলন করে ভারত লাভ করেছে অপৌরুষেয় বেদ। রাজনৈতিক চাহিদার ফলে ইউরোপ যেখানে পেয়েছে হিটলার, মুসোলিনী, লেনিন প্রমুখ ধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়কদের, আধ্যাত্মিক চাহিদার ফলে আমরা তেমনি পেয়েছি স্বয়ং ঈশ্বরকে আর তাঁর অবতারদের। কখনো তিনি এসেছেন রামরূপে, কখনো কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। আবার এই সেদিন এক অতি গোপন লীলা হয়ে গেল সিউড়ী আর বরানগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে—লোকচক্ষুর অন্তরালে, একান্ত গোপনে ; কেউ জানতো না, কেউ বুঝলো না। এখনো সময় আসেনি বোধহয় জানবার। কালেনাত্মনি বিন্দ্যতি—সময়ে সে সকলও জানা যাবে।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন :

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ১০।৪১

—যে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয়, জানিও সেখানে আমি বর্ত্তমান, আমা হইতেই এই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং গীতার এই মন্ত্রের দ্বারা সকল অবতারকেই আরাধনা করার অধিক দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া শ্রীভগবান বলেছেন "সম্ভবা যুগে যুগে।" যদিও শঙ্করের মেধা, বুদ্ধের হৃদয়, শ্রীচৈতন্যে প্রেম এবং যীশুর করুণা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলে তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম প্রথম অনেকে অবতার ব মানতে চান নাই। দশজন অবতারের বেশী না কি অ অবতার হয় না। অথচ ভাগবতে আছে "অবতা হ্যসংখ্যেয়াঃ"—অসংখ্য অবতারের কথা। অবতার প্রস ঠাকুর মাষ্টার মশায়কে বলছেন—"তুমি অবতারের ক তাঁকে (ডাক্তারকে) বলবে। অবতার—যিনি তা করেন। তা দশ অবতার আছে, চব্বিশ অবতার আ আবার অসংখ্য অবতার আছে (কথামৃতে)।" অনাদি অ সৃষ্টিতে তাঁকে অনন্তবারই 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় দুষ্কৃতাম্' আসতেই হবে। কারণ দায় যে তাঁর। মা মশায় যখন বললেন 'যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আ এক ব্যক্তি"—তখন সহজ সরল ঠাকুর উত্তর দিলেন—"এ এক! এক বৈ কি! তিনি (ঈশ্বর) দেখছ না,—এ এর উপর এমন করে রয়েছে।" (কথামৃত)

দক্ষিণেশ্বরলীলায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলে "ছদ্মবেশে স্বয়ং রাজার রাজ্য পরিদর্শনে আসা"—কথ বলেছেন "কে জানে তোর গাঁই গুঁই, বীরভূমের বা মুঁই",—আবার বলেছেন—"বায়ুকোণে আর এক আসতে হবে"····ইত্যাদি। একবার কেন—তাঁর র পরিদর্শন করতে তাঁকে অসংখ্যবার আসতে হবে। মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণলীলার জের টানতে আর একটি আসার কথাই বললেন শ্রীঠাকুর। সেই জের টেনেই সত্যানন্দলীলা আরও রহস্যগহিন মধুরলীলা। শ্রী বলেছেন—"তিনি এবার বাউল বেশে আসবেন,

একটি ভাঙ্গা একতারা...”। দক্ষিণেশ্বরের বায়ুকোণে, বীরভূমের বামুন। বাউলের রাজা সত্যানন্দদেব ভাঙ্গা একতারা বাজিয়ে গান ধরলেন—“মা আমি তোর ক্ষ্যাপা বাউল গো”—আমরা সে গান শুনলাম মন্ত্র মুগ্ধের মতো, কিন্তু এর গূঢ় অর্থ অনুধাবন করতে পারলাম না! রামকে মাত্র দ্বাদশজন ঋষি ভগবান বলে জেনেছিলেন, বাকী সকলে জানতেন রাম দশরথের ব্যাটা। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ যথা—‘পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ’—অর্জ্জুনও জানতেন না যে ‘কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং’। জানবার পর তাই ভয় পেয়ে গিয়ে স্তব করতে লাগলেন। তাই তো ঠাকুর বলতেন—অচিনে গাছ শুনেছ? তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।” আরও বলতেন—

“ওরে কুশী লব কি করিস গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?”

সেই কাঁচা হলুদের মত রঙ, ননীর মতো নরম শরীর (যা দেখে কেশব সেন বলেছিলেন কাঁচের আলমারীতে অতি যত্নে রক্ষা করিতে হয়), সেই অদ্ভুত প্রেমময় হাসি আর বুকভরা করুণা নিয়ে এলেন সত্যানন্দদেব। তিনি বলতেন, “দেখ, যুগের ঠাকুর একজনই. তবে নিশ্চিত জেনো আমি আধিকারিক পুরুষ; ঈশ্বরের বিশেষ অধিকার নিয়ে এসেছি।” তাই তো দেখি সারাটা জীবন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও ভবতারিণীর আরাধনায় কাটিয়ে তাঁদের চরণে অসংখ্য সঙ্গীত অঞ্জলি দিয়ে লিখলেন—

“যত মোর গানের কথা
সে যে তোর মন্ত্র গাথা....”

আর ঈশ্বরের বিশেষ অধিকার নিয়েই তো জীবনব্যাপী ব্যাখ্যা করে নিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত বৈজ্ঞানিকের যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে। কোন কোন তথাকথিত শিক্ষিত বিজ্ঞজন বলেছিলেন ঠাকুরের কথামৃত সাধারণ চাষীদের জন্য গ্রাম্যভাষায় কথিত, ওতে শিক্ষিত মনের খোরাক বিশেষ কিছু নেই। অথচ স্বামীজী বলেছেন ঠাকুরের এক একটি বাণী নিয়ে ঝুরি ঝুরি গ্রন্থ লেখা যায়। নূতন ঠাকুর সত্যানন্দদেব কথামৃত ব্যাখ্যাকালে পাশ্চাত্য মহা মহাপণ্ডিত ও দার্শনিকদের উক্তির সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাবাণীর তুলনা করে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে ‘নিরক্ষর জ্ঞানসিন্ধু’ তাঁদের সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। গীতার পুরুষোত্তম যেমন ক্ষর এবং অক্ষরের উর্দ্ধে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত তেমনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব দর্শন বিজ্ঞানের উর্দ্ধে। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে আর একজন রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন, স্বামীজীকে ঠিক ঠিক বুঝতে প্রয়োজন আর একজন স্বামীজীর; তেমনি ঠাকুরকে বুঝতে ও বোঝাতে প্রয়োজন আর একজন ঠাকুরের। সেবারের প্রায় অক্ষর-জ্ঞানহীন ঠাকুর এবার এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ খেতাব নিয়ে, আর নিজেকে একান্ত গোপন রেখে প্রচার করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা ও বাণী। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ একবার তাঁর মন্ত্রশিষ্য ঠাকুর সত্যানন্দদেবকে বলেছিলেন—“ওরে সতু, তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) চিন্তা করে করে আমি যে তিনিই হয়ে গেলাম রে!” অর্থাৎ তিনি তখন কায়মনোবাক্যে রামকৃষ্ণময় হয়ে গেছেন। “তাঁরি সত্ত্বা, তাঁরি আকার। পাবে তুমি সকলি তাঁর। ডুব তাঁতে দাও উপরে না ভাসি।” (শ্রীরামকৃষ্ণগীতা—ব্রহ্মবাদিনী শ্রীঅর্চনাপুরী) স্বামী নির্ব্বেদানন্দ ‘সত্যানন্দাষ্টকমে’ লিখেছেন—“রামকৃষ্ণময়ং সারদা শরণং”—আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব সত্য সত্যই তাঁর পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সত্ত্বা ও আকার প্রাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণরূপে রামকৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যেমন অনেকে কালীর অবতার বলেন, সত্যানন্দদেবকে তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার বললে অত্যুক্তি হবে না।

নিজেকে গোপন রেখে তাঁর ধ্যানের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কিভাবে প্রচার করতেন একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আশা করি ভালভাবে বোঝান যাবে। আমার পূজনীয়া দিদি শ্রীমতী মলিনা মুখার্জী রামনগর হতে সিউড়ী আশ্রম গেছেন ঠাকুর সত্যানন্দদেবকে দর্শন মানসে। সেইদিন একজন আমেরিকাবাসী শিল্পীসাহেব কথামৃত ব্যাখ্যারত সত্যানন্দদেবের মূর্ত্তি স্কেচ করতে সুরু করেন সকলের অলক্ষ্যে। সকলের দৃষ্টি এড়ানো গেলেও যিনি অবতার তিনি যে “সূর্য্যের আলো, ভিতর বাহির সব দেখতে পান”

(কথামৃত)—কাজেই তাঁকে এড়ানো যাবে কি করে? ঠাকুরের দৃষ্টি পড়া মাত্র তিনি মন্দির বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়ে ইসারায় সাহেবকে বললেন "ঠাকুর থাকতে আমার ছবি কেন? ধরা পড়ে যাওয়ায় সাহেব কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেও এই অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তির স্কেচ গ্রহণের লোভ সংবরণ করতে পারলেন না…তখন গোপন, লাজুক ঠাকুরটি গৈরিক টুপী মাথা হতে নামিয়ে মুখ ঢেকে গুটী গুটী মন্দিরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ হতে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তদল হায় হায় করতে লাগলেন আর সাহেব নিজ কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করতে লাগলেন।

দীক্ষা দেবার পর বলতেন—"যদিও তোমরা জানো আর আমিও জানি—আমি তোমাদের দীক্ষা দিই নাই—ও বিষয়ে মা আমাকে জানিয়েছেন যে—ওর সমস্ত দায়িত্ব-টুকু মা'র নিজের—এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মা'র আদেশ না নিয়ে আমি কাকেও বাহ্যতঃ দীক্ষা দিই নাই—মন্ত্র মা'র, দীক্ষা মা'র, আমি কেবলমাত্র মধ্যস্থ বা medium, মা-ই এই medium এর মাধ্যমে কাজ করিয়ে যাচ্ছেন" (স্মৃতির তীর্থে, ৪র্থ খণ্ড)—এই কথাগুলি কি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের "আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী"….ইত্যাদির প্রতিধ্বনি নয়? তাঁর উপর মা'র আদেশ "ওরে, তুই ভাবমুখে থাক" মনে করিয়ে দেয় সত্যানন্দদেবের উপর মার নির্দ্দেশ "তোমাকে আমার প্রয়োজনে থাকতে হবে।" "মা সব জানে, আমি কিছু জানি না"—জগতের মায়ের সঙ্গে সহজভাবে ঘর করা, চিরশিশুর মতো মায়ের উপর নির্ভরতা ও সব কাজ তাঁর নির্দ্দেশ নিয়ে করা—যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছাড়া অন্য অবতারে শোনা যায় না।

কৃষ্ণের মতো সুদর্শন চক্র ছিল না শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে; মোক্ষম অস্ত্র ছিল প্রণাম যা দিয়ে তিনি কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ তাবড় তাবড় রথী-মহারথীদের কাৎ করেছিলেন। সত্যানন্দলীলাতেও সেই একই অস্ত্রের প্রয়োগ। নিজের চরণাশ্রিত সন্তানদেরও করছেন করজোড়ে প্রণাম; প্রতিবাদ জানালে বলছেন, "তোমাদের হৃদিস্থিত হৃষিকেশকে প্রণাম করছি।" পতিতপাবনী গঙ্গার দিকে চেয়ে সেই উদাস, ফ্যালফেলে, সমাধি উধাও দৃষ্টি… মনে হয়েছে দখিনাপুরীর লীলার ঠাকুরই নব কলে… ফিরে এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে স্বামীজীর ভাষায় "বনের বেদান্ত… ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে"। "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু স… ভূতে সেই প্রেমময়। মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর… এ সবার পায়"—স্বামীজী শুধু লিখলেন না, হাতে ক… করে দেখালেন। ঠাকুর স্বামীজীর প্রবর্ত্তিত কর্ম্মে গতি… বেদান্তের সেবা—মহাযজ্ঞে সত্যানন্দদেব ছিলেন অন্য… প্রধান ঋত্বিক। তাই তো বন্যাত্রাণে সাহায্যকল্পে তাঁর… ও গৃহীসন্তানদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষায় পাঠালেন;… লিখলেন—"অন্ন দে—অন্ন দে…ভুখারী শিব পুকারি… দুয়ারে মা তোর কেঁদে কেঁদে সেধে সেধে"…। "ঠা… সত্যানন্দদেবের কল্যাণ কর্ম্মের তিনটি দিক ছিল…অন্ন… ঔষধদান আর বিদ্যাদান…বলতেন - মানুষের এই তিন… মূল—তারা দুটো পেট ভরে খেতে চায়, অসুখে একটু… চায় আর তার সঙ্গে আমাদের যোগ দিতে হবে… বিদ্যাদান, তাদের একটু জ্ঞানের আলো দিতে হবে। পরিকল্পনাতেই আজ তাঁর সঙ্ঘে বিদ্যায়তনের….সে… নিকেতনের সৃষ্টি, নিত্য ভক্তনারায়ণ, দরিদ্র নারায়ণের… আজও অব্যাহত। তাঁর আদেশই ছিল কেউ যেন… ফিরে না যায়। শত ধনী ভক্তদের মাঝে ব্যস্ত থেকে… উঠানের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা দীন নারায়ণটিকে… এড়ায়নি, ডেকে প্রসাদ দিয়েছেন……দীন ভিখারিনী… খেতে বলেছেন….ভুল হয়ে গেছে, সে ফিরে গেছে উপবা… শুনে—বেলা ৪টা পর্য্যন্ত নিজে থেকেছেন অভুক্ত যতক্ষণ… তাকে খুঁজে এনে খেতে দেওয়া হয়েছে,—বলতেন… দেবেকো হৈ টুকরা ভালা লেবেকো হরিনাম….আমরা… লোককে দুমুঠো দেবো, হরিনাম করবো, ঠাকুর… চালিয়ে দেবেন….এই রকম করতে করতে একদিন জয়… বলে যাত্রা করবো।" (একমুঠো আকা… শ্রীঅর্চ্চনাপুরী)

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে স্ত্রী-গুরু করলেন গ্রহণ। সহধর্মি… শ্রীশ্রীমাকে জগজ্জননীজ্ঞানে করলেন ষোড়শীপূজা…

সুযোগ্যা শিষ্যা গৌরীমাকে বললেন "গৌরীদাসী, আমি জল ঢালি আর তুই কাদা চট্‌কা।" সেই কাদা চটকানোর অসামাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতেই যে অবতার বরিষ্ঠের 'ধূলি বিমলিন পঙ্কিল ধরায়' পুনরাগমন। দায় যে তাঁর কিনা, তাই তো যুগে যুগেই তাঁকে আসতে হয়। এবারের লীলায় গৌরীদাসীদের দিয়ে বেশ করে কাদা চটকে নিলেন। সত্যানন্দলীলায় দেখি তাঁর নিজের হাতে গড়া সন্ন্যাসিনী মায়েদের অদ্ভুত ত্যাগ, তপস্যা আর তেজোদীপ্ত প্রতিভা। অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেতাবী শিক্ষা লাভ না করেও দর্শন, কাব্য, নাটক, কবিতা, সঙ্গীত প্রভৃতি রচনা করে দিকে দিকে তাঁরা ঠাকুরের কথা ছড়িয়ে দিচ্ছেন যা দেখে অতি বড় অবিশ্বাসীও বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন যে এক গৌরীদাসীর পরিবর্তে আবির্ভূতা হয়েছেন অনেকগুলি গৌরীদাসী। এঁদের দেখে সেই পরমানন্দ মাধবের কৃপার কথাই মনে পড়ে। স্বামীজী বলেছিলেন—"আমার কিসের গৌরব? রামকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে এক মুঠো ধুলো হাতে নিয়ে আমার মত শত শত বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে পারেন" —সে কথার সত্যতা প্রমাণ করতেই যেন এবারের লীলা বিগ্রহ ধারণ।

শাস্ত্রে আছে :

"পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষনাৎ।
অতোঽহি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমোগুরুঃ॥

জীবকে তারণ করতে, লোকশিক্ষা দিতে যিনি অবতরণ করেন তিনিই তো অবতার। তাই ভগবান শঙ্কর শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতার জীবনে অত্যদ্ভুত মাতৃ ভক্তির হয়েছে স্ফুরণ। পিতা-মাতা এবং পরিবারের অপর সকলকে দীক্ষাদান সত্যানন্দলীলার এক চমকপ্রদ ঘটনা যা একমাত্র গৌতম বুদ্ধ ছাড়া অন্য অবতারে শোনা যায় না।

সত্যানন্দসুন্দর ছিলেন সৌন্দর্য্যের পুজারী, শিল্পী, কবি; শুচি-শুদ্ধতার জীবন্ত বিগ্রহ। অন্ধাবরণ ভূমি স্পর্শ করলে যিনি ধৌত করে নিতেন, জামা গায়ে থাকলে যিনি মন্দিরে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন, যিনি স্ব-রচিত গান "পঞ্চবটীর বটের মূলে আর মা বলে কে পড়বে ঢুলে" শুনতে শুনতে ভাব-সমাহিত হয়ে পড়তেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিতে, সেই তিনিই যখন তাঁর ব্যবহৃত পাদুকা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'র বেদীমূলে স্থাপনের অনুমতি দিয়ে সেই পূজাস্থলীতে পূজা করতেন, তখন কে জানতো এ যে 'হরি হ'য়ে হরি বলা'? কিছু ভাববার—বুঝবার আগেই লীলার ঠাকুর ধরা পড়ার ভয়ে লীলা সংবরণ করলেন।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"

৫ই আগষ্ট ১৯৬৯ সন্ধ্যা ৫·২৫ মিনিটে লীলাবিগ্রহ-ত্যাগের মাত্র কদিন আগে লিখলেন—"মহাসাগরের ডাক শুনেছি যে নদীও এবার চলে"; ত্রিনয়নী মাকে মণিমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে ঘোষণা করলেন—"I have finished my last duty." জগতের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখে মায়ের ওপর অভিমান করে গোলাপ গোলাপ ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে ২রা আগষ্ট শেষ সঙ্গীতাঞ্জলি মার চরণে নিবেদন করে লিখলেন "তোর জগতের কেমন দশা। ফিরে দেখ মা মহামায়া।" নিজেকে তিনি রাখতেন গোপন; তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গোপনীয়তার মাঝেও কখনো কখনো স্বস্বরূপ হয়ে পড়েছে প্রকাশিত, আনমনে বলেছেন...."আমি সেই গোপাল যে খেলিছে এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে"....কখনো বা বলে ফেলেছেন—"জানো আমি মহাকাল?" মহাসমাধির মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে বলে গেলেন "আমি আর ত্রিনয়নী এক।" বিশ্বের ঠাকুর মহাযাত্রার মুহূর্তে বরাভয় মুদ্রায় বিশ্ববাসী সকলকে অভয় জানিয়ে শেষ আশীর্বাণী দিয়ে বললেন—"আমি আশীর্বাদ করছি সকলে শান্তিতে থাক, কুশলে থাক"। ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি শ্রীশ্রীমা লীলাবসানের মুহূর্তে বলেছিলেন—"যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও, মা—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।" আবার মনে পড়ছে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী—"এক এক! এক বৈ কি!"

যুগ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব লীলায় নেমে এলেন ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় আর যুগদেবতা সত্যানন্দদেব লীলাবিগ্রহ ধারণ করলেন মাঘী কৃষ্ণা দ্বিতীয়ায়; আর উভয়েই লীলা সংবরণ করলেন সর্বনাশা শ্রাবণে যখন তাঁদের বিদায়

জানাতে সারা পৃথিবী ভেঙ্গে পড়েছে বাঁধভাঙ্গা কান্নায়।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখেছি আমরা দেব-মানব সত্যানন্দদেবকে। যদিও মনে হয়েছিল "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে"—তবু অচিনে গাছকে কি চেনা যায়? তাঁর দিব্য ছটায় আমাদের চোখ গিয়েছিল ধাঁধিয়ে। তিনি বলতেন, "আমার শরীর থেকে একটা জ্যোতিরশ্মি বের হয়, তোরা আমার কাছে বসবি"....কখনো আক্ষেপ করে বলতেন, "আমি ইচ্ছা করলে যে কোন লোকের মন মুহূর্তে তুলে দিতে পারি, কিন্তু কে তা চাইছে বল?" সত্যিই তো, রাজার কাছে গিয়ে আমরা কেউ লাউ কুমড়ো চেয়েছি, কেউ বা স্বর্গের সুষমা দিয়ে গড়া অপরূপ রূপলাবণীর দিকে চেয়ে সম্বিত হারা হয়ে ভেবেছি "ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম"। কোন্ পুরুষপ্রধানের অত নিকট সান্নিধ্য আমরা পেয়েছিলাম ভাবতে গিয়ে আমাদের এখন ভয় হচ্ছে। অর্জ্জুনের মতো আমরাও সশ্রদ্ধচিত্তে অশ্রুপূর্ণ লোচনে করজোড়ে সেই 'পুরুষং মহান্তম্'কে বলি —"শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"—হে প্রভু! আমরা তোমার শরণাগত শিষ্য, আমাদের যাতে মঙ্গল হয় তাই কর আর কৃপা করে আমাদের রক্ষা কর প্রভু।

—শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দার্পণমস্তু॥

মহান অভ্যুদয়

স্বামী রামানন্দ

[গীতি-আলেখ্য]

গুরোর্মধ্যে স্থিতা মাতা মাতৃমধ্যে স্থিতোগুরুঃ।
গুরোর্মাতা নমস্তেঽস্তু মাতৃগুরুং নমাম্যহম্॥
গুরোর্মধ্যে স্থিতং বিশ্বং বিশ্বমধ্যে স্থিতো গুরু.।
গুরোর্বিশ্বং নমস্তেঽস্তু বিশ্বগুরুং নমাম্যহম্॥
স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্ম স্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥
জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদগুরুং।
পাদপদ্মে তয়োঃশ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।
গিরিগৈরিকমণ্ডিতং জ্যোতির্ম্ময়ং নিত্যমানন্দমূর্ত্তিং।
করুণাবতারং প্রেমপুরুষং সত্যানন্দরূপং নিয়তং নমামঃ॥

...বন্দনা...

প্রথমে বন্দি আমি শ্রীগুরুচরণ
তুমি দেব সত্যানন্দ অখিল কারণ।
দেবমাতা কাশীশ্বরী চরণ কমলে
বন্দি আমি দেব পিতা বন্দি সকলে।
আমি অতি হীনমতি না জানি ভজন
কৃপা করে রাখ দেব দাও শ্রীচরণ।
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা হয় যেমতি
শ্রীচরণে অঞ্জলি লহ সেমতি।

* * *

মানুষের রূপ ধরে স্বর্গের দেবতা যখন নেমে আসেন এই মাটির পৃথিবীবুকে, তখন তাঁরা হন আশ্চর্য্য সরল।...যুগে যুগে সেই একই খেলা, একই লীলা মধুময় হয়ে ওঠে। বাল্যে চপল গোপাল, কৈশোরে ভবিষ্যত জীবনের পরম প্রতিশ্রুতিময় অপরূপ ছন্দ মাধুর্য্য, আর যৌবনে জ্ঞানগম্ভীর শঙ্কর, আবার কর্ম্মবীর পুরুষসিংহ; এবং প্রৌঢ়ে সহজ ভাবের আলা ভোলা বাউল; আর শেষে শৈশবের সৌন্দর্য্য

নিয়ে আবার দেখা দেয় সেই দেবশিশু।—এ এক অদ্ভুত সমন্বয়। ভাবসমুদ্রের সে বর্ণালী রূপমাধুরী যে দেখেছে, শুনেছে সেই ধন্য।....ঠাকুর শ্রীসত্যানন্দদেব ছিলেন তেমনি এক মহামানব, যুগাচার্য, আধিকারিক পুরুষ। আবাল্য উদাসী, বৈরাগী হয়েও তিনি ছিলেন বিরামহীন কর্ম্মযোগী। ....জীবের তাপ হরণ করার জন্য সব জ্বালাটুকু নিজে নিয়ে, দিয়ে গেলেন দহন যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। তিনি যে যুগপুরুষ।

গান

তুমি প্রভু সত্যানন্দ
রামকৃষ্ণগত প্রাণ।
চিদানন্দময় তুমি
পরব্রহ্ম সনাতন॥
যুগে যুগে অবতীর্ণ
নরদেহ করি ধারণ।
ভক্তজনে রক্ষা কর
ত্রিতাপ কর হরণ॥

*　*　*

বাংলার শ্যামশ্রীমণ্ডিত বক্ষে একদিন নেমে এসেছিল শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, ধন্য হয়েছিল রূপসী বাংলা। আর একদিন ধন্য হয়েছিল শ্রীগদাধর সুন্দরের ভাববিলুণ্ঠিত দেব-তনুর স্পর্শে। আবার, তপস্যায়, জ্ঞানে, প্রেমে ক্ষমাসুন্দর রূপে নেমে এলেন বাংলা মাটির মায়ের বুকে আর এক মহান্ পুরুষ। সমাজ সংসারের স্তূপীকৃত জঞ্জাল সরিয়ে, মানুষের দুঃখের আঁধার ঘরে মঙ্গলদীপ জ্বালাতে, জীবন দীপের শিখা প্রদীপ্ত করতে এলেন শিবসুন্দর।—তিনি আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দ দেব।

গান

জগতে যা কিছু সুন্দর দেখি
তারি মাঝে তুমি সুন্দর— সত্যানন্দ সুন্দর।
সুন্দর তুমি ভরে আছ ধরা
ভরে থাক মম অন্তর।
সুন্দর তব এই নীল আকাশ
সুন্দর ফুল দখিনা বাতাস
ধূলি তৃণজল গিরিবনতল
সব জুড়ে তুমি সুন্দর— সত্যানন্দ সুন্দর।
সুন্দর এই ধরাতলে আসি
তোমাকেই যদি না চিনি
ব্যর্থ তব সব আয়োজন
ব্যর্থ মম এ জীবন।
সুন্দর তুমি অন্তরে জাগো
অন্তরে প্রেম রঞ্জিত রাখো
সুন্দর ধ্যানে সুন্দর জ্ঞানে
হয়ে থাকি চির সুন্দর।

*　*　*

যিনি বিরাট, যিনি অণুপরমাণু হতেও সূক্ষ্ম, যিনি সূর্য্যের মত ভাস্বর, চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ, তাঁকে দু'চারটি কথায় কি প্রকাশ করা যায়? আমরা শুধু জানি তিনি স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা; তাঁর স্নেহচ্ছায়ে, পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছি। সেই গিরিগৈরিক মণ্ডিত আদিত্যবর্ণ পুরুষকে প্রণাম করি।

গান

বিশ্বভুবনময় আছো তুমি দয়াময়
ভুবনমোহন নরনারায়ণ
প্রণাম জ্যোতির্ময়।
তোমার মন্ত্রে জীবন তন্ত্রে
উঠুক একটি তান।
তোমার অমিয় মাধুরী স্পর্শে
সব হোক্ মধুময়।
তুমি অমৃতদীপ জ্বালায়েছ প্রভু
দিশাহারা পথিকেরে
ওগো স্নেহময় পিতা স্নেহময়ী মাতা
হে চির করুণাময়।
জয় জয় তব জয়॥

আচার, নিষ্ঠা, ভক্তি ভগবানকে টেনে আনে এই ধূলার ধরণীতে। তাই যুগে যুগে একে একে হয় তাঁদের শুভ আবির্ভাব।.......স্বপ্ন দেখেন তন্দ্রালসা জননী কাশীশ্বরী দেবী—চারটি শিশু, চুড়ো ক'রে চুল বাঁধা—তাঁকে ঘিরে ঘিরে নাচ্ছে। কি সুন্দর তাদের অঙ্গ সুষমা, কি অপূর্ব তাদের নৃত্য।......সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত।

একদিন দেবপিতা মহেন্দ্র নাথের আর্দ্দালী কন্যা একটি শিলা এনে দেবমাতা কাশীশ্বরীর হাতে দিয়ে বল্‌লে—এই নাও শিব। শিশুর দেওয়াকে অবহেলা না করে তিনি পণ্ডিতদের দেখালেন। পণ্ডিতেরা শিলা লক্ষণ দেখে বল্‌লেন—এ শিব নয়, নারায়ণ শিলা—দধিবামন।···ঠিক এমনি ভাবেই পেয়েছিলেন রঘুবীরকে দেবপিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।···· আবার একদিন অতর্কিতে পাওয়া গেল নর্ম্মদেশ্বর শিব জটাধারী ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে; তারপর এলেন গণেশ।— এখন সকলে বুঝলেন সেই স্বপ্নের অর্থ। ·· এদিকে মৃতবৎস-প্রসবা কাশীশ্বরীর ব্যাকুল হৃদয়ের প্রার্থনা—হে ঈশ্বর, আমাকে এমন একটি সন্তান দাও যার জগৎ জোড়া নাম হবে। এ প্রার্থনা চিরন্তন। সুদূর অতীতে একদিন শঙ্কর জননী বিশিষ্টার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল এই প্রার্থনা। আবার নদীয়ার আকাশবাতাস স্পন্দিত করে উঠেছিল সেই আকুল প্রার্থনা—প্রভু, তুমি এসো।

গান

হে অচেনা চির চেনা চেনা
তুমি এলে ধরার বুকে।
অচিন দেশে কোথায় ছিলে
এবার বুঝি পড়ল মনে
খেলতে খেলা নূতন করে
নেমে এলে সবার দুঃখে।

* * *

কাশীশ্বরীর বেদনা জর্জ্জর প্রার্থনাও বিফল হল না··· দেবপিতা মহেন্দ্রনাথ ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পূজারী। তিনি একদিন লালবাজারে বদলী হলেন। কলকাতার সহকারী পুলিশ কমিশনার হয়ে লালবাজারের বাড়ীতে এলেন। একদিন রাত্রে তিনি রাউণ্ড দিতে গেছেন। বাড়ীর সকলেই তখন ঘুমিয়ে। হঠাৎ কাশীশ্বরীর ঘুম গেল ভেঙ্গে, চেয়ে দেখলেন একটি জ্যোতির রেখা তাঁর শরীরে এসে পড়েছে। ভীত, সন্ত্রস্ত হৃদয়ে বলে ওঠেন—কে? কে?······শেষে অনুসন্ধান ক'রে জানলেন ঠাকুর ঘরে দধিবামনের অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত সেই আশ্চর্য্য আলো।······প্রকৃতির নিয়মে দিনের পর রাত, তারপর মাস—এমনি করে দশটি মাস গত হল। ১৯০২ সালে ফাল্গুন কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার রাত্রে বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ। প্রকৃতি বাসন্তিকার আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। তার বুকে নন্দন বনজোৎস্না। প্রসূতির ঘরখানি পদ্ম ফুলের গন্ধে ভরপুর। শ্বেতশুভ্র শতদলের মত এক দিব্য শিশু জন্ম নিল। তার অপার্থিব রূপ সৌন্দর্য্য দেখে সকলে আনন্দ হিল্লোলে মেতে উঠ্‌ল। তারপর দেখল তারা—শুধু পদ্ম গন্ধ নয়। এক ঘর পদ্মবীজ ছড়ানো!···· ধাত্রী বলে উঠ্‌ল—মানুষের ঘরে কি এত রূপ হয়! এযে দুধসাগরে নেয়ে ওঠা কোন্ অচিন দেশের এক রাজহাঁস। এত মানব শিশু নয়। দেখছি এর ডান হাতে আবার ছয়টা আঙ্গুল। মনে পড়ে গেল মহেন্দ্র-নাথের—সেই সিদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা; বলেছিলেন—আপনার ঘরে মহামানবের আবির্ভাব হবে, তার হাতে ছয়টা আঙ্গুলের চিহ্ন থাকবে।·······আনন্দ অশ্রু গড়িয়ে পড়ল দুই ফোঁটা—অস্ফুট স্বরে বল্‌লেন—দেবতা, তুমি এসেছ?

গান

সত্যলোকের সত্যব্রত
তোমারে করি প্রণাম।
ধরার দুঃখে নর রূপ ধরে
আসিলে মর্ত্তধাম।
যত সব গ্লানি মান অভিমান
মুছে যাক্ তব অসীম কৃপায়
ও রাঙা চরণে রাখ রাখ প্রভু
দয়াময় তব নাম॥

* * *

দেবতার অলখ লীলা হয় শুরু। শিশুর আলোকরা রূপ দেখ্‌তে সকাল সন্ধ্যা হয় ভীড়।·······হঠাৎ ঠাকুর ঘরে শোনা যায় নূপুরের ঝুম ঝুম শব্দ; আর সেই মনমাতানো মিঠে আওয়াজ শুনতে শুনতে মা কাশীশ্বরী হয়ে পড়েন আত্মহারা। কখনো দেখ্‌তেন কতকগুলি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে এক সাথে নাচছে। মনে মনে বলে ওঠেন—ওরা কাদের ছেলে? পরক্ষণেই তারা যায় মিলিয়ে।···মেরীর কোলে ভগবান যীশুর আসার পরও দেখা যেত ঘন ঘন দেবদূতের আগমন। গদাধর জননী চন্দ্রামণিও কত কি

অলৌকিক দর্শনে হয়ে পড়তেন ভীতা।...জননী কাশীশ্বরী দেখতেন শিশু ঠাকুর ঘরে দধিবামনের অঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ভয়বিহ্বল কণ্ঠে তিনি ডেকে ওঠেন—ওগো, তোমরা এসে দেখ, আমার ছেলে কোথায় গেল! .....একটু পরে সম্বিত ফিরলে তিনি দেখেন—এই তো—ছেলে কাছেই তো শুয়ে আছে।.......এই দিব্য শিশুর নাম সত্যব্রত। যিনি একদিন আমাদের মাঝে এসে দেখা দিলেন—জ্যোতি উচ্ছলা ত্রিনয়নী মায়ের ছেলে সত্যানন্দ সুন্দর রূপে। জ্যোতির্ম্ময়ী জননীর কোলে কখনো তিনি সূর্য্য সমুজ্জ্বল, কখনো চন্দ্র কিরণস্নাত স্নিগ্ধসুন্দর।.....তিনি সত্যের, আনন্দের মূর্ত্ত বিগ্রহ—শ্রীসত্যানন্দদেব।

গান

সত্যের সূর্য্যটি আজো ঐ আকাশেতে জ্বল্‌ছে,
আনন্দ উছল চাঁদ আজো দেখি তারাদলে হাস্‌ছে।
সত্য আনন্দ আছে—বল্‌ছে ॥
সত্যই জীবনের তরী বেয়ে চল্‌ছে,
আনন্দ সাগর পানে হিল্লোলে অবিরাম ছুটছে।
সত্য আনন্দ আছে—বল্‌ছে।
সত্যই ফুল হয়ে জীবনের উদ্যানে দুল্‌ছে,
আনন্দ সৌরভে দেহমন বিমোহিত করছে।
সত্য আনন্দ আছে বল্‌ছে।
সত্যই শিশু হয়ে মার বুকে হাস্‌ছে খেল্‌ছে,
আনন্দরূপিণী মা বারে বারে মুখে তার চুম্‌ছে।
সত্যানন্দ আছে—বল্‌ছে।

★

"ঠাকুর সত্যানন্দ"

শ্রীগোপাল দাস কাব্যভারতী

আমার ঠাকুর সত্যানন্দ
　হৃদয় আসনে বসি,
নৈতিক বোধ জাগ্রত ক'রে
　যুগ নিয়ামক ঋষি।
প্রসাদ পেয়েছি আত্মশক্তি
　বাড়িতেছে পলে পলে,
জ্ঞানবর্ত্তিকা উজ্জ্বলরূপে
　সাধন শিখরে জ্বলে,
ঐশী-শক্তি কৃপার পরশে
　হৃদয় হ'য়েছে ধন্য,

মানস আকাশে দিব্য সত্ত্বা
　আশয় করিছে শূন্য।
অহেতুকী কৃপা জীবতন্ত্রে,
　ঠাকুরের সামগান,
যুগাবর্তে পতিত জনের
　সাধিছেন কল্যাণ।
আর্ত্ত ক্লিষ্ট যেবা আছ যেথা
　শরণ লহগো তাঁর,
অপার শান্তি করুণা নেত্রে
　বরষিছে অনিবার।

●

তোমার ও নিটোল বুকে

স্বামী অরুণানন্দ

অনন্তের দুয়ার ভেদি
দাঁড়ালে গো আসি
করুণার দীপশিখা হাতে
নিখিলের বেদনা মুছায়ে
জ্বেলে দিতে শিখা অনির্ব্বাণ—
জ্ঞান ও প্রেমের
সেতুবন্ধ রচিলে হেথায়—
নীল এ দেউলে
প্রীতির পরশধন্য—পরম শান্তির।
তবু কেন কিছু নাই—
মনে হয় আজ
ধূ ধূ করা বুকে মোর—
সাহারার জ্বালা—
মহাসাগরের ডাকে হয়ে গেছে শেষ—
এ 'শেষ' আর ফিরিবে না—
মহাপ্রলয়ের হল বুঝি শুরু
সৃষ্টির আহুতি যজ্ঞে
প্রাণে প্রাণে অণুতে অণুতে
জ্বলে যাবে অনন্ত দহনে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আবর্তিত হবে—মহাকাল,
নিঃশেষে বিলীন হবে যত গ্রহতারা
তবে বুঝি শান্ত হবে—
এ মহা ক্ষুধার।
মহাসাম্যের বুকে—
আবার লাগিবে দোলা—
নব সৃজনের
আবার উঠিবে ফুটি আলো-হাসি গান
দিকে দিকে আবাহনী উঠিবে গাহিয়া—
মধুর সংগীতে,—
তোমারে লভিতে
বেদনার শতদলে উঠিবে ফুটিয়া

দুঃখহারী তুমি—জানি আমি,
সর্ব্বহারা ঝড়ে নিঃশেষে ঝরে যাবে
মুছে দেবে শান্তির নিবিড় আশ্রয়
তাও জানি সখা—
শুধাই তোমায়—
আসিবে কি সেই প্রেমনত্র রূপে
গোলাপী কোমল তনু স্নিগ্ধ আলো ঝরা
অরূপ সায়র সেঁচা মোহন চরণ
আঁধার সমুদ্র মাঝে দুটী আলোর তরণী
রূপমুগ্ধ ধরিত্রীর বুকে রাখিবে কি?
আবির ছড়ানো মুখে সেই মধু হাসি
'আয়' বলে নিবিড় আবেগে—ডাকিবে কি
সব ব্যথা মুছে যাবে
ঐ সঙ্গ লভি
হৃদয় নিঙাড়ি দিব হাসি কান্না যত ফুল
রেখেছি সাজায়ে বুকে, অতি সযতনে
সারা অঙ্গ লুটায়ে আমার
উজাড় করিয়া দিয়া দেহমন প্রাণ
করিব প্রণতি
উঠিবে সংগীত শুধু সব সমর্পণের
লহ নতি লহ নতি লহ নতি।
ওগো আপন হে মহাসুন্দর!
ওগো গোপন হে ক্ষমাসুন্দর!
ওগো নটন হে অফুরাণ প্রেম
টেনে নিও ঐ শুভ্র কোলে
বুলাইও হাত মোর শিরে
চাহিনা জ্যোতিলোক কিংবা নিত্যলোক
অসীম সৃষ্টির বুকে যুগ হতে যুগে
রহিব গো লুকাইয়া মুখ
ডুব দিয়া সমস্ত সত্তায়—
তোমার ও নিটোল বুকে।

অপরূপ দিব্য স্মৃতি

শ্রীকামাখ্যা নাথ সেনগুপ্ত

পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব তখন সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভক্তগণ সহ অবস্থান করছেন। শুভ দিনটি হচ্ছে বাংলা ১৩৬৫ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ। সাংসারিক নানা কারণে ভারাক্রান্ত মনে সর্ব্ব দুঃখ হরণকারী শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ তলে সকাল আটটায় দুবরাজপুর থেকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। শ্রীমন্দিরের সম্মুখেই শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন। শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম। করুণাময় শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীহস্তের কৃপা স্পর্শ দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। "কুশল"? জিজ্ঞাসা করলেন।

কিছুক্ষণ সমাগত সাধু ভক্তগণের সঙ্গে দিব্য আলাপ আলোচনার পর সহসা আমার দিকে কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "কবিরাজ, মাকে নাম শোনাও।" আমি করজোড়ে নীরব সম্মতি জানালাম। শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয়া মায়েদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "মন্দিরের হারমোনিয়ামটা দাও তো।" তার পরেই সেটি দরজার সামনে রাখা হ'লো। আমি যেন বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে সব শুনছি এবং দেখছি। মন্দিরের হারমোনিয়াম বাইরে আনা, এমন তো কখন হয় নাই!

হারমোনিয়ামটি সামনে টেনে নিয়ে চোখ দুটি বন্ধ ক'রে শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণতি জানিয়ে গান ধরলাম, "মাটির দোলে ভুলবো না আর, ভুলবো এবার মায়ের কোলে……।" শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত সঙ্গীত। সেদিন মনে হয়েছিল আমারই জন্য যেন দয়াল শ্রীঠাকুর এটি রচনা করেছেন। এ যেন সঙ্গীত নয়। বেদনার মূর্ত্ত বাণী। ভারাক্রান্ত হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন দুটি চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় বর্ষিত হ'তে লাগলো। আমাতে যেন আর আমি নাই। আকুল ভাবে গাইছি। বুকটা যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে। কি এক অব্যক্ত বেদনা যেন সুরের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। সে বেদনায় যেন আনন্দেরও স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। সে অবস্থার যেন বর্ণনা করা যায় না।

তারপর গান থেমে গেছে। কতক্ষণ গাইলাম মনে নেই। চোখ দুটি যেন জলে ভরে আছে তখনও। চোখ যেন খুলতে ইচ্ছা করছে না। শুনতে পাচ্ছি মন্দির মধ্যে পূজনীয়া মায়েরা, বাইরে পূজনীয় সাধু ও ভক্তগণ যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তখন। বন্ধ চোখেই শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে লুটিয়ে প্রণাম করতেই করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্ম হস্ত যুগল আমার মস্তকে স্থাপন ক'রে যেন টেনে নিলেন কোলের দিকে। সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করে কান্না ভরা করুণামাখা কণ্ঠে বললেন, "কবিরাজ, সর্ব্বকল্যাণ হোক। তোমার গান ৺ভবতারিণীর চরণে পৌঁছে গেছে। বুক নিঙ্ড়ে গেয়েছো তো!" আরো কত যে এমনি বললেন!

শ্রীমুখ দর্শনে দেখি শ্রীশ্রীপ্রভুর নীলকমল নয়ন দুটি হ'তে যেন তখনও অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে। করুণা ঝরে পড়ছে যেন। আমার তখনও যেন সম্বিৎ ফিরে আসেনি। এমন গান তো আমি কখনও গাই নাই। করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করে তাঁর সকল আশীর্ব্বাদ দিয়ে যেন আমাকে দিয়ে এমন আকুলভাবে গানটি গাওয়ালেন। এমন গান তো আমার জীবনে আমি কখনও গাই নাই।

৺শ্রীশ্রীগোপাল জিউএর প্রসাদী শঙ্খ সদৃশ সন্দেশ আমায় প্রসাদ দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রশ্ন করলেন, "কালীকীর্ত্তন, তৃতীয় খণ্ড কি তোমার কাছে আছে?" আমি করজোড়ে "না, ঠাকুর" বলায়,

পূজনীয়া মায়েদের বললেন, পুস্তকখানি দিয়েই পুনরায় শ্রীহস্তে তুলে নিয়ে কলমটি চাইলেন পূজনীয়া মায়েদের কাছে কলম নিয়ে শ্রীহস্তে পুস্তক খানির দুটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে লিখলেন,

"ঐ নামের মালা
কণ্ঠে থাকুক দোলা"
সঃ

তারপর আমার প্রসারিত হস্তে অর্পণ করলেন আর বললেন, "নাও, কবিরাজ, শ্রীঠাকুর তোমার সর্ব্ব কল্যা করুন।" কত যে করুণা বর্ষিত হ'তে লাগলো শ্রীমুখ হ'তে তা বর্ণনা করতে পারা যায় না।

গান শেষে দেখলাম শ্রীমন্দিরের মাইকটিও শ্রীশ্রীঠাকুর কোন সময়ে আমার মুখের সামনে ধরে দিয়েছেন। যে মাধ্যমে শ্রীমন্দির শীর্ষ হ'তে মাইক্রোফোন সাহায্যে সিউড়ী সহরের অনেকাংশে সঙ্গীতটি শোনা গিয়েছিল। মনে পড় পূর্ব্ব বৎসর এই মাসের এই তারিখেই শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা ক'রে আমায় শ্রীচরণাশ্রিত করেছেন।

কয়েক দিন পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর দুবরাজপুর আশ্রমে শুভাগমন করলেন। শত শত ভক্ত পরিবৃত হ' শ্রীমন্দিরের বারান্দায় দণ্ডায়মান হ'য়ে করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর অদূরে দণ্ডায়মান আমাকে উদ্দেশ্য ক'রে উচ্চস্বরে বলছে "জানো কবিরাজ! সেদিন তোমার গানটি সারা সহরে (সিউড়ীতে) ছড়িয়ে পড়েছিল। আকুলভাবে বুক নিঙ গেয়েছিলে তো।" শুনে যেন আমি আবার সম্মোহিত হ'য়ে গেলাম। ভগবান! তোমার এত কৃপা। সত্যিই তু করুণাবতার।

সত্যানন্দ

শ্রীকালিপদ বাগচী

সত্যের যে কি আনন্দ
নেইকো যে তার ভাল মন্দ,
হৃদ্ কমলে বস্‌রে মা তুই
সত্যানন্দ নামটি ধ'রে !
সত্যানন্দ পাবার তরে,
ফিরি ঘুরি দ্বারে দ্বারে,
তখন তুই মা এলোকেশী—
বীরভূমেতে আনলি মোরে।
সত্যিই আনন্দ পেলাম আমি,
সত্যানন্দময়ী তুমি,

সার্থক হ'লো আসা আমার
শোন্ মা তারা বলি তোরে,
তারা, বামা যত পাগল
সত্যর লাগি সবাই উতল
সত্যের সন্ধান পেয়ে শেষে,
নেচে বেড়ায় তোকেই ঘিরে।
কালী মাগো কেঁদে বলে
যেন সত্যেরে সে না ভোলে,
সত্যানন্দ হ'য়ে তারা
থাকরে তুই তার হৃদ্ মাঝারে।

ঈদ ও বাকরা ঈদ

মৌলভী আব্দ্‌র রহীম

[ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব মহাশয় সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করিতেন। তার জাজ্বল্য প্রমাণ আমরা সারদা মেলায় দেখিয়াছি। মেলা উদ্বোধন ঠাকুর নিজে করিতেন, কিন্তু তিনি উদ্বোধনের পূর্ব্বে সমস্ত ধর্মের একজন করিয়া পণ্ডিত, মৌলবী, পাদ্রিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রিত করিতেন। তৎপর সমস্ত ধর্ম্মের ধর্ম্ম পুস্তক হইতে সকলকেই কিছু কিছু করিয়া পাঠ করিতে বলিতেন ও তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে বলিতেন। এই ভাবে সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ে তিনি মেলা উদ্বোধন কার্য্য সমাপ্ত করিতেন। তাই ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম্মের দুইটি প্রধান পর্ব্ব সম্বন্ধে যৎ সামান্য লিপিবদ্ধ করিলাম কারণ, ঠাকুরের জীবনে মিলন বা সমন্বয় এবং ত্যাগের মন্ত্রই প্রধান ছিল এবং এই দুইটি পরবে ত্যাগ ও মিলনের বাণীই প্রধান।]

১। **ঈদ উলফিত্তর** :—চন্দ্র মাসের রমজান মাস অতিবাহিত হওয়ার পর শওয়াল মাসের ১লা তারিখটি মুসলমানদের ঈদ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইসলাম ধর্ম্মে রমজান মাসে রোজা রাখা প্রতি মুসলমান নর নারী পূর্ণ বয়স্ক, সুস্থ, ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য (ফরজ), না করিলেই চলিবে না। এই ধর্ম্মাদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলমান নরনারী একমাস রোজা রাখিয়া থাকেন।

রোজা অর্থাৎ ভোরের সময় পূর্ব্বদিক আলোকিত হইবার পূর্ব্ব হইতে সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর পর্য্যন্ত সমস্ত দিবস খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রী মিলন হইতে বিরত থাকার নাম রোজা। ঐ সময় পান, ধূমপান সমস্তই নিষেধ। মুখের আব ছাড়া অন্য কিছু গলার মধ্যে প্রবেশ করিলেই রোজা ভঙ্গ হইয়া যায়। রোজার মাসে রাত্রি জাগিয়া উপাসনাদি করিতে হয়। রোজার দ্বারা রিপু সংযত হয়। ধনী ব্যক্তি দুঃখী জনের ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করিতে পারে। যাহাতে মানুষের প্রতি হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়। এই ভাবে একমাস কঠোর উপাসনাদি করিয়া খোদাতালার নিকট মানুষ তাঁর ভালবাসার আশা পোষণ করে; আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "যাহারা আমার সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখে, আমি তাহার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দিই, এবং নিজ নৈকট্যতা প্রদান করি।"

তাই মানুষ ঈদের দিন ঈদের নামাজে গিয়া খোদার নিকট পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হয়। এবং তাঁর নৈকট্যতা প্রার্থনা করে। মানুষ ধনী, গরীব মজুর অফিসার ইত্যাদির ভেদাভেদ ভুলিয়া একে অন্যের ভাই জ্ঞানে কোলাকোলি ও আলিঙ্গনে মাতিয়া উঠে। মানুষ হিসাবে সকলেই আমরা একই পিতার সন্তান, তাহা পূর্ণ রূপে ফুটিয়া উঠে। ঈদ অর্থে খুশী, আনন্দ, মিলন।

২। **বাকরা ঈদ** :—বাকরা ঈদ এর পিছনে এক বিরাট ইতিহাস আছে, এখানে সমস্ত লিখিতে গেলে পত্রিকার কলেবর বাড়িয়া যাইবে। সেই জন্য উহার বিশেষ দিকটা এখানে বর্ণনা করা হইল।

বাকরা ঈদ প্রথা সর্ব্ব প্রথম হজরত ইব্রাহিম আলাই হিস সালাম হইতে প্রচলিত হইয়াছে। ইনি একজন খোদার প্রেরিত সে যুগের বড় পয়গমবর (মহাপুরুষ) ছিলেন। ইনি স্বপ্নে দেখিলেন খোদা তায়ালা তাঁহাকে কোরবাণী (উৎসর্গ) করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। তিনি ভোরে উঠিয়া কিছু উট খোদার নামে উৎসর্গ করিলেন। পরদিন রাত্রে পুনঃ ঐ রূপই স্বপ্ন দেখিলেন, ভোরে উঠিয়া আবার তিনি কিছু উট উৎসর্গ করিলেন। পুনঃ রাত্রিতে আবার ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলেন, তখন তিনি খোদার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, "হে প্রভু, আমি কি কোরবাণী করিব?" তখন আবার

আদেশ হইল, "তোমার নিকট যাহা সব চেয়ে প্রিয় তাহাই আমার নামে উৎসর্গ কর।" তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহতায়ালার আদেশ আমার সবচেয়ে প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইলকে খোদার নামে কোরবাণী করা। আল্লাহ প্রেমিক হজরত ইব্রাহিমের নিকট আল্লার সন্তুষ্টির জন্য পুত্রকে কোরবানি করা কোন কঠিন ছিল না। তাই তিনি পুত্রকে কোরবাণী করিবার নিমিত্ত মক্কা হইতে তিন মাইল দূরে মীনা নামক ময়দানে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি পুত্রকে বলিলেন, "হে বৎস, তোমাকে আল্লার নামে কোরবানি করিবার জন্য আমার উপর আদেশ হইয়াছে, তোমার কি মত?" তিনিও মহাপুরুষের সন্তান, আল্লার প্রেমিক, তিনি আনন্দের সহিত জানাইলেন, "হে পিতা, আমি সানন্দে প্রস্তুত আছি, এবং আমার ন্যায় শত শত ইসমাইল আল্লার সন্তুষ্টির জন্য কোরবান হওয়ার কোন মূল্য রাখে না। আপনি আমাকে কোরবানি করুন। প্রথমে আমার হাত পা বাঁধিয়া ফেলুন, আপনি নিজ চক্ষে কাপড় বাঁধুন পাছে গলায় ছুরি চালাইবার সময় পিতৃ মমতা জবেহ করিতে বাধা হয়। এই বলিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। হজরত ইব্রাহিম সমস্ত ঠিক করিয়া পুত্রের গলায় ছুরি চালাইতে প্রস্তুত হইলেন। এইবার আল্লার করুণা তাঁহার উপর নামিয়া আসিল। আল্লাহ নিজ প্রধান দূত হজরত জিব্রাইলকে আদেশ দিলেন যে "হে জিব্রাইল তুমি স্বর্গ হইতে একটি মেষকে হজরত ইসমাইলের পরিবর্ত্তে তাহার স্থলে রাখিয়া দাও।" দূত তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিলেন। হজরত ইব্রাহিম চক্ষু বাঁধিয়া পুত্রকে জবেহ করিলেন ভাবিয়া চক্ষুর পর্দা খুলিয়া ফেলিলেন। তখন দেখিলেন যে, হাত পা বাঁধা অবস্থায় হজরত ইসমাইল দূরে পড়িয়া আছেন, আর তাঁহার পরিবর্ত্তে একটি বেহেস্তী (স্বর্গীয়) মেষ জবেহ হইয়া পড়িয়া আছে।... যখন হজরত ইব্রাহিম নিজ পুত্রের গলায় ছুরি চালাইতে প্রস্তুত হইলেন তখন ঐশী বাণী হইল "হে ইব্রাহিম, তুমি তোমার স্বপ্নকে সার্থক করিয়া দেখাইলে, আজ হইতে তুমি আমার বন্ধু। তোমার এই কোরবানি করাকে আমি মানব জাতির উপর ন্যস্ত করিলাম। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, তোমার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে!" সেই হেতু কোরবানি প্রথা প্রচলিত আছে। কোরবানি আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে খোদাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ধন, দৌলত দূরের কথা, যদি দরকার হয় তবে নিজ প্রাণ ও পুত্রের প্রাণ দিতেও যেন কুণ্ঠা বোধ না করি।

"আবার তুমি এসো"

শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ

তোমার জন্মদিনে ঠাকুর
আবার পাবো দেখা
চোখের জলের আলপনাতে
পড়বে চরণরেখা।
সব হারাণোর বিয়োগ ব্যথার
চিত্ত শতদলে,
ব্যথার বীণে সাধবো আবার
পূজবো নয়ন জলে।

এই ধরণীর কোণে কোণে
অন্ধকারের রাশি
আলোর দুয়ার মুক্ত করে
তখন দাঁড়াও আসি
দেখাও পথের দিশা ঠাকুর
তেমনি মধুর হেসে,
জনে জনে সবার কুশল
শুধাও ভালবেসে॥

পণ্ডিতপুর ঘুরে এলাম

কিশলয় ঘোষ

এমন কিছু দূরের পথ নয়। অথচ কী নিঃসীম নীরবতার মাঝে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতায় নিথর এক শান্তির রাজ্য এই পণ্ডিতপুর কালীতলা। 'মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্ন পৃথ্বী'র স্নেহাঞ্চল বিছানো রয়েছে এখানে। 'শ্যাম-শস্য হিল্লোলে' প্লাবিত ধরিত্রী চারদিকে পরিব্যাপ্ত। দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ যেখানে মাটির বুকে এসে মিশেছে, দৃষ্টি সেখানে অবলীলায় পৌঁছে যায়—বাধা মানে না কোনো। অন্তহীন আকাশ আর ঐশ্বর্যময়ী ধরণীর মিতালি ঘটেছে চোখ জুড়ানো এক প্রসন্নতার মাঝে।

ঠিক বেলা দু'টোয় সিউড়ী যাবার বাস ছাড়ে এসপ্লানেড থেকে। সামান্য কিছু আগে গিয়ে কাউণ্টার থেকে এগারো টাকা পাঁচ পয়সার একটা টিকিট কেটে নিলেই হল। গাড়ীতে সুন্দর বসার ব্যবস্থা। যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে বালী-ব্রিজ পার হলেই বাস ছুটবে তীর বেগে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দু'পাশে ধানের সবুজ ক্ষেত—যেন সবুজ কার্পেটের সারি। শিল্পীর তুলিকায় শুধু সবুজের সমারোহ। ধানের ক্ষেতের ঢেউখেলা দেখে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—"তারা রেখে যায় অকথিত এই বাণী 'আমি আনন্দিত'।" উপরে মেঘমুক্ত নীলাকাশ। মাঝে মাঝে ছোটখাটো গ্রাম আর বনস্থলী। কোথাও বা মনভুলানো গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথ কোন্ সুদূরে উধাও হয়েছে। বাসের চাকার স্পীডের সাথে জপের স্পীড জুড়ে দিলে ত' আর কথাই নেই। দুর্বার গতিতে এক বিরামহীন যাত্রায় যেন ছুটে চলেছি একান্ত বাঞ্ছিত সেই মহানন্দধামে—হুহু করে সময় কেটে যায়।

রাত আটটায় পৌঁছে যাবে বাস দুবরাজপুর পাওয়ার হাউসের স্টপে। সেখান থেকে রিক্সা কমবেশি দু'টাকায় পৌঁছে দেবে পণ্ডিতপুর কালীতলায়—এক নিরালা নিভৃত তপোস্থলে। পৌঁছে মনে হবে, সব কিছুর মায়া ছেড়ে, রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে 'আত্মানং বিদ্ধি'-র সাধনায় মগ্ন হবার মতো এমন উপযুক্ত পরিবেশ বুঝি আর কোথাও নেই। হিমালয়ের নিস্তব্ধ গুহায় বসে সাধনার কথা স্বতন্ত্র—তার মহিমাও ভিন্ন। কিন্তু জপ-তপ-ধ্যানের নিবিষ্টতায় ডুবে যেতে হলে এমন একটি স্থান উপযুক্ত বটে।

পত্রশোভিত বিশাল এক বটগাছের ছায়ায় করুণাময়ী কালীমাতার ছোট্ট মন্দির। নিঃসীম অন্ধকারের বুকে লোকালয় থেকে 'লক্ষ যোজন দূরে'র এই মন্দির প্রাঙ্গণে বসে শোনা যায় বসুমাতার হৃৎস্পন্দন। খসে পড়া গাছের পাতার শব্দও কানে আসে। জোনাকীরা রঙমশাল ছড়ায় চারদিকে। আত্মস্থ হয়ে বসার মতো নিস্তব্ধ নিবিড় এক প্রান্তর।

সদ্য আনা বিজলী আলো জ্বালালেই বাদুলে পোকায় ছেয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ পোকা মরিয়া হয়ে ভীড় জমায় আলোর চারপাশে। ভারি বিরক্ত করে তারা। তার চাইতে আলো নিভিয়ে দিয়ে বসতে পারলে কথা বলা যায় প্রশান্ত প্রকৃতির সাথে সংগোপনে। অথবা ডুব দেওয়া যায় অন্তর্লোকে।

ঝুলে পড়া নাটমন্দিরের অলিন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য জীবনচিত্র শোভিত। সাথে জুড়েছে আমাদের ঠাকুরের অমৃতময় বাণী চারদিকে। মন্দিরের দরজায় বড়ো করে লেখা—'ফুলসুন্দর হও'—Be Like a Flower. স্তিমিত আলোয় সদানন্দময়ী মা হাসছেন অসীম করুণায় বিগলিত হয়ে।

সামনেই বক্রেশ্বর বা সিউড়ী যাবার পীচঢালা পথ। দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে পথযাত্রীরা সবাই ভক্তিবিনম্র প্রণতি জানায় মাতৃ-মন্দিরে। কোনো কোনো বাসের কণ্ডাকটর বাস দাঁড় করিয়ে দৌড়ে এসে প্রণামী রেখে যায় মন্দিরে।

রাতের পুজো-পাঠ শেষে খোলা নাটমন্দিরে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়লাম সবাই। সারদা বিদ্যাপীঠের কয়েকজন ছাত্র রাতে পড়াশুনা করে এখানে। বাড়ীতে আলোর অভাব। সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার লজ্জা পেলাম।

পড়ুয়া-ভাইরা কিন্তু সবাই রাত ৪টা থেকেই পড়াশুনা করছে। অচেতন শুধু আমি। তারপর সকালবেলায় নিত্য হোমে যোগ দিলাম সবাই। এবার নিজেদের কাজ। আর সবাই যার যার কাজে বেরিয়ে পড়েছে! বাণী লেখা ও ছবি তৈরির কাজে মন দিলাম আমি। তবে আমি নিঃসঙ্গ নই। সারাদিন ধরে ভক্তেরা কেউ না কেউ আসছেন—দূর দূর গ্রাম থেকে। এসে কিছুক্ষণ বসছেন মায়ের পদপ্রান্তে। নিবেদন করছেন ভক্তের আকুতি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে—আবার নিজেদের কাজে ফিরে যাচ্ছেন তারা, মন্দির প্রাঙ্গণের শান্তি বজায় রেখে। কেউ এসেছেন নিজের গাছে-ফোটা-ফুলের মালা নিয়ে, কেউবা সাজি ভরে এনেছেন নানা রঙের ফুল। আবার কেউ এসে চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখে গেলেন। গ্রামের ছেলের দল এলো ভাগাভাগি করে নানাবিধ কাজ করতে। নিজেরাই নিঃশব্দে যেন নিজেদের নিত্যকার করণীয় করে যায়। কাউকে বলতে হয় না। কেউ যেন আদেশের অপেক্ষাও রাখে না। এক নিজস্ব নিয়মে সব কিছু হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ সব কাজের মাঝে একান্ত আপনার মায়ের কাজটুকু খুব নিষ্ঠাভরে করতে চায়, মনে হয়, অন্তরের তাগিদেই। কেউ খুঁত ধরে না, কেউ প্রশস্তিও গায় না। পরিবেশটুকুর স্নিগ্ধ মাধুর্য শুধু বেঁচে থাকে অনুক্ষণ সবার আন্তরিকতার মাঝে।

বেলা বাড়তেই শূন্যপাত্র হাতে আসতে থাকে অনেকেই—বলা যায় অবহেলিত জনসাধারণ—স্বামিজীর কথায় 'দরিদ্র-নারায়ণ'। দলে দলে ভাগ হয়ে তারা শিক্ষা নেয় এক একজন শিক্ষকের কাছ থেকে। শিক্ষক হোল গ্রামের কয়েকজন যুবকছাত্র। শিক্ষা দেয়—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবার বিষয়ে, এমন কি ইচ্ছুকদের নিরক্ষরতা দূর করার প্রাথমিক শিক্ষাও। তারা এতো অসহায় যে শ্লেট-পেন্সিল-বই কিনে না দিলে বিদ্যালাভের কোনো সঙ্গতি তাদের নেই। অবশ্য সে-সব মন্দির থেকেই দেওয়া হয়। তারপর তারা লাইন দিয়ে পাত্রহাতে এগিয়ে যাবে বুলগার খাবার নিতে। এই অবসর সময়টুকু যাতে অনর্থক না কাটে, তার জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থা। বছর শেষে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহারোপযোগী জিনিষপত্র পুরস্কার দেবার কথা রয়েছে। খাবার নিয়ে তারা ঘরে ফিরে যায়। আশ্চর্য লাগে, কলকাতায় এতজন 'দরিদ্রনারায়ণ', আমাদের ঠাকুরের কথায় 'ভক্তনারায়ণ', সমবেত হলে কী হৈচৈ ব্যাপার না হয়। তাদের খাবার বিতরণের কাজ ত' এক বিরাট ব্যাপার। অবশ্য রুটিনবাঁধা নিত্যতার মাঝে সব কাজই হয়তো অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে।

বিকেল পাঁচটা বাজতেই সুরু হয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ। একে একে কখন ভরে গেছে ছোট্ট নাটমন্দিরের উন্মুক্ত চত্বর ভক্তের সমাবেশে। নানা বয়সের ভক্ত—ছোট-বড়ো সবাই। দূর দূর পল্লী অঞ্চল থেকেও এসেছেন কয়েকজন সাইকেল চড়ে। সেদিন কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত থেকে পাঠ হোল—সাথে সাথে ব্যাখ্যা। তারপর প্রশ্ন। দেখলাম, এইসব গ্রাম্য ভক্তদের মধ্যে জিজ্ঞাসুর অভাব নেই। সারল্যের সাথে আছে ধর্মীয় বিচার-বুদ্ধি—পুঁথিগত জ্ঞান কিংবা উপলব্ধ সত্যকে যাচাই করার মন। পাঠশেষে সুরু হয় সমবেত ভক্তের কণ্ঠে স্বামী সত্যানন্দ গীতি। একের পর এক আমাদের ঠাকুরের গান, গাইতে থাকেন সবাই গলা-ছেড়ে। কেউ কেউ সঙ্গে এনেছেন একতারা, মন্দিরা, করতাল, টিকরা বা ঐ জাতীয় গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্র। যে যেখানে বসে আছেন, সেখান থেকেই তাঁরা গানের তালে সুর তুলছেন তাদের বাদ্যযন্ত্রে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দলে প্রত্যেকেই সব ক'টি ঠাকুরের গান গাইছে উদাত্ত কণ্ঠে—কোনো পংক্তিই তাদের অজানা নয়। জিজ্ঞেস করে জানলাম, দু'একটা গান ছাড়া প্রায় সব কয়টি গানই নিয়মিত গাওয়া হয় আগে

পরে। কমপক্ষে তারা তিরিশটি গান গাইতে পারে। আর সব ক'টি গানই আমাদের ঠাকুরের কিংবা নিবেদিতপ্রাণা শ্রীঅর্চনা মায়ের। সমবেত ভক্তিগীতি শেষ হয়—"ভাগবত-ভক্ত-ভগবান জয় জয় হে", আমাদের ঠাকুরের শ্রীকণ্ঠে গীত গান দিয়ে। শ্রীশ্রীচরণামৃত ও কাঁচা-বাদাম প্রসাদ নিয়ে, সবাই একে একে ফিরে যায় নিজেদের ঘরে। তাদের চোখে-মুখে চলাফেরায় গ্রাম্য সরলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। এইভাবে আমাদের ঠাকুরের কথা, গান, সুর পৌঁছে যায় দূর থেকে দূরে, গ্রাম থেকে গ্রামে।

জানলাম পরিকল্পনা রয়েছে ভক্তদের বাড়ীতে বাড়ীতে মাসে অন্ততঃ একটা দিন সত্যানন্দ-গীতিসুধা পরিবেশিত হবে এবং সে-কাজ সুরু হবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। মনে আছে, একবার স্বামিজীর উৎসবে একদল ছেলেমেয়ে পণ্ডিতপুর কালীতলার আশেপাশে গ্রামগুলি পরিক্রমা করেছিল, সারাপথ আমাদের ঠাকুরের গান গেয়ে।

সামান্য সময়ের ভালো-লাগা এক বৈরাগী মন নিয়ে ফিরে এলাম এই ব্যস্ত নগরী কলকাতায়। অবিরাম কর্মচক্রের নিগড়যন্ত্রণায় যুক্ত হতে। জানিনে, কতটুকু সময় স্থায়ী হবে সে-মন আমার নির্মম বাস্তব কলকাতার বিষণ্নতায় —পণ্ডিতপুর যাকে একান্ত আপন করে নিয়েছিল কিছুক্ষণ।

সব কিছুর ঊর্ধ্বে গত সন্ধ্যায় গাওয়া ঠাকুরের গানের কিছু কিছু কথা কেবলি বুকের মাঝে রিনিকি-দিনি হয়ে বেজে উঠছে। গতিময় যন্ত্রযানের দ্রুততার তালে-লয়ে-ছন্দে তার অনুরণন চলছেই......।

★

সত্যানন্দ স্মরণে

শ্রীশুচিতা ব্যানার্জ্জী

স্মরণ করিনু পিতা, তোমারেই আজি
এনেছি ভরিয়া আমি অন্তরের সাজি।
শত পুষ্প তুচ্ছ হবে হৃদিপদ্ম কাছে—
রিক্ত আমি পূজিব যে আমার কি আছে?
মুক্তি স্নাত করুণার ধারায় তোমার
সতত রেখেছি তাকে হৃদয়ে আমার।
তোমার যে বাণীগুলি বীনা হয়ে বাজে—
ধ্বনিছে সর্বত্র ওই সকলের মাঝে।
সংগীতের সুর তুমি, আঁধারের আলো—
মুক্তির নিশানা তুমি জ্ঞান দীপ জ্বালো।
বহুদূরে গেছ চলে তবু আছো কাছে,
চাতকের সম বারি তব কাছে যাচে।
চরণের এক কণা রেণু ভিক্ষা চাহি,
তোমার স্নেহের দানে মোরা অবগাহী।
মিথ্যা মায়া মিথ্যা প্রেমে পারিনা ভুলিতে
নাও তুলি পিতা তুমি চরণ তরীতে।
মুছাইয়া দাও মোর ক্লেদাক্ত জীবন,
পবিত্র করিয়া নাও মোর ক্ষুদ্র মন।
তব পদ রঞ্জিত ঐ, করে পুষ্প তুলি
লহ মোর প্রণামের কনক অঞ্জলি।
অন্য কিছু চাহি নাকো সত্যানন্দ নাম
মোর তরে রেখ তুমি চরণের ধাম॥

আমি তোমার মাঝারে হারিয়ে যেতে চাই

শ্রীমতী মায়া দত্ত

আমি তোমার মাঝে হারিয়ে যেতে চাই।
এমন পরম লগন আসবে কবে, ভাবছি বসে তাই।
কি হবে আর কি হবে না
কি রবে আর কি রবে না
এ সংসারের ছোট বড় সব জিনিষের মাঝে
মনটি আমার মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না যে।
এ সব তোমার লীলা বিলাস
এই আছে এই নাই
তাই ওসবে আর মন ভরে না।
সুখের নেশা নাই।
ওগো প্রভু এ জগৎ যে
তোমার খেলার সাধ
একা তুমি বহু হতে
পরলে মায়ার সাজ।
তুমি আছ সবার মাঝে
আমরা বুঝতে নারি
তাই তো তোমার মায়ার খেলায়
তোমায় ধরতে নারি।
তাইতো তোমায় ভুলে গিয়ে
মোহিত তোমার সৃষ্টিতে
তোমায় তো আর দেখতে নারি
এই মোহে অন্ধ দৃষ্টিতে।

হঠাৎ তুমি ভাঙিয়ে দিলে
এত দিনের ভুল
মোহের কাজল মুছতে এলে
তুমি যে অতুল।
সব ভুলে যাই নতুন চোখের
আলোর পরশে
সবার মাঝে তোমায় খুজি
আর সব ? তুচ্ছ সে।
আমি তোমার তুমি আমার
ভাবতে কি যে ভালো লাগে—
ওগো প্রভু কেন তুমি
বুঝিয়ে দাও নি আগে ?
ভুলে ভরা জীবন আমার
ফুল হয়ে যাক্ ঝরে
তোমার চরণ পরশ ক'রে।
ওগো সুন্দর প্রেমের ঠাকুর
যত মালিন্য করো করো দূর
অনুশোচনার দহনে দগ্ধ করে
আলোকে পুলকে জীবন উঠুক ভ'রে।
তোমার পরশে তোমার দরশে
আমারে ধন্য করে
দিতে চাই আমি, তোমাতে মিশায়ে মোরে।

"আমার অহংটি ইষ্টের চরণের ছায়া। অর্থাৎ আমার আর অন্য সত্ত্বা নাই, ইষ্টের সত্ত্বাতেই আমার সত্ত্বা।"

—শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

অলৌকিক

শ্রীশরণাপুরী

এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতে যেমন উপভোগ করার মত আপাত মনোরম অনেক অনেক বস্তু আছে তেমনি শোক দুঃখ ভয় ইত্যাদি বহু রকমের আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক বিপদও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। এই রকম এক আধ্যাত্মিক বিপদ থেকে রক্ষাকর্তা শ্রীঠাকুরের করুণার কথা লিখছি।

সেদিন শ্রীঠাকুর গঙ্গার ধারের বারান্দায় ভক্তগণ বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। চলছে নানারকম ধর্মপ্রসঙ্গ—সেই সময় একজন সাধু একটি মালা শ্রীঠাকুরের হাতে দিয়ে বল্লেন ঠাকুর এটা একটু জপ করে শোধন করে দিন। শ্রীঠাকুর মালাটি একটু জপ করে তার হাতে দিলেন। সেখানে উপবিষ্ট ভক্তদের মধ্যে একটি ভক্তের (গিরিজাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়) মালা জপ করতে সাধ হলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে ভক্ত ভগবানের ধর্মীয় আসর ভাঙ্গার পর শ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে সকলে যে যার বাড়ী গেলেন। এদিকে সেই ভক্ত বাড়ী গিয়ে তার স্বর্গগত জ্যাঠামহাশয়ের (নারায়ণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়) প্রবালের মালাটি জপ করতে বসলো ভক্তটি তখন প্রতিটা রাত ধ্যানে বা জপে কাটাত। যাক মালাটির প্রথম দানাটি জপের সঙ্গে ঘোরাতে গিয়ে তার মনে ইষ্ট নামের বদলে অন্য একটি বীজমন্ত্র ঝঙ্কৃত হলো তিনি তখন এটা কি রকম হলো এ বীজ তো আমার নয় ভেবে দরকার নেই মালা করে বলে মালাটি রেখে দিয়ে ধ্যানে বসলেন। পরের দিন তিনি দোকানে গিয়ে দেখলেন তাদের অতি পরিচিত একজন পণ্ডিত মহাশয় বসে আছেন। তখন তিনি তাকে পূর্ব রাত্রের ঘটনাটি বল্লেন। ঘটনাটি শুনে পণ্ডিত মহাশয় কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চুপ করে থেকে বল্লেন দেখ এই মালাটি যাঁর, তাঁর মন্ত্র চৈতন্য হয়েছিল তাই মালাটি হাত দিতে তার বীজ মন্ত্রটি আপনি ঝঙ্কৃত হলো। তবে আমার আশ্চর্য্য লাগছে তুমি কি করে সেটা উপলব্ধি করলে? প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি বা গুরুবল না থাকলে সাধারণে মালায় হাত দিয়ে অপরের বীজ মন্ত্র বোঝার যোগ্যতা হয় না। তাছাড়া এও জেনো গুরুবল না থাকলে তোমার সেদিন প্রচণ্ড ক্ষতি হতো। এ ঘটনাটি যখন ভক্তটি শ্রীঠাকুরকে জানালেন তখন শ্রীঠাকুর তাকে একটু ধমকের স্বরে বল্লেন তোর কি জপ বন্ধ হয়ে গেছে, ভক্ত বল্লেন না ঠাকুর। তখন ঠাকুর বল্লেন তবে কেন মালা জপ করতে গেলি। সকলে তো ভয়ে চুপ। অল্পক্ষন পরে শ্রীঠাকুর বল্লেন একান্ত সাধ হয়ে থাকে তো বাজার থেকে মালা কিনে আনিস আমি জপ করে দেবো। এই ঘটনার কয়েকদিন পর ভক্তটির খুব কৌতুহল জাগলো মালাটি আরেকবার পরীক্ষা করে দেখতে। একদিন রাত্রে আবার জোড় করে সেই মালাটি নিয়ে বলল ও সেই বীজমন্ত্রটি সড়িয়ে নিজের ইষ্ট নাম জপ করতে লাগল। কিন্তু বেশীক্ষণ পারল না শুয়ে পড়ল তবু বুকের উপর হাতটি রেখে জপ চালাবার চেষ্টা করতেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড—সে দেখলো ঘরের একদিকের কোণা থেকে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছেন মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—মা তারা, আর তার পশ্চাতে মালার মালিক তার জেঠামহাশয়......ঠিক পর মুহূর্তেই দেখলো ঘরের আর দিকের কোনা থেকে শ্রীঠাকুর খরম পায়ে দিয়ে খট খট করে আওয়াজ করে ছুটে এসে মালাটিকে একটি হামল দিস্তায় ফেলে খুব জোড়ে জোড়ে খানিকক্ষণ ঠুকে শেষে বল্লেন এই নে বলে চলে গেলেন। শ্রীঠাকুর চলে যাওয়ার পর তার চৈতন্য হলো সে উঠে বসে দেখে মালাটি কিছু দূরে পড়ে রয়েছে। সে তখন মালাটি তুলে এনে দেখে প্রতিটি পলাতে সাদা সাদা অনেকগুলি দাগ।

শ্রীঠাকুরের নিষেধ সত্ত্বেও মালা নিয়ে বসার জন্যই তো এই বিপদ তাই ভয়ে ভক্তটি তো ঠাকুরকে আর কিছু জানাতে সাহস করল না তাছাড়া সে ভাবল শ্রীঠাকুরইতো মহা বিপদের হাত থেকে বাঁচালেন কাজেই এ ঘটনা তার

অজানা নেই। তবে ঘটনাটি শুনে তাদের বাড়ীর ভট্টাচার্য্য মশায় বল্লেন মালাটি যখন তোমার করাই চলবে না তখন ওটা আমায় দিয়ে দাও। আমি শোধন করে নেবো। ভক্তটি তাই দিল, কিন্তু মালাটির বর্তমানে ১৫০০ টাকার মত দাম তাই একটু ক্ষুণ্ণ ও হয়েছিলো। বহু ক্রিয়া প্রক্রিয়া করার পর আজ অবশ্য মালাটির সাদা দাগগুলি প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

এরপর মনে পড়ে আরেকটী ঘটনার কথা আমাদেরি একজন গুরুভ্রাতা তিনি বেশ ক্ষমতা সম্পন্ন যোগী ছিলেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য মাত্র ৩৬ বছর বয়েসেই তার দেহত্যাগ হয়।

তার জীবিত কালেই একদিন শ্রীঠাকুর সিউড়ি আশ্রমের জামতলাতে বসে সামনে যত সাধুসন্তরা ছিলেন তাদের প্রশ্ন করলেন আচ্ছা শাস্ত্রে মৃত্যুর পর ভক্তের ভগবানের সঙ্গে সাযুয্য স্বারূপ্য সালোক্য সাষ্টী এই চাররকম মুক্তির কথা আছে তা তোমাদের কার কোনটায় ইচ্ছা বলতো ? আমরা যে যার মনোভাব বল্লাম শেষে আমাদের গুরুভ্রাতাটি বল্লেন ঠাকুর আমার এর মধ্যে কোনটার ইচ্ছা নেই। আমার ইচ্ছা আমি মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণলোকে গিয়ে রামকৃষ্ণলোকটিকে ঘিরে যে জ্যোতির বেড়াটি আছে আমি তার ভেতরে না বসে বাইরে গিয়ে বসবো আমার যখন খুশী হবে তখন আমি ঠাকুরের অতি কাছে গিয়ে বসবো আবার যখন ইচ্ছে হবে তখন আমি আবার জ্যোতির বেড়ার এধারে চলে আসবো। আমরা তো সাধ শুনে অবাক আর শ্রীঠাকুর খানিক প্রসন্ন মনেই হাসলেন। কত রকম ভাব আছে ভক্তের।

এরপর কিছুকাল পর তার দেহত্যাগ হয়। তার দেহত্যাগে শ্রীঠাকুর বলেছিলেন ও আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেছে। তার মরদেহ শ্রীঠাকুর নিজে আরতি করেছিলেন সকলকে অঞ্জলি দিতে বলেছিলেন। যাক্ যা বলছিলাম—দেহত্যাগের পর হতে তিনি প্রতিদিন মাঝে মাঝে আসতেন শ্রীঠাকুরের কাছে—শ্রীঠাকুর দেখতে পেয়ে বলতেন বস ঐখানে বস, কখন বলতেন ওদিকে একটু সরে বসো ইত্যাদি। আবার রোজ একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তার জন্য নিজের প্রসাদ পাঠিয়ে দিতেন, আমরা তার উপস্থিত বুঝতাম গন্ধতন্মাত্রায়—তিনি এলেই তার ঘরে যে শোভা নামে ধূপ জলত তার সঙ্গে তার গায়ের গন্ধ মিশিয়ে একটি নির্দিষ্ট গন্ধ আমরা পেতাম। তিনি খুবই জাপক ছিলেন দিনে প্রায় ১০।১২ ঘণ্টা জপ করতেন। আমরা দেখেছি শ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে তিনি যখন বাচ্ছাদের ক্লাশ নিতেন তখন তার মাথাটি ও ঠোঁঠ দুটা সামনে নড়তো এতে বোঝা যেত তিনি সঙ্গে সঙ্গে জপ করেছেন। জীবিত কালেই তিনি বিদেহ যোগ অবস্থা লাভ করেছিলেন কাজেই মৃত্যুর পর বিদেহ হয়ে তার এই আসা যাওয়াটি কিছু আশ্চর্য নয়। বর্তমানে শ্রীঠাকুরের ঘরে যেখানটিতে শ্রীমতির ও গোপালদের সিংহাসনটি আছে শ্রীঠাকুর রাত্রি বেলা তাকে ঐ কোনটিতে বসে জপ করতে বলতেন। এদিকে আমিও রাত্রিতে জপ করতাম। এক একদিন তিনি এত জোড়ে জপ করতেন যে তাঁর জপের শক্তি চক্রাকারে এসে আমার জপের স্রোতটিকে মাঝে মাঝে এলোমেলো করে দিত। একথা শ্রীঠাকুরকে জানিয়েছিলুম ভয় তো পাই না বরং তার জপের শক্তি উপলব্ধি করি শুনে শ্রীঠাকুর তুষ্টই হতেন। গুরু কৃপায় সবই সম্ভব। প্রায় ২০।২৫ দিন পর শ্রীঠাকুর একদিন বল্লেন ও আমাদের সঙ্গে কদিন রঙ্গ করে গেল আজ থেকে ও আর আসবে না। সত্যই তাই এরপরে আমরা আর সেই গন্ধ পেতাম না। ভালো না লাগলেও গৃহজীবনে তিনি বেশ সুখীই ছিলেন। বিত্তবান পিতা নিজের রোজগার সুন্দরী সহধর্ম্মিনী তার ক্রটি ছিল না, এদিকের সন্ন্যাস জীবনে যোগ সাধনে ও ভক্তি রাজ্যে বেশ উন্নতি লাভ করেছিলেন আবার শ্রীঠাকুরের চরণে মাথা রেখে তিনি এ জগত থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আর আমরা কি হতভাগ্য ঠাকুরকে হারিয়ে শুধু দিন রাত্রির ঢেউ গুণছি—

প্রভুর নামে তোমাদের মঙ্গলই হবে।

—শ্রীসত্যানন্দ দেব

দীনকে প্যারে

শ্রীশুভাপুরী

আজ য়্যাদ আ রহী বহী বীতে হুয়ে প্রকাশময় স্বর্ণিম দিনোঁ কী। বহ দিন ঔর কভী লৌট আয়েগা ক্যা ? নহীঁ নহীঁ, বহ দিন ঔর নহীঁ লৌটনেকা। ক্যা রোজ হী বহ সোনেকা ঠাকুর মিলতে হৈঁ ? যুগ যুগ তপস্যা করকে ভী যোগী মুনি লোগ যিন কা পতা নহী পাতে হৈঁ, বহী প্রেমী ঠাকুরজী হমেঁ মিলে থে বড়ে আসানী সে, উস অনোখে প্রেমীকে প্রেমকা কোই থাহ নহীঁ।

ভক্ত লোগ হর সময় ঠাকুরজী কো ঘেরে রহতে। কৈসে যায় ! প্রেমডোরীসে বঁধে জো হুঁয়ে ন ? কিতনে জীবনকে প্রশ্নোঁ কা সমাধান কিয়ে, কিতনে ভ্রান্তোঁ কো মারগ দিখায়ে কিতনে আর্ত্তোঁকো অভয় দিয়ে হৈঁ। সবকে সাথ ইতনে সহজ ভাবসে মিলতে থে জিসকো য়্যাদ করকে আজ আঁসু বাহাতী হুঁ কি ক্যা হমনে খোয়া।

একদিন এক চমার কো হারমনিয়াম কা এক মৃগচর্ম্ম কা ঢকনা বনানে দিয়ে থে। য়ে কাম ঠাকুরজী কী ইচ্ছাসে হী হো রহা থা। চমার এক তরফ বৈঠকে আপনা কাম সুরু কিয়া। কুছ দের বাদ দেখা কী ঠাকুরজী ভক্তোঁকে বীচসে উঠকর বহী চমারকে পাস বৈঠে হৈঁ ঔর উসসে খুব বাতচিত কর রহে হৈঁ জৈসে কিসী অপনে জনসে বাত হো রহী হৈ, ঔর বহ চমার ভী উনসে খুব বাত কর রহা থা। দূর জাতা রহা ভেদ জ্ঞান, ক্যোঁও কী, কিসীনে তো উসে এ্যয়সা অপনায়া নহী। ঠাকুরজী অপনে হাথসে চমার কী যো সীনেকী মশিন থী বো লেকর ঠুক ঠুক কর ঠোকনে লগে ঔর বাত করনে লগে। কাফী-দের হো চুকী, তব ভী ঠাকুরজী নহী নহায়ে, পূজা নহী কিয়ে, জরা সা ডাব কা পানী তক নহী পিয়ে থে। হম লোগ কহনে লগে ঠাকুরজী কিতনী দের হো গঈ। ঠাকুরজী কহনে লগে হাঁ যাতা হুঁ, লেকিন উঠনেকা নাম নহী। দো ঢাঈ ঘণ্টেকে বাদ ঠাকুরজী বঁহাসে উঠ আয়ে। হম লোগ কহনে লগে ঠাকুরজী আপনে উসকে পাস ইতনা দেরী কিয়া ? করুণা বিগলিত কণ্ঠসে ঠাকুরজী কহনে লগে—অরে বো ভী তো ইন্সান হী হ্যৈ, অগর মৈঁ উসে কুছ ন দুঁ তো কৈসে কাম করেগা বতাও। ঠাকুরজীনে উসদিন উসে ক্যা দিয়া থা য়ে থোড়ে হী কিসীকো মালুম ? উসকা দিল ভর গয়া থা, জো উসকো মিলা জিন্দগী ভরমেঁ কহী ন মিলেগা। উসকে কামকে লিয়ে মজদুরী জো মিলনী থী বো তো অবশ্য মিলী থী ফির ভী জো ঔর লাভ উঠায়া বো কহীঁ ন মিলনেকা।

ঔর ভী একদিন ঠাকুরজী ভক্তোঁকে বীচ বৈঠে হৈঁ। উসী সময় এক বাবাজী ঠাকুরজী সে এক ধোতী মাঙ্গে। ঠাকুরজী ভিতর কহ ভেজে এক নয়ী ধোতীকে লিয়ে। ঠাকুরজী জো ধোতী প্রার্থীয়োঁ কো দেনেকে লিয়ে মঁগবায়ে থে বো সব খতম হো চুকা থা। হম লোগ সমঝ ন সকে কী ঠাকুরজী ক্যা কহ রহে হৈঁ। ইসলিয়ে ভীতরসে কহা গয়া কী ধোতীয়াঁ তো সব খতম হো গয়ী। সুনতে হী ঠাকুরজী গুস্সে মেঁ আ গয়ে, দুঃখী দরদী স্বরমেঁ বোল উঠে—মেরা মন হোতা হৈ অপনী ধোতী উতার কর উসে দে দুঁ। তব তো হম সব সমঝ গয়ে ঠাকুরজী ক্যা কহনা চাহতে হৈঁ। জলদীসে জলদী এক নয়ী ধোতী কহীঁ সে লাকর ঠাকুরজীকে হাথ মে রখ দিয়া। তব যাকে শান্ত হুয়ে ভোলানাথ।

বহুতদিন কী বাত হ্যৈ। সিউড়ী আশ্রমকে আঙ্গনমেঁ খুব ভীড় হোতী দরিদ্র নারাণোঁ কী। ঔর বচ্চোঁকো দুধ বিতরণ ভী হোতা থা। উসমেঁ সে এক লড়কী থী বো বিলকুল দেখনেমেঁ সফেদ থী। উসকে শির পর বাল ভী সফেদ থে হম উসে কটী নাম সে পুকারতে থে। তো বো বারবার দুধ লেতী থী, ইস কারণ উসকী তরফ দুধ দেনে

বালে ধ্যান নহী দেতে, ভগা দেতে, পরন্তু বো লড়কী দীন দয়াল ঠাকুরজীকো পহচান রক্‌খী থী। ঠাকুরজী জব মন্দিরসে বাহর নিকলতে থে, তব তো কটী ঠাকুরজীকে পাস আকর কহনে লগতী কী, ঠাকুর, এ ঠাকুর মুঝে দুধ দিলা দো। কৌই কৌই ভক্ত উসকে উপর চিড় জাতে থে, লেকিন ঠাকুরজী বড়ে প্রেম সে কহ দেতে কী "অরে ইসে দুধ তো দে দে।"— বাত তো ছোটী হৈ পরন্তু উনকে হমদরদী মন কা পতা ইসমেঁ হী লগ যাতা।

এায়সী ঘটনা কি তনী হী হৈ্য পর মৈঁ ত দো এক হী লিখতী হুঁ। একদিন নহানে চলে ঠাকুরজী। হম সব কোই কোই খড়ে থে। এক ভিখারীণ ঠাকুরজীসে কহী, কুছ মিলেগা? ঠাকুরজী হমলোগোঁ কে বীচ একজন সে আজ্ঞা দিয়ে কী ইসে অন্ন প্রসাদ দো। বো অন্ন প্রসাদ সমঝ ন পায়ী, জরাসা প্রসাদ দে কর ছোড় দিয়া। ঠাকুর নহানা সমাপ্ত করকে ফির উনসে পুছে, পেট ভর প্রসাদ দিয়া তো? উসনে কহা, নহী ঠাকুরজী মেরী সুননেকী ভুল হুই, মৈঁ থোড়া সা কুছ দী। ঠাকুরজীনে কহা উসে বুলা কর খিলাও নহী তো মৈঁ্য ভী নহীঁ খাউঙ্গা। ভক্ত লোগ চারোঁ ওর ঢুঁড়নে লগে কঁহী ভী উসকা পতা ন চলা। শাম তক ঢুঁড়নে কে বাদ বো দক্ষিণেশ্বর মেঁ মিলী, ঔর উসে লা কর ভরপেট ভোজন করায়ে তব ঠাকুরজী কুছ ভোগ লিয়ে। হমারে ঠাকুর থে দীনকে প্যারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর

গৌতম চ্যাটার্জী

সত্যপথের সত্যানন্দ
তোমারে করি প্রণাম।
তোমারি স্পর্শে ধন্য হয়েছে
এই বিশ্ব নিখিল ধাম॥
সন্ধ্যা তারার সন্ধি হয়ে
আছ মোর মন মাঝারে,
ডাকিবার মত ব্যাকুল বাসনা
দিবে কি গো তুমি আমারে?

কোথায় আজিকে চলিয়া গিয়াছ
কোথা সে অমৃতধাম।
সেথা হতে তুমি দাও গো শক্তি
ডাকিবার মত প্রাণ।
সূর্যের সম প্রখর তুমি
ছিলে এই ধরাতলে,
চন্দ্রের সম স্নিগ্ধ তুমি
কেমনে থাকি গো ভুলে!

ছবিটি তোমার বন্ধু ভাবিয়া
যখন যেখানে যাই,
মনে মনে ভাবি, কেবলই যে কাঁদি
কথা কও দয়াময়।
পাষাণ তুমি তো নও গো ঠাকুর
রক্ত, মাংসে গড়া,
তবে কেন তুমি চুপ করে আছ
মন মম আজ মরা।

যেথায় গিয়াছ, সেথা হতে তুমি
কবে যে আসিবে ফিরে!
প্রণাম তোমারে প্রণাম ঠাকুর
থাক অন্তর মাঝারে॥

সৎসঙ্গ

স্বামী হীরানন্দ

14. 6. 1975

আজ বিকেলে শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক তাঁর পুত্র শ্রীসুধেন্দু মল্লিক এবং সুধেন্দুদার বন্ধু শ্রীঅশোক রায় ও ছোট্ট নাতনী মহাশ্বেতাকে সঙ্গে নিয়ে এসে বসলেন আমাদের সঙ্ঘপতি স্বামী নির্বেদানন্দজীর ঘরে। এসে এসেই তিনি তাঁর ছোট্ট নাতনীর সঙ্গে পূজনীয়া অর্চ্চনা মায়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মা তাকে খুব আদর করলেন ও কাছে টেনে বসালেন। মহাশ্বেতার বয়স সবে আট বছর পূর্ণ হয়েছে। ক্লাস ফাইভ-এ পড়ছে এবং ক্লাসে ফার্স্ট হয়। অপূর্ব বুদ্ধির দীপ্তি তার চোখে মুখে।

জ্যোৎস্নাদা—ওর এসব দিকে খুব ঝোঁক। পাঁচ বছর বয়স থেকে নিয়মিত শিবপূজো করে। ও যখন পাঁচ বছরের, তখন একদিন আমাকে বলছে, দাদু তুই কৃষ্ণের দ্যাখা পাবি। আমি বলি, তাই নাকি। কি করে পাব? কৃষ্ণকে তো দেখা যায় না রে! ও বললো, হ্যাঁ পাবি—তুই ধ্যান কর্ আর কাঁদ্। ধ্যান করলে আর কাঁদলে কৃষ্ণ দেখা দেয়: শুনে তো আমি থ হয়ে গেছি।

মৃগেনদা—সত্যি খুব অবাক লাগছে, অতটুকু বয়সে কি করে এমন জ্ঞানীর মত কথা বলছে।

জ্যোৎস্নাদা—বই পড়ায় ওর খুব ঝোঁক। এরই মধ্যে সেক্সপীয়র ও পড়ে ফেলেছে। ছোটদের জন্য যে বঙ্গানুবাদ বেরিয়েছে সে সব ওর পড়া হয়ে গেছে। আবার বলে যে, সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি আমার ভাল লাগে না। ওতে যত খুন খারাপি মারামারি—ওগুলো ভাল লাগে না। সেক্সপীয়রের কমেডিগুলো আমার ভালো লাগে।

ঠিক বড়দের মত কথা, আচরণ হাবভাব। মুখ টিপেটিপে হাসছে দেখে বোঝা যায় যে, বেশ উপভোগ করছে দাদুর কথাগুলো।

জ্যোৎস্নাদা—মায়ের (শ্রীঅর্চ্চনা মা) লেখা নাটক অনেকগুলো পড়েছে। 'কমলাকান্ত' ভাল লেগেছে, বিশেষ করে একটি গান ওর খুবই ভাল লেগেছে।

অর্চ্চনা মা—(মহাশ্বেতাকে) কোন্ গানটি বেশী ভাল লেগেছে তোমার ?

মহাশ্বেতা—(সেটা বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েনি তাই বিজ্ঞের মত বলে ওঠে) সব গানই ভাল।

ছোট্ট সৎসঙ্গিনীকে নিয়ে আনন্দ আলাপের পরই জ্যোৎস্নাদা মার নতুন লেখা "রূপময় শ্রীরামকৃষ্ণ" প্রবন্ধটা* শুনতে চাইলেন। টেলিফোনে এ বিষয়ে ওঁর সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল। প্রবন্ধটা পাঠ হ'ল এবং পাঠ শেষে এ নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হ'ল। আলোচনাটা বোঝবার সুবিধার জন্য প্রবন্ধটির কতকগুলো উক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি—

"……দেবদেবীর ছবি বা দেবমানবদের ছবির ক্ষেত্রে শিল্পের Realistic ছোঁয়া বড়ই দুঃখজনক হয়ে ওঠে। এটা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করি শ্রীরামকৃষ্ণ সারদার মূর্তির ক্ষেত্রে…প্রামাণ্য গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণকে রূপময়ই বলা হয়েছে। সারদা মায়ের উক্তি 'কাঁচা সোনার মত রং ছিল' ইত্যাদি…শুধু ছবি আঁকার ক্ষেত্রে নয় অভিনয় সিনেমা ইত্যাদিতেও তাঁর

---

* প্রবন্ধটি মাসিক পত্রিকা "সংহতি"র অগ্রহায়ণ' ৮২ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে। আগামী চৈত্র মাসের ভাবমুখে'তেও প্রকাশিত হচ্ছে। —ভাঃ সঃ

যে রূপ লোকচক্ষে ধরে দেওয়া হয় ভক্ত মনে সেও খুবই পীড়াদায়ক....শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তিই বা তৈরী হবে না কেন ভক্তের মানসদৃষ্টির রঙ দিয়ে ?....” ইত্যাদি !

জ্যোৎস্নাদা—খুবই ভাল হয়েছে লেখাটা। খুব ঠিক কথা বলা হয়েছে।

সুখেন্দুদা—সত্যি, এরা রামকৃষ্ণকে কি ভাবে যে পরিবেশন করছে তা বলার নয়। একটা অভিনয় দেখতে গিয়ে দেখি ঠাকুরকে কালো পাড়ের ধুতি পরিয়েছে, দেখে মনে পড়ে যায় তখনকার কলকাতার এক ধরণের যুবকদের বাবুয়ানির কথা—ঠাকুর যেটার নিন্দা করে বলতেন, পরনে কালোপেড়ে ধুতি, হাতে ষ্টিক্, মুখে নিধুবাবুর টপ্পা—ঠিক যেন তাই সাজিয়ে দিয়েছে ঠাকুরকে। কি মর্মান্তিক অবস্থা! আর এখন তো সিনেমা, থিয়েটারের অভিনেতারাই লোকের চোখে সাক্ষাৎ রামকৃষ্ণ হয়ে যাচ্ছেন।

স্বামীজী—একবার একজন বয়স্ক ডাক্তার, শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছেন, তাঁর পায়ের কাছে এসে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়লো, কাঁদ কাঁদ হয়ে বলতে লাগল—ঠাকুর, উদ্ধার কর, আমার কি হবে ? (ঘরে হাসির উচ্চরোল উঠল কথাটা শুনে) দেখ, শ্রীকৃষ্ণেরও তো বৃদ্ধ অবস্থা এসেছিল কিন্তু সর্বত্র তাঁর অল্প বয়েসের সুন্দরতম রূপটাই দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও বয়স্ক অবস্থার মূর্তি চোখে পড়ে না। আবার গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রেও দেখ, বুদ্ধের বয়স আশি বছর পার হয়েছিল, দেহটা জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধদেবের মূর্তিগুলি কত সুন্দর শিল্পের নিদর্শন।

জ্যোৎস্নাদা—অবশ্য বুদ্ধের বৃদ্ধ অবস্থার একাধিক মূর্তি আছে কিন্তু সেগুলি গৌতম বুদ্ধ নয়। বুদ্ধ একাধিক হয়েছেন এবং ঐ মূর্তিগুলি আগের আগের বুদ্ধেরই মূর্তি। সেগুলি চীন দেশে বিশেষ প্রচলিত।

মৃগেনদা—গ্রীক্ দার্শনিক সক্রেটিসের মূর্তি তাদের ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। অথচ জানা যায় যে, তিনি বাইরে দেখতে কদাকার কালো কুরূপই ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভক্তদের চোখে তাঁর কত সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে। জৈন মন্দির গুলোতেও তীর্থঙ্করদের যে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেগুলোও অত্যন্ত সুন্দর। এইসব শিল্পের ক্ষেত্রে ভক্তের দৃষ্টিরও যে বিশেষ মূল্য আছে সেটা এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

জ্যোৎস্নাদা—ভাবমূর্তির কথাটা সত্যিই খুব ঠিক কথা, অবতারদের ভাবমূর্তিই হওয়া উচিত।

স্বামীজী—কীর্তনীয়া রথীন ঘোষ একদিন ঠাকুরকে এসে বললেন যে, বাড়ীতে রাখার জন্য রমেশ পালের কাছে রামকৃষ্ণদেবের একটা মূর্তি তৈরী করার order দিয়েছিলাম। কিন্তু মূর্তিটার clay model টা দেখলুম খুব বড় হয়েছে। অত বড় মূর্তি বাড়ীতে রাখার অসুবিধা হবে মনে হচ্ছে। অথচ শিল্পীকে টাকা advance করা আছে। তাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা—ঠাকুর যদি মূর্তিটা আশ্রমে নেন তো ভালো হয়। ঠাকুর বললেন, আমি তো যে কোন মূর্তি নিতে পারব না। মূর্তিটা আমাকে দেখাতে হবে। খবর পেয়ে শিল্পী রমেশ পাল এলেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরকে কৃপা করে তাঁর ষ্টুডিওতে গিয়ে মূর্তিটা দেখে আসার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। ঠাকুর বললেন, আমি তো কোন জায়গায় বেরই না . যাইহক, বারবার সনির্বন্ধ অনুরোধ করাতে শেষে ঠিক হ'ল ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য সেখানে যাবেন, কিন্তু সেখানে অন্য কেউ থাকতে পারবে না এবং সেখানকার পরিবেশটা অনুকূল করে রাখতে হবে। তাই ঠিক হল—ঠাকুরের যাবার উপযুক্ত পরিবেশই শিল্পী করে রাখবেন। সেই মতো ঠাকুর একদিন দু'চারজনকে সঙ্গে নিয়ে রমেশ পালের ষ্টুডিওতে গেলেন গিয়ে মূর্তি দেখে হতাশ হলেন। বললেন, আমি চাই ঠাকুরের সুন্দর মূর্তি। ঠাকুরের মূর্তি হবে আমার ধ্যানলোকের মূর্তি। তাতে রমেশ পাল বললেন, তাহলে সেটা realistic তো হবে না। ঠাকুর বললেন, দেবমানবের মূর্তি realistic না রাখাই ভাল, idealistic হওয়াই উচিত। তা ছাড়া ঠাকুর তো চিরকাল এরকম ছিলেন না।—বলেই ঠাকুর শিল্পীর হাতের যন্ত্রটা নিয়ে স্বহস্তে মূর্তির মুখ থেকে মাটি চেঁচে চেঁচে সুন্দর রূপ দিলেন, চোখ নাক সব পালটে দিলেন। রমেশ পাল স্তব্ধ হয়ে দেখছিলেন। তাঁর হাতের কাছে রামকৃষ্ণদেবের যতগুলো ছবি ছিল সব উল্টে রেখে দিলেন। বললেন,

এগুলোর তবে আর দরকার কি ? আমি ঐ মূর্তিই করে দিচ্ছি। বোঝা গেল তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। যাইহোক ঠাকুর তো ফিরে এলেন। পরের দিন ভোর হতে না হতেই রমেশ পাল আশ্রমে এসে ঠাকুরের চরণে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম জানিয়ে বললেন, ঠাকুর, কাল আমার মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে—বলেই সঙ্গে আনা একটা পুস্তক থেকে খানিকটা পাঠ করে শোনালেন ঠাকুরকে। দেখা গেল ঠাকুর আগের দিন দেব মূর্তি সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছিলেন হুবহু সেই সব কথাই রয়েছে পুস্তকটাতে। গ্রন্থটা শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। পাঠ শেষ করে রমেশ পাল বললেন, তাই দেখলাম, আপনার কথাই ঠিক, ঠাকুর। দেবদেবীর মূর্তি এবং অবতারদের মূর্তি সুন্দরতমই হওয়া উচিত। কাল সত্যি ঠাকুরের মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

অর্চনা মা—আমাদের ঠাকুর বলতেন, "অভেদ স্বামী এবং অন্যান্য স্বামীজীরা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঠোঁট পাতলা ছিল। যেমন দেখান হয় তেমন পুরু ঝুলে পড়া কখনই ছিল না।" তারপর 'ঢুকে যা মা' 'ঢুকে যা মা' বলে সে রূপ একদম লুকিয়ে ফেললেন। এখন সেই রূপ টেনে বার করা যে কি মুস্কিল হয়েছে কি বলব। আমাদের যন্ত্রণার এক শেষ। বলতেন, "দেবমানবদের অল্প বয়েসের মূর্তি কিংবা পরিণত বয়েসের অটুট স্বাস্থ্যের মূর্তি রাখা উচিত এবং সেই মূর্তিই ধ্যান করা উচিত। কাদা খোঁচা মূর্তি আমার বাপু মোটেই পছন্দ হয় না।" কাজেই এ ধরণের শিল্পের ক্ষেত্রে দেখতে হবে ভক্তরা কি চায়। তারা চায় তাদের ভাবরাজ্যের মূর্তি, ধ্যানের মূর্তি। সে মূর্তিতে কল্পনার ছোঁয়া idealistic ছোঁয়া তো একটু থাকবেই। সেখানে শুধু realistic ছোঁয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

জ্যোৎস্নাদা এবার আশ্রমের মায়েদের লেখাগুলির সপ্রশংস উল্লেখ করলেন।

জ্যোৎস্নাদা—অর্চনা মা, সাধনা মা, শরণা মা, সবারই লেখাগুলো অপূর্ব। "করুণাবতার" টা পড়লাম—ঠাকুরের শিশুদের সঙ্গে লীলা পড়তে পড়তে গ্রীক উপাখ্যানের সেই অরফিয়াসের বাঁশী বাজানর কথা মনে পড়ল। অরফিয়াস যেমন করে বাঁশী বাজিয়ে সকলকে আকর্ষণ করত, তার বাঁশী শুনে সকলে যেমন করে তার পেছন পেছন ছুটতো সেই রকমই যেন মনে হল ঠাকুরের এই আকর্ষণ। সত্যিই অদ্ভুত লীলা!

অর্চনা মা—আমরা তো এই খেলার জন্যই ঠাকুরের কাছে যেতাম প্রথম দিকে। সবাই তখন খুব ছোট। আমার মাত্র ১১ বছর বয়স। ছোটরা সবাই খেলছি সিউড়ী আশ্রমের উঠোনে। ঠাকুর ওপরে রয়েছেন। অনেকক্ষণ খেলেছি কিন্তু খেলা ঠিক জমছে না ঠাকুর না আসাতে। ওপরে গিয়ে দেখি এক ঘর ভক্ত বসে রয়েছে ঠাকুরকে ঘিরে। ঠাকুর ওদের সঙ্গে কথা বলছেন। পুটু বাবুর বাবা এবং আরও অনেকে এসেছেন। বলি, ঠাকুর, আসবেন না খেলতে ? ঠাকুর তাড়াতাড়ি বললেন, ওরে তোদের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম রে। খুব দেরী হয়ে গেছে, চল্ চল্। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বলতে বলতে ঠাকুর উঠে পড়ছেন। পুটু বাবুর বাবা সশব্যস্ত হয়ে বলেন, ঠাকুর, কথা শেষ হ'ল না যে। ঠাকুর বল্লেন, থাক এখন কথা ও কাল হবে। ঠাকুর আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিলেন, তখন আমাদের সে কি আনন্দ।

সুধেন্দুদা—প্রত্যেক অবতার মহাপুরুষেরই দেখা যায় তাঁরা কিছু করে বালক সঙ্গে রাখেন।

স্বামীজী—কিন্তু আমাদের ঠাকুরের বেলায় একটুখানি ব্যতিক্রম এই ছিল যে, তাঁকে বালকদের সঙ্গ করার জন্য বালকদের ডাকতে হ'ত না। বরং বালকরাই তাঁর সঙ্গ পাবার জন্য সব সময় ছুটে আসত; তাঁকে ঘিরে ধরত। আমি ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটেও একথা বলেছিলাম যে, মহাপুরুষরা বালকভাব আরোপ করার জন্য বালকদের সঙ্গ করেন, কিন্তু আমাদের ঠাকুর ছিলেন শিশুর রাজা, একেবারে শিশু হয়ে যেতেন শিশুর দলে।

অর্চনা মা—তখন ধর্ম আলোচনা এসব কিছুই তো বুঝি না। ঠাকুরের কাছে যেতাম, আনন্দ করতে খেলা করতে, ঠাকুরও কখনও ইংরেজী বই থেকে গল্প বলতেন কখনও ছবির বই থেকে ছবি দেখাতেন। একদিন ঠাকুর খুব

সুন্দর একটি ছবির বই খুলে বসেছেন সিউড়ীর মন্দিরের বারান্দায়। আমরা সব ছেলেমেয়েরা ঠাকুরকে ঘিরে ছবি দেখছি একটি ছোট ছেলে ভিড়ের মধ্যে জায়গা করতে না পেরে ঠাকুরের কাঁধে ভর করে ঝুঁকে ছবিগুলো দেখছে, তাই দেখে একজন বয়স্ক ভক্ত (প্রমথবাবু) ছুটে এসেছেন। ছেলেটিকে ধমক দিয়ে উঠলেন, এই সর সর, লাঠি মেরে ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেব, ঠাকুরের গায়ে হাত দিয়ে ছবি দেখছিস্। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ গম্ভীর মুখে প্রমথবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, প্রমথ, তুমি এখন এস না। এখন ওদের সময়।

স্বামীজী—একদিন বিকেলে ঠাকুর সিউড়ীর উঠোনে ছোটদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে নেমে বুড়োদের খেলতে ডাকলেন। বললেন, এস তোমরাও খেল, কিছুটা সময় ছেলেমানুষ হয়ে যাও দেখি। হুড়োহুড়ি সুরু হয়ে গেছে, এমন সময় একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এসে উপস্থিত হয়েছেন। ঠাকুরকে ঐভাবে খেলতে দেখে তিনি যেন একটু অবাক হয়ে গেছেন। ভাবছেন শুনে এলাম এক জিনিস আর দেখছি অন্য। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে তারপর এক সময় সুযোগ বুঝে ঠাকুরকে বললেন, মহাশয় আমি একটু শাস্ত্র আলোচনা করতে এসেছিলাম, শুনেছি আপনি নাকি খুব বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তা একটু আলোচনা হবে কি। ঠাকুর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, শাস্ত্রটাস্ত্র ও আমি তো বিশেষ কিছু জানি না, আমি এই এদের সঙ্গে একটু খেলা করি, এই ছোটদের সঙ্গে আমিও ছোট্ট খেলুড়ে এদেরই জিজ্ঞেস করুন না। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি রে আমি তোদের দলের খেলুড়ে না ? ছেলেমেয়েরা কলরব করে উঠলো, হ্যাঁ ঠাকুর। বললেন, আমি খেলা ধুলো করি আর মায়ের নাম করি, এই করেই কাটিয়ে দিই। আসুন না আপনিও খেলবেন আমাদের সাথে। পণ্ডিতমশাই আর বিলম্ব না করে বিদায় নিলেন। খেলা শেষ করে ঠাকুর বসলেন—আমাদের সঙ্গে পাঠ আলোচনা করতে। সুরু হয়ে গেল উপনিষদের ব্যাখ্যা। পরে বললেন, পণ্ডিত শুনতে আসেনি শোনাতে এসেছিল।

অর্চনা মা—আর একদিন একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। ঠাকুরের কাছে তখন তো সব এক। বাবা, কাকা জ্যাঠা ওসব কিছুই নয়। ওসব থাকতো বাড়ীতে। এখানে সবাই সমান। সেদিন জল ডিঙ্গা ডিঙ্গি খেলা হচ্ছে ঠাকুর বড়দেরও নামিয়েছেন, হরিদাস কাকুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠাকুর তাঁকেও টেনে নামালেন। তখন ঠাকুর ছিলেন জলে, হরিদাস কাকু জল ডিঙ্গিয়ে ডাঙ্গার দিকে ছুটছেন, ঠাকুর তাড়া করেছেন। অমনি পা পিছলে হরিদাস কাকু একেবারে গুম করে পড়লেন মাঝ উঠোনে আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিঠে একটা বড় ফোড়া ছিল সেটা ফেটে গিয়েছে (মহাশ্বেতা হেসে উঠলো ও তার সঙ্গে আমরাও)। ফোড়ার কথা তিনি কাউকে বলেন নি। ঐ অবস্থাতেই আজ এসেছেন। আর ঠাকুর ডাকা মাত্রই নেমে পড়েছেন খেলতে। তারপর তো তাড়াতাড়ি করে আইডিন ওষুধ পত্র লাগান হ'ল। আর একদিন একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করে ঠাকুর সদ্য নেমে এসেছেন ছেলেদের দলে। হৈ হুল্লোড় চলছে এমন সময় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঠাকুরকে বললেন, একটু ধর্ম কথা হোক এবার। ঠাকুর গম্ভীর ভাবে তাকে বললেন, আপনার এখন সময় হয়নি। ভদ্রলোক উঠে চলে গেলেন। তারপরই ঠাকুর কিন্তু সুরু করে দিলেন ধর্ম আলোচনা।

মৃগেনদা—শিশুদের প্রসঙ্গে মনে পড়ছে 'অনুধ্যান' বইতে মা'র লেখা 'আয়' প্রবন্ধের কথা। সেখানে প্রথম দিকের লীলার খুব সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। বিশেষ করে খেলার ছলেই ঠাকুর ত্যাগ বৈরাগ্যের দিকে কেমন এগিয়ে নিয়ে যেতেন সেটাও খুব সুন্দর করে দেখান হয়েছে। একটু পাঠ করলে হয় না।

জ্যোৎস্নাদা, সুখেন্দুদা সবাই সেটা শুনতে চাইলেন। বইটা এনে "আয়" প্রবন্ধ এবং তারপর গীতা মার "আমার বাপী" দুটোই পাঠ হ'ল। সবাই তন্ময় হয়ে শুনলেন। বিশেষ করে উপভোগ করল আমাদের মহাশ্বেতা।

জ্যোৎস্নাদা—মায়েদের লেখার তো সত্যি কোনো তুলনা নেই। সব লেখাগুলিই অপূর্ব। (স্বামীজীর দিকে দৃষ্টিপাত করে) আর আপনার লেখাগুলিও পড়লাম। সত্যি সেগুলিও বড় সুন্দর। সংস্কৃত লেখাগুলোও এবার পড়েছি। আগে পড়িনি। সেগুলিও বেশ সুন্দর হয়েছে, বিশেষ করে ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্রটা খুবই চমৎকার। ওটা যে আপনার রচনা আগে জানতাম না।

স্বামীজী—(হাসতে হাসতে) ওটার একটা ইতিহাস আছে। ওটার খেই কিন্তু ঠাকুরই ধরিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন ঠাকুরের সঙ্গে গঙ্গার জেটীতে বসে সারারাত ধ্যান হয়েছে। এদিকে আমার মনে সারারাতই ঠাকুরের উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম মন্ত্র কি করে রচনা করা যায় এই চিন্তাই ঘুরছে কিন্তু কিছুতেই সেটা আসছে না। কয়েকদিন থেকেই এটা মনে হচ্ছিল কিন্তু সে রাত্রে চিন্তাটা খুব পেয়ে বসেছিল। যাই হক রাত্রি শেষে প্রথম প্রভাতের একটা গৈরিক আভায় পূব আকাশটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। অপূর্ব সুন্দর রঙ হয়েছে আকাশের। তাই দেখে ঠাকুর আমাকে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "দেখেছ মানিক, আকাশের রঙটা? কি গিরিগৈরিক মণ্ডিত রূপ!" ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল সেই গিরিগৈরিক মণ্ডিত মূর্তিই তো আমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর তখন মনে মনে রচনা হয়ে গেল ঐ প্রণাম মন্ত্রটা।—

"গিরিগৈরিকমণ্ডিতং জ্যোতির্ময়ং নিত্যমানন্দমূর্ত্তিং
করুণাবতারং প্রেমপুরুষং সত্যানন্দরূপং নিয়তং নমামঃ॥

জ্যোৎস্নাদা—(পূজনীয়া মা'র দিকে দৃষ্টিপাত করে) মায়ের গলা এখন কেমন আছে? আমরা এর আগে যেদিন এসেছিলাম সেদিন গলাটা তো ভাল ছিল না।

অর্চ্চনা মা—এখন অনেকটা ভালই রয়েছে।

জ্যোৎস্নাদা—তাহলে কি এক আধটা গান হবে?

মা গাইলেন, ' সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

হে মহাকারণ অর্ণবশায়ী পুরুষ প্রধান
জাগ্রত হও জাগ্রত হও
ডাকিছে তোমার সৃষ্টি তমসার তীর হ'তে
হে সত্যানন্দ সুন্দর দাঁড়াও আবার নিখিল নয়ন পথে।
তোমার মহান অভ্যুদয়ে বিশ্বজনের অন্তর
জাগ্রত হোক হে দেবতা
অপাবৃণু আবৃত ঋত অভয় মুদ্রা
তব করধৃত
ডাকুক সবারে তব পূজাপীঠে
একটি অমৃত সঙ্কেতে।
গুঞ্জনহীন চেতনায় তোলো মহামৈত্রী ছন্দ
হে কবি পুরাণ জাগো
তোমার বিশ্বসত্তের বুকে
শান্তি কুশল মঙ্গল রূপে
আবার এসো হে সিঞ্চিত করি
গীত সুধারস অমৃতে।"

শ্রীঅর্চ্চনা মা'র রচিত ও শ্রীপ্রবীর মজুমদারের সুর দেওয়া এই গানটী শুনে অন্তরে ভাস্বর হয়ে উঠলো "শান্তি কুশল মঙ্গল রূপ" বিগ্রহ সত্যানন্দদেবের ভাবমূর্তি। মনে পড়ে যায় বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ আশীর্বাণী—তোমরা শান্তিতে থেকো কুশলে থেকো। তাই আমাদের তথা সারা বিশ্বের কল্যাণের জন্য তিনি কৃপা করে আবার আবির্ভূত হ'য়ে ধরার ধূলিকে ধন্য করুন, এই প্রার্থনা।

★

যুগের সারথি

যোগদাপুরী

ফাগুন রংয়ের উত্তরীয় হাওয়ায় ব্রতকুঞ্জের বুলবুলদের যায় ঘুম ভেঙ্গে। উদাস বনান্তেও জাগে যেন এক বসন্ত পঞ্চমীর সুর। শীতের অবগুণ্ঠন খুলে ঋতুরাজ কি জানিয়ে গেলো তাঁর ফাল্গুনে আসার শুভ জন্মদিনের আম লিপি, হঠাৎ জাগা আনন্দে শুধু ভেসে উঠলো সোনার তুলি দিয়ে আঁকা অতীতের সেই স্মৃতিগুলি। সুন্দরের চরণে অর্ঘ্য দিয়ে সুরু করি তাঁর জন্মতিথির বন্দনা।

যুগে যুগে ভগবান তমিস্রা ধরণীর বুকে সূর্য সারথির মত মানুষকে ডেকেছেন আলোর পথে। ভগবান পু যোত্তমের বংশীধ্বনির সুর, নদীয়ায় গৌর চাঁদের নাম প্রেমের জোয়ার, রামকৃষ্ণ অবতারে যেই রাম যেই কৃষ্ণ সেই আবা রামকৃষ্ণের মহাবাণী, দিলেন জগৎকে আবার আসার ইঙ্গিত,—আমি আসবো গোপনে বাউল বেশে আমার অন্তরঙ্গদে জন্যে।

তাই কি বাজলো এবার গানের বাঁশী, মর্তের ধুলিকে পুণ্য গৈরিক রঙ্গে রাঙ্গিয়ে সাধুর রাজা হয়ে এলেন ভগবা সত্যানন্দ। ঘরে ঘরে বেজে উঠলো জন্মতিথির শুভ শঙ্খ। বিশ্বের বুকে জ্বলে উঠলো শান্তির আলোক, যে গানে সারা জগৎ আমোদিত হয়ে সত্যানন্দ দেবতার চরণ বন্দনা করে ধন্য হয়ে ছিল নরনারী, সেই গানের সুর ও বাণী কি ডাকলো কয়েকটি আলোর পাখীকে।

মনে পড়ে সেই শৈশবের স্বপ্ন, ব্রতধামের মত ভগবান সত্যানন্দ সুন্দরকে ঘিরে বসেছে বহুভক্তের মিলন মেলা, আমাদের জন্মভূমি বাতিকার জমিদার বাড়ী হলেও বৈষ্ণবের বংশ বলেই কি ছিলো সেই করুণা, শ্রীঠাকুর যখন বাতিকারে কুঞ্জবনের মত আশ্রমটীতে প্রথম শ্রীচরণ দিলেন বাবা (সুধানন্দ মহারাজ) বলেন যুগে যুগে সেই নররূপী নারায়ণের কথা। বাতিকারের ধুলি ধূসরিত পথ বেয়ে যমুনা (বড় দীঘি) থেকে ফিরে এসে কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে বহুভক্তের মাঝে মধ্যমণি হয়ে বসলেন সত্যানন্দ সুন্দর উপরের ঘরটীতে। চারদিকে জড়িয়ে রয়েছে পদ্মফুলের সুরভি, নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছি ঠাকুরের দিকে, জ্যোতির্ময় সে রূপের মাঝে একেবারে সেই মহাপ্রভুর মত ষড়ভুজ দর্শন। কোথায় সেই সত্যানন্দ সুন্দরের বাউল বেশ। একেবারে মহাপ্রভুর রূপ। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলো। ধীরে ধীরে আবার দেখি আমাদের সেই ঠাকুর। অর্চ্চনামা আরতিমা এঁরা ফ্রক পরে। তারা নিতান্তই ছেলেমানুষ পাঁচ কি ছয়। আমি বলে উঠি হ্যাঁ সেদিনের সেই দিনগুলি একেবারে ব্রজধামের মতই ছিলো। যমুনার জলে নৌকার মত নাদ ভাসিয়ে গৈরিক গৃহী সন্তানদল ফুল মালায় সুসজ্জিত করে দেবতা নিয়ে করতেন কত আনন্দ তার মাঝে ভেসে আসতো "হরিকে গীত গাউঙ্গী মন বৃন্দাবন যাউঙ্গী"। সেদিনের সেই সবুজের আবছা স্মৃতি মনে পড়লেও খুব আনন্দ হয়। অর্চ্চনাদি সুমনাদি আরাধনাদি এদের দেখে যেন মনে হতো আলোর রাজ্যের মানুষ, আমাদের কত চেনা। কত ভক্তদল ভীড়ের মাঝে ছোটদের দলটির হাত ধরে ঠাকুর রঙ্গ করতেন, তখন কি ভেবেছি এই রাগরঞ্জনীয়ার সুরের খেয়ায় আমার সুর মিশবে ঐ চরণ প্রান্তে।

সেদিন অর্চ্চনাদির লেখা ঠাকুরের জন্ম উৎসবের কথা পড়ে খুব আনন্দ হলো, মনে পড়লো আমরা সেই নবীন ঠাকুর প্রবীণ ঠাকুরের উৎসব ছোটবেলায় শুনতাম, সমস্ত আশ্রমেও এই শুভ জন্মতিথি পালন করা হতো সমারোহের সঙ্গে। ফাগুন রংয়ের ডালা সাজিয়ে তখন থেকেই অর্চ্চনাদিরা সাক্ষাৎ দেবতার চরণ বন্দনা করেছে। বীরভূম কোলকাতার

ভক্তরাও ছুটে এসেছেন। এই বিশেষ পুণ্যক্ষণেই পরমানন্দ মহারাজ দর্শন করেছিলেন সত্যানন্দ ভগবানের মাঝে সেই বিরাট শিশুকৃষ্ণ ভগবানের রূপ। নবীন ঠাকুর অর্থাৎ ভগবান সত্যানন্দদেব, প্রবীণ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভগবান। যুগে যুগে সেই নররূপী নারায়ণের আসার বাণী যেন পঞ্চবটের পাতার বীণায় বেজে ওঠে।

অরুণরাগে রঞ্জিতের মত যোগী সুন্দর দেবতা ডাকলেন তাঁর ভক্ত সন্তানদের। জাগো অমৃত লগনের গান ও সুর যেন বিশ্বের হৃদয়ে জ্ঞানবর্ত্তিকার মত জ্বলে উঠলো। কোলকাতায় বরানগর আশ্রমে গড়ে উঠলো দেব দেউল, এল বাসন্তিকা বেলা, আমাদের ঠাকুরের জন্মউৎসব, চারিদিক আনন্দে মুখরিত। গান নৃত্যের মাঝে বহুভক্ত জ্ঞানীগুণী ও ভক্ত সমাগম। আমরা ছোটদের দল সিউড়ী বাতিকার থেকে এসেছি চন্দ্রাদুলাল অভিনয় করতে। মুকুন্দি মায়াদি বন্দনা মীরা আমি। আশ্রমে প্রবেশ করেই দেখি যেন স্বর্গীয় ছন্দের সুষমা। আকাশে বাতাসে বয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীদের কণ্ঠে শুভ জন্মতিথির আবাহনী গীত। "বাঁশী বাজলো বটের ছায়ে" এল কোন দ্বিতীয়ার চাঁদরে। ছড়ানো মুক্ত কণার মত ভক্তদের মাঝে শ্রীঠাকুর যে উপদেশ দিয়েছেন তারই কিছু কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে অর্চ্চনাদি আরতিদি শরণাদি সুমনাদি সেগুলি ছোট আকারে বই বার করলেন। অর্চ্চনাদি তার নাম দিলেন বেদছন্দা। বৈদিক যুগের মত ছোট ছোট কন্যাদেরও প্রাণে শ্রীঠাকুর জ্বালিয়ে দেন জ্ঞানের প্রদীপ। সেদিন সমস্ত ভক্তরা সেই বই পেয়ে ধন্য হলেন, আমরা ছোটদের দল সে সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হোলাম না।

আবার শীতের শেষে বটের পাতায় ফাগুন পাপিয়া গেয়ে উঠলো গান, দক্ষিণ হাওয়া শুভ শঙ্খে ছড়িয়ে দেয় ভগবান পুরুষোত্তমের মাঙ্গলিক উৎসব। আমি তখন সাধু জীবন নিয়ে বরানগর আশ্রমে বাস করছি, বার তের বয়স। যুগের ঠাকুর যুগ প্রয়োজনে জীবকে দেন শিক্ষা। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগ, তাই পূজা জপ ধ্যান তপস্যার মাঝে বিভিন্ন রকমের দেন শিক্ষা, লেখাপড়া গান বাজনা হাতের শিল্পকারুকার্য্য প্রভৃতি। ফুলের বাগানের মাঝে বেঞ্চি পেতে ক্লাস বসেছে। স্বামী উমানন্দ মহারাজ সুমনাদি শরণাদি শোভা মা প্রভৃতি। মায়েরা ভেতর দিকে ক্লাস নিচ্ছেন বাংলা ইংরাজী ছাড়া হিন্দি শিক্ষা, হাতের শিল্পকারুকার্য্য প্রভৃতি। তারই মাঝে ফাল্গুন উৎসবের গান নৃত্য অভিনয়ের শিক্ষা। পিসেমশায় নিয়ে আসেন সাতদিন এগারোদিন ধরে উৎসবের তালিকা। তারই মাঝে চলছে সেলাইয়ের শিল্প কারুকার্য্য। অর্চ্চনাদি করছে আবির রংয়ের কাপড়ের উপর কাঁচ বসিয়ে সেলাই, শরণাদি কচি কলাপাতার রংয়ের উপর ময়ূর। সুমনাদিও একটা সুন্দর আসন তৈরী করছেন। ইতিমধ্যে দেখি আরাধনাদি মহামায়াদি গীতাদি ঠাকুরের কাছে সুতার রং ও ডিজাইন পছন্দ করছেন। আমাকে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখে ঠাকুর আমাকেও বল্লেন তুই একটা নতুন ধরণের সেলাই কর। সবুজ সাটিনের উপর সোনালি জড়ি বা পুঁথি দিয়ে গীতা চণ্ডী উপনিষদ ভাগবৎ এই চারটী ভাগবৎ গ্রন্থের একটা করে বিশেষ শ্লোক নিয়ে আসনে সেলাই কর! এই কথা শুনে আমি তো খুব ভয় পেয়ে গেলাম, হাসিও পেলো কেননা তখন আমি সবে প্রথম সেলাই করছি। ঠাকুর সেই চারটি শ্লোক কাগজে লিখে দিলেন, শরণাদি আসনে ড্রইং করে দিলো। সুমনাদির কাছে পুঁথি বসানো শিখে নিলাম। আসনটী যখন তৈরী করা শেষ হল ভাবতেই পারিনি ঠাকুরের সকলের এত পছন্দ হবে। শিল্পীর রাজার কাছে গান কবিতা সেলাই বাজনা এগুলিরই ছিলো যেন বেশী আদর, আমাদেরও আনন্দে মন ভরে যেতো। তাই প্রতি বছর ফাগুয়া কুমকুমে রাঙা কৃষ্ণচূড়া শাখাগুলি যখন আনন্দে নেচে উঠতো, পীত রংয়ের উত্তরী গায়ে দিয়ে ফাল্গুনি চাঁদ ছড়িয়ে দিত তার শুভ জন্মদিনের আলোক ধারা, আমাদের তখন সেলাইয়ের আসর বসে যায়, বড়রা খুব উৎসাহ করে আমাদের বরাত দেওয়া জিনিষগুলি কোলকাতার বড় দোকান থেকে এনে দিতেন।

চূত মুকুলের সুরভির মাঝে বসন্ত পঞ্চমীর সুর গেয়ে ওঠে কোকিল পাপিয়া দল। দিক দিগন্তে বাংলার প্রান্তে প্রান্তে বেজে ওঠে সোনার বাউলির নূপুরধ্বনি। ঘরে ঘরে বসে মাঙ্গলিক আসর। দূর দেশ থেকেও আসে জন্মতিথির

উপচার, দিল্লী থেকে জ্যাঠামশায় পাঠিয়ে দেন ঠাকুরের জন্মদিনে শুভ আবাহনী গীতি। "তুমি এলে কে মম অঙ্গনে"। গানটী আড়ানা রাগিণী দিয়ে যেন সুর দেওয়া হয়, অর্চ্চনাদিকে লিখে পাঠান। একমাস ধরে আমরা ফাল্গুন উৎসবের গানগুলি গীটার এসরাজ বেহালা সেতার বাঁশী প্রভৃতি দিয়ে সেট করি। আকাশে বাতাসে বয়ে যায় দেবতার পূজার প্রীতির ছবি। বিভিন্ন রকম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের মাঝে দ্রুত এগিয়ে চলে সেলাই। হঠাৎ একটী বইয়ে ডিজাইন দেখে বড় ছুটি পাখী কাঁচের প্রজাপতি ফুল দিয়ে তৈরী করে শেষ করলো সুমনাদি আরতিদি। দিল্লী থেকে ভালোমা জ্যাঠামশায় এসে ঠাকুরের ছেলেমেয়েদের খুব আদর করতেন। জন্ম উৎসবেও হতো বহু জ্ঞানীগুণীদের সমাগম, তারা এই সময় শিক্ষা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। এমন কি ঠাকুরের বিভিন্ন রকমের লীলা চিত্রের ছবিগুলি তোলা হতো ক্যামেরায় ও মুভী ক্যামেরায়। প্রথম সুরু করেন সেজকা পরে ছোট বালক বালিকা দল পরে যারা বড় হয়ে আই এ, বি এ, বিটী, এম এ পাশ করে বড় হয়েছেন, হিরুদা অরুণদা মণ্টু ও আরাধনাদি।

আবার ফিরে এল ফাল্গুন। প্রবীণ ঠাকুর নবীন ঠাকুরের জন্ম উৎসব যেন রামকৃষ্ণ সত্যানন্দের যুগল মিলন একদিকে ঠাকুরকে ঘিরে বসেছেন সন্তান দল উৎসব সূচী নিমন্ত্রণ কার্ডের জন্যে। পিসেমশায় সেজকা ফটিকদা মাণিকজ্যাঠা বিবিদিষানন্দ মহারাজ উমানন্দ মহারাজ, সুরেশ্বরানন্দ মহারাজ, অমলানন্দ মহারাজ প্রভৃতি। এরই মাঝে আমাদের ঠাকুরের জন্ম উৎসবটী পূর্ণ চন্দ্রের মত আলোয় ঝলমল করে ওঠে। সারারাত্রি ধরে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান, ভক্ত সাধু দীননারায়ণ ভোজন। সুরেশ ভার নেয় ছোট ছোট ছেলেদের অভিনয়ের ভার। এরই মাঝে একদিন মানিকজ্যাঠা ঠাকুরের জন্মউৎসবে 'স্মৃতির তীর্থে আঠান্ন' বইখানি ঠাকুরের চরণে নিবেদন করলেন। বহু ভক্ত মাঝে সেদিন আনন্দের হৈ চৈ পড়লো।

সোনার মাধবের শ্রীচরণে ভক্ত ভ্রমরের আনন্দ নূপুর যেন বেজেই থাকে। ফাল্গুনের বাঁশী শুনে বনবীথি অ… বসে ফুলেদের আসর। এগিয়ে আসে ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব। রাতের পর রাত জেগে প্রতিযোগিতার মত চ… সেলাই পর্ব্ব। অর্চ্চনাদি পাহাড়ের ঝরণা, আরতিদি বাঁশীমালা, আমি করি বৃন্দাবনে যমুনা তীরে বাঁশী হাতে কৃষ্ণজী আরাধনাদি মানস সরোবর। মহামায়াদি কৃষ্ণচূড়া। গীতাদি সুমনাদি উলের আসন। সামান্য একটু বিশ্রাম ক… ভোরে উঠে কোকো খেয়ে রুবীদি ও সকলে বসি সেলাই করতে। যূথি অনামা চন্দ্রমল্লিকা ও ফুলের সাজি সেলা… করতে করতে বলে, 'যোগমায়াদি, প্রত্যেকবারের মত এবারেও আমাদের সেলাই কবিতা বলুন।' আমি হেসে ব… একবার রঙ্গ করে বলেছি বলে প্রত্যেকবারই বলতে হবে। সুষমাদি সতীমা শোভামা সেলাই করতে করতে বলেন, ব… আমরা শুনি। এমনি করে কেটে যায় বেলা। কোনবার আমাদের ঠাকুরের জন্ম উৎসবের (১১ই ফাল্গুন) আগেই সুরু হ… রামকৃষ্ণদেবের পূজা গীতি আনন্দের যজ্ঞ। পূজার পূজ্য দেবতা সুরু করেছেন মন্দিরের বিশেষ পূজা, মাইকে সানাই ভে… আসছে বসন্ত ধুন। সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তদের দল সুরু করেন ভজন কীর্ত্তন। আমরা করি গীতাচণ্ডী পাঠ। মধ্যাহ্ন ভোজনে… পর বিকেলের আয়োজন সুরু হয়। এর মাঝে ঠাকুর আমাকে বলেন রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে রচনা প্রতিযোগিতা হবে… কলেজ ছেলেমেয়েদের দিয়ে তুইও একটা লেখ। ওদিকে বিরাট হলঘরে ফুল মালায় আলোয় সুসজ্জিত করে ঠাকুর… ঘিরে বসে সাধু সুধীদের সম্মেলন আমরা দ্বাদশজন ঠাকুরের পিছনে বসে উপনিষদ পাঠ করি। সমবেত সঙ্গী… সুরু করলেন বিমলানন্দ মহারাজ অরুণানন্দ মহারাজ নীলানন্দ মহারাজ গদাই শ্যামল হীরেন প্রভৃতি। ওদিক থে… মাইকে ভেসে আসছে সাধু সুধীর উচ্চকণ্ঠবাণী, রবি মহারাজের সত্যানন্দ ভগবানের প্রতি রাখাল রাজার মত ভালবা… কথা। সাধু সুধী কণ্ঠেও আবার ভগবানের আসার কথার বাণী। স্বামী উমানন্দ মহারাজ অমলদা ফটিকদা … মহারাজ শচীন প্রভৃতি সাধুদের করলেন অভ্যর্থনা। এই জ্ঞানযজ্ঞের মহামিলন উৎসবে সারদেশ্বরী আশ্রম থেকে দু… এসে খুবই আনন্দ প্রকাশ করেছেন। বারবার ঠাকুরকে দেখে বলেন সেই রামকৃষ্ণ।

সুদূর গগনে আবার হেসে উঠলো যোগী সুন্দরের স্বর্ণকান্ত ছবি। ফাল্গুন বনের ফুলের আসরে বেজে উঠলো ভ্রমর বীণার সুর। ভগবান সত্যানন্দ দেবের মাঙ্গলিক উৎসব ভুবন জুড়ে বেজে উঠলো। আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো আশ্রম অঙ্গন দিক দিগন্ত। সেবার ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবটী আরও রস মধুর করে তুলতে চান ভক্ত সন্তানদল ও মানিকজ্যাঠা ফটিকদা অমলদা বিশেষভাবে। বীরভূম থেকে ভূপানন্দ মহারাজ সুরেশ্বরানন্দ মহারাজ অরুণানন্দ মহারাজ গৌরীদা শক্তি চৈতন্য প্রভৃতি নিয়ে আসে কবি বাউলের দল। চারিদিকে শুধু রূপসী আলোর ঢেউ তরঙ্গ। চম্পক কলি জোছনা রাতে আমরা করি দেবতার আরতি বন্দনাগীতি 'কৃষ্ণারাতে সোনার কিশোর উঠলো হাসি'। কাশীপুর বাটীতেও প্রতেক বারের মত আরও আনন্দের সমারোহ। শত শত ভক্তবৃন্দ কণ্ঠে গীতি "জয় সত্যানন্দ জ্ঞান গরীয়ান" "রূপশিখাঙ্গনে এসেছ জ্যোতির্ম্ময়" আকাশ বাতাস মুখরিত করে। তার মাঝে চলে ঠাকুরের গাড়ীখানি। কাশীপুর বাড়ীর ফুল আঙ্গিনায় সোনার বাউলিয়াকে ঘিরে সন্ন্যাসী গৃহী ভক্তের নৃত্য। আমরা উপর থেকে লাজপুষ্প বর্ষণ করি। গৌরীদি হাসিমা মালুদি মাধুরীদি প্রভৃতি ঘন ঘন শঙ্খ উলুধ্বনি করেন। ঠাকুরকে ঘিরে বালকদলের সঙ্গে সকলে গান করেন "এল কোন দ্বিতীয়ার চাঁদরে"। গান নৃত্য করতে করতে চলে স্যার সেবানন্দদা খোকনদা বিরেনকা প্রভৃতি। মনে পড়ে যায় প্রথম দিনের কথা। ভালোমা নমা সেজকাকীমা ছোটকাকীমা ও বহু মায়েরা জোড় হাতে দাঁড়িয়ে দেখেন, গৃহী ভক্তরা শুধু বলেন এযেন স্বর্গরাজ্য। রবি টুটু পশুপতিবাবু মুভি ক্যামেরায় ছবি তোলেন। ভক্ত ভোজনের পর সেই আনন্দ জোয়ার ফিরে আসে আশ্রম দেউলে। বহু ভক্তের মাঝে শ্রীঠাকুর বসলেন আসনে। জন্মতিথির জিনিষগুলি সাজানো। একদিকে নূতন রেকর্ড ও গান ভেসে আসছে। ভক্তদের সাধ পূরণ করবার জন্যে সমস্ত কিছুতে কৃপাদৃষ্টি মেলে বলতেন সব গোপালের। অর্পণামা অমলামা অর্পিতামা মালতীমা মাধুরীমা প্রভৃতি বহু রকম মিষ্টি সিঙ্গারা ও সত্যানন্দ নাড়ুগুলি ঠাকুরের সামনে এনে দিতেন ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হবে বলে। ছাপানো রুমালে অর্চ্চনাদির লেখা শুভ আমন্ত্রণীর গান। সেগুলি ভক্তদের দেওয়া হতো ও সকলে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ পেয়ে ধন্য হতেন। এমনি দিনে ঠাকুর যখন পরিশ্রান্ত হয়ে একটু গোপালজীর কাছে বসেছেন আমরা ছুটে এসে কেউ হাওয়া করেছি কি মাথায় ঠাণ্ডা লাগবে বলে টুপীটি ঠাকুরের হাতে দিয়েছি, ঠিক প্রয়োজনের সময় এসেছি বলে কত প্রসন্ন হয়ে মিষ্টি কথায় মনটী দিতেন ভরিয়ে—যে যস্য মিত্রম্ ন হি তস্য দূরম্।

সেদিন উৎসব অনুষ্ঠানের পর শিল্পী সুধীদের প্রসাদী নির্ম্মাল্য দিয়ে রাতের বেলায় আশ্রম অঙ্গনটীর চারিদিকে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। মন্দিরে এসে বিশ্রামের আসনে এসে বসে বল্লেন আমাদের কয়েকজনের সামনে খুব গম্ভীর হয়ে, তোরা এসব কি কাণ্ড করেছিস বলতো, ফুলের মেলার মত সেখানে যত রাজ্যের আলো দিয়েছো, সব খুলে ফেলতে বল। প্রথমে আমরা নীরব হয়ে শুনি তারপর মুখভার করে চোখের জলে সকলে বলে উঠি আমাদের ঠাকুরের জন্মউৎসব তো করবই, প্রাণ দিয়েও করবো। গীতাদি অর্চ্চনাদি আরতি সুমনাদি বলে আপনি যে অভেদানন্দ স্বামীজীর উৎসব করলেন কত সমারোহের সঙ্গে। তবে আমরাও আমাদের ঠাকুরের জন্ম উৎসব আরও সমারোহের সঙ্গে করবো। তাঁর ছেলে মেয়েদের অন্তরের আকুতিটী যেন ব্যথাহারী নারায়ণের বুকে বাজলো, দেবতা অন্তরে প্রসন্ন ছিলেন, ভক্তির পরীক্ষা-স্বরূপই কি ছিলো সেদিনের গম্ভীর রূপ ! একমুখ হেসে দেবতা যেনো অলক্ষ্যে বলেন বাজা বাজা আরও ঢাক বাজা।

আবার এল ফাল্গুন—মাঝে মাঝে ঝরা পাতার নূপুর ধ্বনি কি যেন একটা বেদনার সঙ্কেত বাণী ছড়িয়ে দেয়। বসন্ত যেন বিরহী, উৎসব অনুষ্ঠানের মাঝে একটা উদাস সুর। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা লাগার জন্যে ঠাকুরের মাথায় বেদনা ওঠে, ত্রিনয়নী দেউলে পূজা আরতির বেলায় সেবারেও দেবতা গান রচনা করলেন "মাণিক বনে খেলার ছলে আবার আসবে কি"। আমাদের মন আনন্দে নেচে উঠলো,—যেন যুগে যুগে ভগবানের সেই একই লীলা। তাই দেখি জন স্রোতের ঢেউ, বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী ইংরেজ প্রভৃতি। বিশ্বের মাঝে ভগবানের রূপ আবার প্রকাশিত হয়ে পড়লো, যে

রাম যে কৃষ্ণ সেই এবার রামকৃষ্ণের মত ভক্ত সম্মুখে যেদিন ঠাকুর বল্লেন আমি আর ত্রিনয়নী এক। নররূপী নারায়ণ কি হলেন পাষাণী প্রতিমা বিশ্বের কল্যাণী দেবতা। বসন্ত উৎসবের গান যেন এক আলোর রাজ্যে ডাক দিলো ওরে তোরা আয়। সোনার ফাগুন দিনে যেনো নেমে এল শ্রাবণ রজনীর ধারা। মর্ত্তের মাটী কেঁদে বলে জাগ্রত হও দেবতা।

ব্রতকুঞ্জের বুলবুলিরা ধূলায় পড়ে মৃত্যুকে আহ্বান করে সত্যানন্দ ভগবানের চরণে মিলিত হতে চায়। হৃদয় দেউল মাঝে শুধু সেই সুর বাজে, মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান। ভক্তদের বিরহী বেদনার মাঝে সেই তমসার তীরে আলোয় আলোময় হয়ে দাঁড়ালেন শান্তি কুশল রূপ নিয়ে সত্যানন্দ যুগ ভগবান। তাঁর প্রেরণায় মহান দীপ্ত শিখায় মর্ত্তের লীলাভূমি আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো। সুরধুনীর তীরে শ্রীমন্দির ধামে বহুভক্ত মিলে আবার প্রতিষ্ঠিত হল চোখের জলের পূজার বেদীকা ভগবান সত্যানন্দ বিগ্রহ। জগৎ জুড়ে ভক্তকণ্ঠে যেন সুরু হয় তাঁরই জয়গান। সুরু হল আবার জন্মতিথির উৎসবের আয়োজন। মহাপ্রভু কৃষ্ণ ভগবানের মত। ভক্ত প্রাণ যেন বলে আমরা তাঁর সুর, জীবন কথার অমৃত ধারা ছড়িয়ে দেব বিশ্বের ঘরে ঘরে। এগিয়ে এল প্লাটিনাম জন্ম জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহের সঙ্গে। মনে পড়লো সারদা মায়ের বিবেকানন্দ অভেদানন্দ ঠাকুরের প্রেরণা দেওয়া শতবার্ষিকী উৎসব। সেই পুরুষোত্তমের আনন্দ লীলার সুর মনে করে আমাদেরও জ্বালতে হল দহন ধূপে আনন্দের সুরভি। দেবতার দায় মাথায় নিয়ে মাণিকজ্যাঠা এসে জানালেন প্লাটিনাম জুবেলিতে ফাগুন মাসে ঠাকুরের সংখ্যায় কিছু লেখা। যুগের সারথির আনন্দ লীলাস্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে শুধু মনে হয়, মর্ত্তের এই ব্যবধানটুকু দাও মুছে, শুধু বাজুক স্বর্গের সেই চির শান্তির সুর, তোমার ঐ আকাশ দেউলে। যুগের সারথির চরণে এইটুকু শরণাগত প্রার্থনা।

●

ধ্যানের আবছায়া

আনন্দ

অন্তহীন দিশাহারা আলোকে
কোথায় তোমার দিশা—
পাব কি তোমায় আমি ভূলোকে....
ছায়াপথে চরণ রেখা নেহারি
সহসা জাগে মনে
আসিবে কি তুমি মনের বনে...
হে আমার গোলকবিহারী
শীতের ঝিরিঝিরি আকুল সন্ধ্যায়—
আসিবে কি খেলিতে প্রভু ?

সে কথা কি আছে মনে—
বলেছিলে দেহটা হারালে
তোদের সাথে যুক্ত হয়ে
থাকব আমি, খেলব তোদের সাথে।
কালের তরঙ্গে
অদেখার হাতছানিতে
ছিন্ন হয়ে যায়—মনবীণার তারগুলি।
তুমি আশার শ্যামছায়ায়
ভোলালে নানা মায়ায়।

★

সাধক সত্যানন্দের কাব্যপ্রতিভা

শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক

শ্রীরামকৃষ্ণ কবি—কথায়, উপমায়, বর্ণনায়, বিষয়ের সাদৃশ্য উদ্‌ঘাটনের চমৎকারিত্বে কবি। শ্রীসত্যানন্দদেব এবার সহস্র সহস্র কবিতা ও গানের স্রষ্টা হিসাবেও কবি—বাংলায়, হিন্দীতে, ব্রজবুলিতে, ওড়িয়ায় কয়েক সহস্র গানের তিনি রচয়িতা ; তিনি গীতিকাব্যে,লীলাকাব্যে প্রকৃতিকাব্যে, মন্ত্রকাব্যে, তত্ত্বকাব্যে, ও সাধনকাব্যে সার্থক ও সমর্থস্রষ্টা ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনায় তিনি সমান পারদর্শী তবু দুই মহাপুরুষের কবি প্রকৃতির একটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে—বস্তু ও ভাবের, সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মাঝে, সাদৃশ্য ও সমরূপতা লক্ষ্য করতে ও সাবলীল অভ্রান্ততায় প্রকাশ করতে দুজনেই সিদ্ধদৃষ্টি ও সিদ্ধবাক।

বস্তুর ও বিষয়ের, রূপের ও ভাবের সাদৃশ্য (resemblance) অনুসন্ধানে ও উদ্‌ঘাটনে কবিমনের ক্রিয়াশীলতা ও আনন্দ। বস্তু জগতের গঠনে একটি সৌসাদৃশ্য বা মিল বিশিষ্ট উপাদানের মতই যেন নিহিত আছে। সেটি আবিষ্কার করায় কবি হৃদয়ের কোন বস্তু ও ঘটনাকে ঘিরে একান্ত সুখোচ্ছ্বাস ঘটে আর তাই আনন্দের রসাত্মক ভাষায় ফুটে ওঠে। উপমা ও রূপক শুধু কাব্যের অলংকারই নয়, তাদের মধ্যে বাস্তবের সত্তা সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কবির অপূর্ব সংশ্লেষণ-শক্তির ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, যা শতবিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের মাঝে বস্তু জগতের সুসাম্য উদ্ভিন্ন করে ও শত-বৈষম্যের গ্রন্থিচ্ছেদন করে। এই সাদৃশ্য অনুসন্ধান শুধু বিভিন্ন বস্তুর গুণ বিশেষে ও রূপের অংশেই সীমাবদ্ধ নয়, কবির স্মৃতি ভাণ্ডারের অন্য অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, কবির বিদগ্ধ মনের উপর প্রকৃতির ও শিল্পকলার, কাব্যের, সাহিত্যের ও ব্যক্তি জীবনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিয়েও ব্যাপৃত ও বিস্তৃত হয়। Wallace Stevens তাঁর *The Necessary Angel* গ্রন্থে বললেন —The study of the activity of resemblance is an approach to the understanding of poetry. Poetry is a satisfying of the desire of resemblance অতুল গুপ্ত তাঁর 'কাব্য জিজ্ঞাসা'য় বলেন "কাব্যই উপমা, উপমাই কাব্য।" এই সাদৃশ্য সন্ধানে ভাব কিরূপে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে তা কুমুদরঞ্জনের 'ভক্তের ভয়' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তিতে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তের মনের আশঙ্কা ভাবতে গিয়ে কবির মনে পড়ে—

"প্রভাতের কমলের মাঝে হেরি ক্ষুদ্র কীটাণুর দল,
শিশুর কোমল মনে রাজে যেন ছোট দুশ্চিন্তা সকল।
উদাসীন সাধকের চোখে যেন ক্ষীণ সংসারের মায়া,
আরতির দীপের আলোকে শ্যামা পোকা ফেলে যেন
ছায়া।

এ যেন সাত্ত্বিক মহাদানে কামনার ক্ষুদ্র পিপীলিকা,
কমলার কমনীয় ভালে উলকির হিজিবিজি টিকা।
এ যে শুদ্ধ শুভ্র শতদল রত্নাকর ঋষি মহাকবি,
ভাসে নেত্রে যেন রে চঞ্চল দুষ্ট সঙ্গী দস্যুদের ছবি।"

কাব্য সাধনাও এক হিসাবে বহুর মধ্যে একেরই সন্ধানের একটি সাধনা। সাধন-জীবনের সঙ্গে কাব্য আরাধনার তাই বিরোধ নাই—বরঞ্চ বহু সাধক ও ভক্তের জীবনে যুগপৎ এদের রমণীয় অবস্থিতি লক্ষিত হয়। দেশে বিদেশে বহু কবি-সাধক ও সাধক-কবি সুপরিচিত। কাব্য প্রতিভা সঙ্গীতে ও সুর সংযোগে পরিপূরিত হয়। কবি সত্যানন্দ, সুরদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রেমিকের মত সুরসাধকও। স্বামী সত্যানন্দ জনৈক শিষ্যকে গানের শেষে একদিন বলেন, "খুব গাইবি। গান একটা মস্ত বড় সাধনার অঙ্গ—সাধনা করবি।" সুরযোগ কবিতায় লিখলেন—

"সুর সুন্দরের সাথে
সুর সাধকের যোগই
সুরযোগ।"

"বেদচ্ছন্দা" তাঁর সাধন কাব্য ও মন্ত্রকাব্য। "ব্যাকুলতার সাধন"-এ লিখলেন—

"একটি স্থান-কাল-পাত্রে সুরের লীলা একটি মাত্র।
স্থান কাল পাত্রে ভূমার প্রকাশ হলে
সুরও হয়ে যায় ভূমার স্বরূপ
এই ভূমার সুরই বিশ্বলীলার সুর
পুরুষোত্তমের বংশীধ্বনি।
চির পুরাতন অথচ চির নূতন
চির অচল অথচ চির চঞ্চল
চির আপন হয়েও চির গোপন
প্রাণপুরে বাজে—আবার বাজে বহুদূরে।"

কবির প্রাণেও এই ভূমার সুর আনে ব্যাকুলতা। অসীম ব্যাকুলতা। এও ব্যাকুলতার সাধন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়।" 'গীত কম্পন' সম্বন্ধে কবি-সাধক সত্যানন্দ বললেন, "যথার্থ গানে প্রাণের সূক্ষ্মতম কম্পন সৃষ্টি হয়····"।

যোগী অরবিন্দ যেমন কবি অরবিন্দকে আড়াল করে রাখে, ঠাকুর সত্যানন্দও তেমনি কবি সত্যানন্দকে আড়াল করে রেখেছে। সাধক সত্যানন্দের কবিমানস তাঁর মানস কন্যা শ্রীঅর্চনা মা 'মঞ্জীর' নামক ঠাকুরের প্রথম সঙ্গীত গ্রন্থের ভূমিকায় সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সাধন জীবনের সঙ্গেই ঠাকুরের কাব্য জীবনের সুরু হয় মনে হয়। প্রথমে যে দ্বিধা সংশয় ও বৈপরীত্ব চিন্তা তাঁকে আলোড়িত ক'রতো, জ্ঞান ভক্তি সাধনার পূর্ণ উন্মেষে তা অন্তর্হিত হয়। সাধকের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আকুতি ও অনুভূতি তখন অজস্র কবিতার ও সংগীতের অর্ঘ্য ও আরতিতে রূপ গ্রহণ করে। শ্রীঅর্চনা মা লিখছেন, "একবার তো বহু গান নিজেই ছিঁড়ে দিয়েছেন, শুনেছি তাঁরই মুখে; বেশ সহজ ভাবেই হেসে বলেছিলেন, 'কি করবো বল,—হঠাৎ একবার মনে বিচার এলো গান মানেই তো মিছে কথা লেখা। যে আকুলতার কথাটা গানে লিখছি সুন্দর ভাষা দিয়ে ফেনিয়ে বাড়িয়ে, ঠিক ততখানি আকুলতা কি সত্যই আমার মনে জাগছে? গানের লাইনে হয় তো লিখছি 'চোখের জল' কিন্তু তখন আসল চোখ দুটো হয়তো সাহারা মরুভূমি হয়ে আছে।' সে কথা শুনে বলেছি ক্ষুণ্ণ স্বরে—'কিন্তু চোখ দুটো না ভিজলেও মনটাতো নিশ্চয়ই কেঁদেছিলো? মনটা না কাঁদলে কি কান্নার ভাবাটা ফুটতো গানে?' বলতেন —'তা বটে—কিন্তু কি করি, এক এক সময় মনটা শু শুকিয়ে যেতো, তখন এ সব বিচারগুলো জেগে উঠতো। আর বিচার আসাও যা অমনি তা কাজে পরিণত হওয়া, সব গান গুলো ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। আর শুধু তাই না, এক সময় হয়তো গান লেখা বন্ধও করে দিয়েছিলাম— শেষে মা'র নির্দ্দেশে আবার সুরু করি।' সব কথার শেষে বেশ খানিকটা হেসে বলতেন—'পাগলামী! পাগলামী! পাগলামী ছাড়া আর কি? জানিস তো Poets and philosophers are all mad.'

এতটুকু দিব্যতার প্রকাশ—সত্য শিব সুন্দরের প্রকাশ দেখলে নিজেকে ভুলে ঠাকুর পাগলই তো হয়ে যেতেন। সে উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝেই হোক, আর চারটি দেয়ালের মাঝে ঢাকা দেবালয়ের কোনেই হোক—তাঁর লেখনী যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতো। অনেক সময় একটুকু দেরী সইতো না কাগজ কলম আনার—কাঠ কয়লা দিয়েও লেখা হ'তো সে মনের আকুলতা।"

ঠাকুরের নিজের প্রথমে সন্দেহ ছিল, বুঝি তত্ত্ব বিচারে কাব্যগীতি অবাস্তর ও অপ্রয়োজন হয়ে যায়। কিন্তু অন্তর দিয়ে যা অনুভব করতেন তাই একটা দৈবী প্রেরণায় ও আবেগে প্রকাশ করতেন—শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে পরম-স্রষ্টা ও স্রষ্টার যোগের অভিভবে ও আনন্দে। তত্ত্ব উপলব্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপলব্ধি কবির কণ্ঠ রুদ্ধ করে না—কবির মন শুকিয়ে দেয় না। কবি করুণানিধান প্রথমে গীতা প্রভৃতিতে নিবিষ্ট হয়ে বলেছিলেন, "গীতাটিতা পড়লে সব শুকিয়ে যায় রূপ রস্ গন্ধ স্পর্শের জগৎ সরে গিয়েছে আর কবিতা লিখতে পারি না।" সাধনা যেখানে জানা ছাপিয়ে পাওয়ায় পৌঁচেছে, সেখানে সব রসের উৎস এক অমৃত রস ও রসিক স্রষ্টার উপলব্ধিতে ও আনন্দ স্পর্শে, সৃষ্টির সব বৈচিত্র্য

খণ্ডতা রূপময় ও রসময় হয়ে ওঠে। নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় একটা নিরবচ্ছিন্ন অরূপের শুভ্র আলোক হয়ত সর্ব্বপরিব্যাপক হতে পারে, কিন্তু মনের যখন লয় অবস্থা নয়, যখন লীলারসে মন সরস ভাবমুখে, তখন সৃষ্টির মাঝে এক রসিকেরই অনন্ত লীলা চোখে পড়ে আর মন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ও অমৃত রসের উৎসে যুক্ত হয়ে নেচে ওঠে গানে, সুরে, কাব্যে, শিল্পে। 'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" তাঁর পরিচয়ে সব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এক আনন্দময় সত্তার সঙ্গে যোগে কবি-সাধক যুক্ত হন। রূপের আলোক ধারায় কবি তাঁরই পরিচয় পান, যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'ত্বমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং

তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।'

তাঁর দীপ্তিতেই সমুদয় বিবিধ রূপে প্রকাশ পায়। তাই একটি ক্ষুদ্র ফুল ফোটাও সমস্ত সৃষ্টি লীলার আনন্দ মণ্ডিত। এ যেন এক ব্যাপক বিভূতি দর্শন। রবীন্দ্রনাথ 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'-তে তাই লিখলেন—"সৃষ্টির মূলে এই নিরন্তর রূপের প্রকাশ। এই প্রকাশের অহেতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছায়....সৃষ্টির অন্তরতম এই অহেতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায়, তখনই বাদসাহী বেকারের মতো সে গান লিখতে বসে....সেখানে যুগ আর মুহূর্ত্ত একই, সেখানে সূর্য্য আর সূর্য্যমণি ফুলে অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝ সকালে মেঘে মেঘে যে রাগ রাগিণী, আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।" এই নিবিড় অনুভূতিতে ও সাধনা লব্ধ রস সিঞ্চিত হৃদয়ে নানা ভাবে কবি সত্যানন্দ মুখর হয়ে ওঠেন—

"সকলেই খোঁজে আপন সুরের সাথে
সেই সে পরম সুরের অমৃত যোগ
অসীম ছন্দলোক...."

বা

"পাখীর জলসা, ডালিয়া আর 'বগেন' ফুল
.......তারি মাঝে
হে সুন্দরের দেবতা তুমিও তো রয়েছ।
দুটিকে এক করে নাও—
অন্তরের এই প্রার্থনা।"

বা

"স্বর্গের চেয়েও সুন্দর এ পৃথিবী
এখানেই তো আমারা পাই সেই পুরুষোত্তমকে
....
তিনিই তো সবচেয়ে বড় কবি শিল্পী
তাই তো দূর নভোচারী মানুষ দেখেছে পৃথিবীর রূপ
মুক্তার মত টলটল করছে তার মাধুরী
....
তাই তো গীতা উপনিষদে বলছেন 'পরতত্ত্ব সঃ।"

বা

"দিনে দিনে পলে পলে জীবনের
কথাচিত্রের রিলটা ঘুরে যায়।
... .
এই কথাচিত্রের প্রযোজক
তোমায় প্রণাম জানাই বারবার
আর প্রণাম করি—
তোমার এই নিত্য চলে চলা লীলাভিনয়কে।"

কাব্য রস তাই ব্রহ্মস্বাদসহোদরা। সব রূপে সব গন্ধে সব স্পর্শে—একেরই পরিচয়। রূপ রস গন্ধ স্পর্শের জগৎ সাধনার পথে আর সরে যায় না, মন শুকিয়ে যায় না, সবই ব্রহ্মময় আনন্দময়। যেখানেই নেত্র পড়ে সেখানেই তাঁর সৌন্দর্য্যের, তাঁর প্রীতির, তাঁর মাধুর্য্যের, তাঁর রূপের স্ফুরণ। এই সাধন সিদ্ধ উপলব্ধি, এই দিব্য চেতনা জীবনকে ত্যাগ করে নয়, তাকে গ্রহণ করে, মহীয়ান করে, জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অনুষঙ্গে দৃশ্য জগতে তখন অমৃত-লোকের দ্যোতনা আনে, অদৃশ্য লোকের অনুভূতিকে তখন পরিচিত লোকের সুবর্ণ আলোকে রঞ্জিত করে। তখন কবি বলেন,—

'আজ ভোরে'
"এক ঝাঁক পাখিরা জেগে উঠেছে
... .
সদ্য জাগা শিশু
....

মনে পড়ে উপনিষদের শাশ্বত সেই বাণী
তদ এজতি—তন্নৈজতি—
তাঁর স্পন্দিত রূপে এই জীবন
আবার অস্পন্দেই তো মৃত্যু।"

তখন—"ডাকে অচিন সে সাথী"—

"উর্দ্ধে অধে পরিপূর্ণ শান্তির মঙ্গল ঘট ভরা
জীবনের পূর্ণ পাত্রখানি
কণ্ঠে আজ নিয়েছি যে টানি
আর কিছু নাহি চাই তার কিছু ধরা কি অধরা।"

তখন 'বড় ভাল লাগে'—

"কৈশোরের হিঙ্গুলিত দিনগুলি
মর্মরিয়া গেছে, শান্ত সে কুহেলী
রেখে গেছে পদচিন পূজার অঙ্গনে
বাঁশি আর হাসি যেন হৃদয় মন্থনে."

উচ্চশ্রেণীর কাব্য কবির আত্মার দৃষ্টিতে রচিত। গীতা ও উপনিষদ দার্শনিক চিন্তার ছন্দোবদ্ধ কাব্য নয়, তা আধ্যাত্মিক দৃষ্টির মন্ত্রময় কাব্যরূপ। সাধনার পথে এই দৃষ্টির উন্মেষ হয়। সে সময় রচিত কাব্য এই নূতন দিব্য দৃষ্টির ছন্দোময় প্রকাশ। তপস্যা এখানে রস সন্ধান ও রসিকের সন্ধান। শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন, "Poetic vision of life is not a critical or intellectual or philosophical view of it but a soul view. Mantra is not in its substance or form poetic enunciation of a philosophic truth but the rhythmic revelation of intuition arising out of soul's sight of God and nature and the world and inner truth of all that peoples it, its secrets and new life of being." "স্বামীজীর কবিপ্রতিভা" নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কবি দার্শনিক সত্যানন্দ বললেন, "কবি হচ্ছেন ক্রান্তদর্শী। দ্রষ্টা কবি ঋষিদের মন্ত্র বেদ উপনিষদে ধ্বনিত হয়েছে কবিতার ছন্দে। সত্য শিব সৌন্দর্যের মাধ্যমে নানা বিষয়ে গঠনের কাজই হচ্ছে কবির কাজ." সত্যেন্দ্রনাথে তিনি দেখেছিলেন গতি শক্তিযুক্ত লীলায়িত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথে দেখেছিলেন অনুভূতির রসঘন রূপ ও ভাবের প্রকাশ, স্বামী বিবেকানন্দের কাব্যে দেখেছিলেন প্রকৃতিকে মায়ার বিলাস রূপে। তাঁর কবিতা Absolute dramatic vision নিয়ে লেখা। সে কবিতা ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা অতিক্রম করে ছুটে যায় অসীমের পানে—সত্য শিব সুন্দরের পানে—হারিয়ে ফেলে ক্ষণিকের জন্য তার নিজের সত্তা।

স্বামী সত্যানন্দ বলছেন 'বেদচ্ছন্দা'য়—

"শিল্পী মনে তাঁর প্রকাশ বেশী।
তিনিই আদি ও আদর্শ শিল্পী—সত্য শিব সুন্দর
সৃষ্টিতে তাই সবাই শিল্পধর্মী....
তাই আদর্শ শিল্পী মন দিয়ে তাঁকে
যাবে পাওয়া আপন রূপে."

কাব্য প্রেরণায় এই যে অসীমের দিকে উড়ে যাওয়া—ব্যক্তি সত্তাকে বস্তু হতে ভাবে উত্তরণ করা, স্বামী সত্যানন্দের কবিতায় অতি সহজ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'শীতের গোধূলি' কবিতায় এই উধাও হওয়ার আহ্বান কবির হৃদয়ে।

"পাখিরা বাসায় ফিরছে দলে দলে
যাবার সময় দিয়ে যাচ্ছে পুরবীর শিষ।
খাঁচার বন্দী মনটাও চাইছে বাতায়ন খুলে
উধাও হয়ে যেতে
নীড়ের নীল আশ্রয়ে......
ঘরের জানলাতে একটা টিয়া
ছবিতে সেটা আঁকা।
গাছের টিয়া তবু তাকে দেখলে সে আকুল হয়ে
ডাকছে
আমি যেন আঁকা পাখী না হই।
হে 'পরমেব্যোমন' কালির আঁচড়ে তোমায়
ধরে রাখতে চাই না
তোমার ডাকে উধাও হারানোয় হারিয়ে
যাক এ মন।"

এই কাব্য প্রেরণায় সীমার বাঁধ সব ভেঙ্গে যায়। একটি সমগ্র রূপের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থিত হয়ে দৃষ্টির বা

দৃশ্যজগতের বা অনুভূতির সমস্ত খণ্ডতা ও ভেদ কবির ভূমা চেতনায় সমন্বয় ও সামঞ্জস্যে তাৎপর্য্য পূর্ণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বললেন -

"ঐ চাঁদ, ঐ তারা, ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হল, বিরাট হল, সম্পূর্ণ হল
আমার চেতনায়।"

এই চেতনা জীবন নিরপেক্ষ বিমূর্ত্তের চেতনা নয়। জীবনের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও জ্ঞানের রঙীন পাখায় এ অসীমের মানস সরোবরের পথে বলাকার মত উড়ে চলা। স্বর্গে মর্ত্তে চলে তখন গতায়তি, আদান প্রদান। চোখের জগৎ, জ্ঞানের জগৎ, ভাবের জগৎ তখন সবই এক সমন্বয়ী দর্শনে প্রাণময় ও মধুময়। কবি সত্যানন্দের কাব্য সাদৃশ্য অনুসন্ধানী চেতনা, জ্ঞানের ও অনুভূতির বিস্তারে অনেক সময় অপরিচিত উর্দ্ধে ওঠার আকস্মিকতায় অভিভূত করে। হঠাৎ পরিচিত ক্ষুদ্র মাটির সীমা হতে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায় অসীমের সূর্য্য তারার রাজ্য ভেদ করে। গতির বেগে ও আকস্মিকতায় প্রথমটা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন ভাবের স্তর ভেদ করতে গিয়ে, তার পর মন একটা স্নিগ্ধ উদার প্রশান্তিতে ভরে যায়। "সাঝের ছোট্ট একটি তারা" তিনি দেখান তখন 'নীল আকাশের মিষ্টি একটি হাসির টিপ'' যেন। "ভিজে ভিজে আকাশটা একটা তুলট কাগজে লেখা কবিতার মত", "মেঘ আর মন-দুই যেন সখীর মতন—মনের মত অজস্র তার আঁকিজুকি" আর "আকাশটা আজ মায়ের মত যেন চেয়ে আছে" মনে হয়। সব শব্দ মিলে একটা মহাসঙ্গীতের ঐকতান ধ্বনিত হয়।

"সমস্তটা মিশে একটা 'সোনাটিনা' হয় যেন
উদাসীয়া মন চেয়ে থাকে বাতায়নে
প্রতীতি বিহীন চিন্তায়।
মন্দিরশীর্ষে আলোর পাপড়ি খসে খসে পড়ে
রিমঝিম্ করে মাধব মধ্যাহ্ন।"

'ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাটলে তুলছে কচি কচি ডালগুলো', অমনি, 'নানকের একটা গান ভেসে আসে
নাম সুমরো নাম!'

কবির মনে বহু প্রশ্ন জাগে—

"সেই সূর্য চন্দ্র কি থাকবে ?
গ্যাগারিণের স্পুটনিকের রেখা
আর গত দিনের জীবন মরণ ?
এক নদীতে দুবার নাওয়া যায় না
বলে গেছে হেরাক্লিটাস তাও কি।
উপনিষদের কণ্ঠে দেবায় হবিষা বিধেম
তাই বা কি।"

শেষে কবিমন বলে—

"হে অচিন, হে অনাগত, হে অনাহত
তোমার অনন্ত ভিউরী
তোমার অনন্ত গতির এলান ভাইট্যাল
তোমার রেখায়িত কথায়...
অক্ষম চেষ্টায়
আজ জানাই নতি।"

বৈশাখে সামান্য ফাটলের কচি ডাল দুলতে দেখে মন দুলে উঠলো স্থির থেকে অস্থিরে—নানক, উপনিষদ হতে হেরাক্লিটাস ও বার্গসঁ। লেখেন "দুরান্তরের যাত্রী আমরা"।

"এই যে দুস্তর ব্যবধান
ক্যান্টের ন্যুমেনের রাজ্য—এর পারাপার খেয়া কি নাই
দুরান্তের যাত্রী আমরা—কিন্তু কাণ্ডারী কই
....
ভাঙ্গা তরীর কান্নাই সে কাঁদে—প্রমিথ্যাসের মত
শুধু কাঁদে।"

দেশ বিদেশের পুরাণ দর্শন বিজ্ঞান সবই কবির রন্ধন শালার সহজ উপাদান—জগত রমণীয়—ব্যঞ্জনাময়,— জীবনের স্বাদু আস্বাদ। 'সাগরোত্থিত মৈনাক ওগো' কবিতায় বিদেশের পৌরাণিক চরিত্রগুলির সমাবেশ চমৎকারিত্ব লাভ করেছে একটি নমস্কারে।

"সহজ পথের বিদ্রোহী তুমি
অগ্নিহোত্রী মন
প্রমিথিয়াসের দায়াদ তুমি যে
ভীরু জিহোবার যম
...."

কক্ষচ্যুত তারা চুম্বিত
তোমার পন্থ বাহি
টেলিমেকাসের গতি তুমি ওগো
নিত্য নিয়েছো চাহি।
পন্থবিহীন পান্থ তোমার
চরণ চিহ্ন লভি
আজি নত শিরে করুণার কণা
মাগিছে মর্ত্ত্য কবি।"

সাদৃশ্য অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গিতে ও ভাবানুষঙ্গে কবির কল্পনা ও অনুভূতি মণ্ডলায়িত হয়,ব্যক্তি অনুভূতির সাধারণীকরণ ঘটে। অভিনব গুপ্তের মতে সিদ্ধ রস-কাব্য বলতে বুঝায় সেই কাব্য যা কাব্যের রসসৃষ্টির উপায়কে অতিক্রম করে, পাঠকের মনে আস্বাদ মাত্রে পরিণত হয়েছে। কবি মন তখন কোন একটি সামান্য জিনিষের অসামান্যতা উপলব্ধি করে মর্ত্তকে বয়ে চলেন অমর্ত্ত্যের অমৃতলোকে। হয়ত প্রজাপতি, কি মাধবী, কি বৃষ্টিধোয়া ধানারোদ, কচি পল্লব কি নারকেল পাতা, শাপলা ফুল কি ছোট্ট একটা বুলবুলি, কুহু কি কুজ্ঝটি, ময়ূরী কি 'Moore'এর একটা কথা ধরে, কবি সব ছাড়িয়ে উড়ে চলেন আত্মার অন্তরতম গভীরে কি অনন্ত বিস্ময়ের রসময়ের রহস্য জগতে। 'দেউলের তলে' পশ্চিমাস্তশায়ী দেবতাকে দেখে মনে হয় 'আমার এই খিড়কী, পশ্চিমের খিড়কী তুমিই খোলো প্রভু'—কবিতায় কবির মনে পড়ে যায় কবীরের একটি পদ। এমনি করেই শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে যেত উপনিষদের মন্ত্র। শ্রীঅরবিন্দ কবির এই দৃষ্টি সম্বন্ধে বলছেন, "He may make this world his text or wander into regions beyond or soar straight into the pure empyrean of the infinite To arrive at the mantra he may start from the colour of a rose, or the power or beauty of a character, or the splendour of an action or go away from all these with his own secret soul."

শিল্পী মন সাধকের মন। কাব্য সাধনা তাই ব্রহ্মসাধনায় বা ধর্ম্মসাধনায় বাধা নয়। প্রথমদিকে শুষ্ক বিচারে ও অনাসক্তি সাধনে ব্যাকুলতার গান তপঃক্লেশের বিঘ্নঘটাতে পারে বলে ছিঁড়ে ফেললেও, ব্যাকুলতার সাধনে ব্রহ্মের রসস্বরূপের উপলব্ধিতে কাব্য গীতি বর্জ্জনীয় নয়। কাব্য-জীবন ও সাধনজীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সহস্র সহস্র গানের কুসুম অর্ঘ্য হয়ে ওঠে। কবি সত্যানন্দের কাব্য-গীতির মর্ম্মবাণী অখণ্ড হোমানুষ্ঠানের পূর্ণাহুতির একটি গানে ধ্বনিত হয়েছে—সেটি আত্মাহুতির গান—

"যত মোর গানের কথা, সে যে তোর মন্ত্র গাথা
পূজার পুষ্প হয়ে ঝরে মোর হাসা কাঁদায়।
আমার এই আঁখির দীপে, যতদিন নাহি নেভে
যেন তোর রূপের ঝলক বিজলী-চমক মিশায়।"

সাদৃশ্য বোধে সাধকের অভিন্নতাবোধ প্রচ্ছন্ন। ঋতুর পর ঋতুতে কবি সাধকের মনে হয় যে, প্রকৃতি আরাধ্যের আরতি করছে। "সাঝের তারকা আরতি প্রদীপ জেলেছ আকাশ ভরি", 'দেহের দেউলে'ও 'প্রেমপ্রদীপ দোলে চির আরতি মাঝে'। বর্ষায় :—

"বিজুরী ঝলকত আরতি আনন্দে
মেঘ মন্দিরা ঘণ-রণি-বন্দে।"

তাঁর গান লেখার ইতিহাস শ্রীঅর্চনা মা ও ঠাকুরের সন্ন্যাসিনী কন্যাদের আরও কয়েকজনে অতি চমৎকার বর্ণনা করেছেন। কোথায় একটু আলো, একটু মেঘ, একটা ঝড়, একটি পাখী অমা অন্ধকার, কি শ্রাবণ বর্ষণ—কেমন করে তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছে আর তা কথায় ও সুরের অজস্রতায় রূপ লাভ করেছে। সাধকের অন্তর্দৃষ্টির ইষ্ট-মূর্ত্তির আবির্ভাবে, নেত্রের বাহির জগৎ অনন্ত ব্যঞ্জনায় স্ফুরিত হতে পারে। দেবদেবীর বিগ্রহ ও লীলা শুধু সাধকেরই অনুভূতির কেন্দ্র স্থান নয়—এক একটি সমগ্র জাতির প্রাণ-স্পন্দনের ইতিহাস বহন করছে—আত্মার স্পর্শে—সমুজ্জ্বল ও সুরম্য। জ্ঞান ও ভক্তি এই সাদৃশ্য সংগঠনের পথে কবিকে প্রেরণা দেয়, ছন্দ মুখর করে তোলে। তাঁর রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, বুদ্ধলীলা, খৃষ্টলীলা, রামকৃষ্ণলীলা, গোপাললীলা সম্বন্ধে কথাকাব্য ছাড়াও বহু কবিতায় ইষ্টমূর্ত্তির কাব্যময় রূপও কবিতাকে দিব্য ঐশ্বর্য্য

মণ্ডিত করেছে। গোপালকে বলছেন, 'মুঠি ত নয় এক মুঠো যুঁই'। ঝুলার মেলায় 'প্রজাপতি রঙ্গে যত শিশুদের আসা'। বাদলে বিরহ ও মিলনের দুই সুরই বেজে ওঠে। 'মেঘের মত ঘনিয়ে এসো/এস আমার নয়ন ভরে'। আবার ব্যথার কাজরী গান—

'ব্যথার থমক তাই
ঝরিছে ঝুরু ঝুরু'।

মায়ের রূপ নানাভাবে ভাসে—'চমকে চপলা চোখে,
অলকে জলদ খেলে।'

'ভদ্দুরে—ভদস্তিকে' কবিতায় বললেন,

"বার বার মনে হয় বুঝি তুমি কবে কথা
কিছু বলিতে চাহিছ যেন।
... .
আরও ভাবি বুঝিলাম শেষে—তুমি যে অনন্ত প্রভু
অনন্ত ভাবময়, রূপময়, লীলাময়, আমার অন্তর মাঝে
বাহিরে শান্ত শুধু বিগ্রহ তোমার।'

রাখী পূর্ণিমার শ্রাবণ রাত্রে শ্রাবণের ধারার সঙ্গে ভগবানের মিলন মঙ্গল বেজে ওঠে। উচ্ছল জলমঞ্জীরে ঠাকুরের চরণের নূপুর ধ্বনি শুনতে পান।

তাই "আজ মধু ঝুলন রাতি"।

মেঘের বিদ্যুৎ বিলাসে মনে পড়ে আরাধ্যা বিশ্বজননীকে

"কাঁকন কেয়ুর খুলে নিয়ে
কে পরালো বিজলীবালা।"

মনিমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ত্রিনয়নীর করে ধরালেন বিজলী। আত্মার দর্শন, কাব্যের অনুভূতি, দেবীর হাতে রূপ নিল মন্দিরে।

তারকিত অন্ধকারে ভাসে মায়ের রূপ চোখে—

"মা তোর এলো চুলে কে জড়ালো
সাতশো তারার মালা।"

'প্রথম প্রকাশ' কবিতায় তাঁর এই মর্ত্য অমর্ত্যের অমৃত যোগ সাধনা ফুটে উঠেছে—

"উপরে গঙ্গা নীচে যে গঙ্গা
হয়ে গেছে একাকার
এমনি করিয়া তরণী আমার
পাইবে কি পারাবার?"

কবিতা প্রার্থনা হয়ে ওঠে—ভক্তিতে শ্রদ্ধার গান গেয়ে ওঠেন সাধক কবি—

"গহ্বরেষ্ঠ পুরুষ পুরাণ
তোমারে ধেয়ান করি
....
মণিগণে তুমি সূত্রময়
তোমারে নিয়ত স্মরি।"
বা
"এসো অঝোর ঝরণ শাওনে
এসো বিজুরী ঝলক বরণে।"

বোধন ও গৌরীমেয়ের সম্বন্ধে অসংখ্য কবিতায় এক ঘরেই দেবতা ও মানুষের দেখা পাওয়া যায়। ইংরাজী একটি কবিতায় পাই—

"Electrons play and they do indeed
But can they love with floral wreath
... .
Lend your ears and listful be
In this crowded city He plays in glee."

তত্ত্ব বা বিজ্ঞান প্রেমের ফুল তো ফোটাতে পারে না। চোখ কান খুলে রাখলে এই ভিড়ের সহরেই দেবতার আনন্দ লীলা চোখে পড়ে। সীমার আর অসীমের মিলনেই তো মন ঠিক ভরে ওঠে। লিখলেন—

"This shore and shore beyond
Each in bridal bond
You feel its right and why."

সাধনায় কাব্যের পুষ্টি, দর্শনে ফুটে ওঠে কাব্যের স্ফূর্তি। "Moore-এর একটি কথা" কবিতায় সাধনদৃষ্টি লব্ধ ও কাব্য অনুভূতিসিদ্ধ জগতের প্রকৃত রূপ ধরা পড়েছে—

"শরৎ কি শুধু টুকরো টুকরো রঙেরই বর্ণালী
... ...
টুকরো টুকরো ঘটনা দিয়ে জীবনের দাম ঠিক করা
যায় না।

—এর পাশে উইলিয়াম জেমসের—

"টুকরো টুকরো করেই দেখাটাকে বড় করা চলে না।"

সমন্বয়ী দর্শনে সাদৃশ্য সন্ধান সার্থক হয়ে উঠলো। 'নারিকেল পাতাটা টিয়ার মত নাচে'। 'গঙ্গার জলে আলো খেলা করছে ছোট ছেলের মত।'

দর্শন, তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে যে কবিতা লেখা যায় তা শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অভিযোগের উত্তর দিলেন—

"তুমি বলবে এ যে তত্ত্ব কথা
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য তাই কাব্য।"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর চিঠিতে ইংরাজ কবি কীটসের তত্ত্ব কথা বলতে সাহস হয় না উল্লেখ করে বললেন যে, কীটস্ তো এ কথা বলে নি যে কবি তত্ত্ব কথা বলবে না "I am justifying a poet's rights to think as well as to see and feel, his right to dare to philosophise." তত্ত্ব কথা বলা সাহসের কথা নয়, একটি সাধক-কবির স্বভাবের কথা। Wallace Stevens তাঁর *A Collect of philosophy* গ্রন্থে বলছেন যে, চিন্তার কবিতাই শ্রেষ্ঠ কবিতা, সৃষ্টির অসীমতার উপলব্ধি কাব্যের রূপান্তর ঘটায়। ভগবৎ চিন্তাই কাব্যের পরম ও চরম বিষয়। স্বামী সত্যানন্দ Good and Beauty সম্বন্ধে বলতে গিয়ে Santayanaর একটি উক্তির উল্লেখ করেন—"Moral good and beauty in language can go together. Peotry and religion are identical for some." ধর্ম্ম সাধনার ও কাব্য সাধনার ধারা কবি ঠাকুরের জীবনে যুক্তবেণী হয়েছে।

কবি সত্যানন্দের কাব্য রচনায় দেখা যায় যে, প্রকৃতি-কেই কলাবিদ্যা অনুকরণ করে না, প্রকৃতিও সঙ্গীত ও শিল্পকে অনুকরণ করে। Oscar Wilde বলতেন, Nature imitates Art. সাদৃশ্য অনুসন্ধানে বিদগ্ধ কবি মন সঙ্গীত ও শিল্পের জগতের সঙ্গে প্রকৃতির সুর ও রঙের একত্ব লক্ষ্য করেন। 'সে দিন অসময়ের মেঘ' দেখে লিখছেন—

"নারিকেল কুঞ্জে দেখতে পাচ্ছি না মুহু কম্পিত দেবদারু
আর পাচ্ছি না বক্ষশ্চক্রে জনকা তনয়া স্নান পুণ্য ..
গঙ্গহৃদি বঙ্গভূমি—
এই কোণে টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টিরা
গৌড় সারঙ্গ ধরেছে—
আকাশে তখন প্রাবৃট পন্থী ধ্রুপদের গুরু গুরু।
....
আকাশের ফাটলে নরম রঙ ছড়ানো।"

আবার

"নারিকেল কুঞ্জ সব সেতারের মত যেন বাজে।"

'প্রথম বর্ষায়' "ভিজে ভিজে নারকেলের পাতায়
যেন Lyre of the wind এর ছবি।"

শরৎকালে গেয়ে ওঠেন—

"শরৎ গাঙ্গে জাগল যখন মেঘ শাপলার দল
... .
কলার পাতায় একতারাতে বাউল নাচন।"

বনবীথি দেখে মনে পড়ে Corrot-এর ছবি—

"আজকের ভোরটা কেমন জান—?
যেন এক আঁজলা মিঠে ঠাণ্ডা জল—
....
ফুটে ওঠে একটা ছবি
Corrot এর আঁকা বনবীথি....
সারা জীবন জুড়িয়ে দেয়।"

আকাশে মেঘের খেলা দেখে মনে হয়—

'নীল আকাশের ইজেলে মেঘেরা স্কেচ করে যায়।'

আবার শ্রাবণের আকাশ দেখে বলেন—

'আকাশের চোখে জল কেন,—জানো
মল্লারে সে কাঁদে—'

'আসন্ন বৈশাখে'

"মনে হয় জগৎটা যদি হ'ত রেণল্ডসের আঁকা
একটি শিশু
যুঁই ফোটা চোখে চেয়ে আছে দূর দুরান্তরে
সর্ব্বাঙ্গে উপনিষদের শান্তম উপাসিতমের মন্ত্র
যা ভুলতে গিয়েও আমরা পারছি না ভুলতে।"

বৈশাখের গঙ্গার ওপরে একটু মেঘ নেমেছে, তার ওপর

য়ে আলো সাঁতরে আসছে দিশেহারা হয়ে,—দেখে লিখলেন—

"Impressionism-এর মস্ত বড় একটা ছবি—

....

মনে পড়ে যায় Corrot এর By no breeze

stirred ছবি খানা—

তার মূল কথা ছিল—First impression আমরা

যেন হারিয়ে না ফেলি।

....

এই যে গঙ্গার অস্ফুট রোমাঞ্চ

এই যে কোকিলের ডাকাডাকি

প্রথম বছরকে মধুর করে তোলে নাকি?"

'চৈতী হাওয়ার দুপুরে' লেখেন—

"দুপুরের ছবিটা যেন

ওয়াট্সের আঁকা চোখ বাঁধা আশা....

একমনে বাজিয়ে চলেছে করুণ একটা সুর।"

কথায় ও রঙে দু'রকমেই কাব্য রচনা সম্ভব। ইংরাজ কবি Blake কবিও ছিলেন আবার চিত্র শিল্পীও ছিলেন। চিত্রকলা ও কাব্যকলার আঙ্গিকে একটি জিনিষ সমানভাবে চোখে পড়ে, যাকে Composition গ্রন্থন বা গুম্ফন বলা হয়। কাব্যে এই আঙ্গিকে সাধারণ টুকরো কথা সাজানোর গুণে ভাব ও রস সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। টুকরো টুকরো কথার সমাবেশে ও সমন্বয়ে চিত্র রূপ ফুটে ওঠে। বস্তু বিন্যাসে সমন্বয়ী ভাব Composition-কে প্রাণবন্ত করে। অনুভূতি ও কল্পনা এ সৃজনশীলতার মূল শক্তি। কবি সত্যানন্দে এই কল্পনা শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সবচেয়ে বড় শক্তি বিশ্বাস ও ভক্তি।

কত মধুর শব্দ চয়ন করেছেন কবি—কুহুলিত, ক্রন্দসী, হাস্নুহানা নিশি জাগা গন্ধা, নামের নয়ানজুলি, জরাতুর শবরী শর্বরী, অমাস্পন্দিত, কুলস্কষা পদ্মা, আঁখ মিচৌলী খেলা, রূপ সহেলী আঁধার, কলকে ফুলের করঙ্কে ভিখারী ঠোঁটটা ডুবিয়ে নেবে। চোখে জল নাই বলে, চোখের জলের কথা কবিতায় লিখতে দ্বিধা হয়েছিল। গান রচলেন, 'মেঘলা গানে আজি, নয়নে জল কই।' কিন্তু মন তো কাঁদে, তাই—

"দূর থেকে ষ্টীমারের কগহর্ণ ভেসে আসে

মনে হয় 'গাঙ মোরে বুলায়'

'ঈভরা বাদর—শূন্য মন্দির মোর'

বলতেও ইচ্ছা করে না।

আবার I pass but never die

বলতেও ইচ্ছা করে না

না—শুধু দু ফোঁটা চোখে জল এলেই ভাল হ'ত।"

আকাশের চোখে জল—ঝড়ে রাতের কান্না শুনে মনে হয়,

"পাথর গলা দুটি ফোঁটা চোখের জল

চাপতে গিয়ে নিটোল মুক্তার মত

দুটি ফোঁটা সে কান্না।"

অকাল বর্ষণ, স্পর্শলোল—ভক্ত কবির মনে হয় 'তাকে বুকে ধরে কাঁদি।' অন্তরের কান্না শ্রাবণের কান্না হয়, ভগবানের জন্য আকুলতায়, ঠাকুরের চলে যাওয়ার বিরহে। সাধক হৃদয়ের কান্না পাথর ঘামা জলই—মুক্তার মত—হয়ত তাতে মানুষের চোখের জলের উষ্ণতা নাই। তবু বিরাটের এই অশ্রু—মানসিক চোখের জলও শিশিরের মতই স্নিগ্ধ পবিত্র অমৃতসিঞ্চন—বুদ্ধির কিরণ স্পর্শে ঝলমল—তপস্যার পূর্ণাহুতির শান্তি জল।

"তোর জগতে কেমন দশা

ফিরে দেখ মা মহামায়া।"

দুর্গত পৃথিবীর জন্য কান্নাভরা প্রার্থনা। ভক্ত সাধক কবি তাঁর জীবনে ও কাব্যে চরম মিলের সন্ধান পেলেন, নারিকেল বনের নেবুফুলী হাওয়ার স্নিগ্ধতায়—

"মিল পাওয়া যায় শুধু দুটি চরণের মাঝে।"

———

মরমী কবিদের কল্পনা সার্থক করতেই যে পরম কবিদের আসা।

'যুগে যুগে যার আসা'—শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

শ্রবণ-মঙ্গল

স্বামী উমানন্দ

যৎ কীর্তনং যৎ স্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্র শ্রবসে নমো নমঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ২।৪।১৫

পৃথিবীতে যত কিছু শোনবার বিষয় আছে তার মধ্যে ভাগবতী কথাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানুষ অনবরতঃ শত সহস্র অসার কথা শ্রবণ করে, অসার কথা ব'লে—অতর্কিতে মৃত্যুর কবলিত হয়। তাই ভগবান্ শুকদেব আসন্ন মৃত্যু-শাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিতকে শ্রীভগবানের গুণ কীর্তন করে রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—

যাঁর নাম কীর্তনে যাঁর স্মরণ দর্শন পূজা বন্দনা ও লীলা শ্রবণে মুহূর্ত মধ্যে সকল পাপ বিদূরিত হয়, যাঁর যশো-গাথা শ্রবণ করলে পরম মঙ্গল লাভ হয় তাঁকে বার-বার প্রণাম করি।

ভগবান শুকদেব শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব লীলা রহস্য—যে নানা মৃত জীবের কল্যাণের জন্য পরিবেশ করে গিয়েছে তাতে শত সহস্র মুমুক্ষু জীবনের পরম কল্যাণ হয়েছে—হচ্ছে—হবেও।

মূলতঃ ভাগবতী কথার স্বরূপ একটিই; তবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবেশে শ্রীভগবান তাকে ভিন্ন পরিচ্ছদে ভূষিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, কৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসত্যানন্দ প্রভৃতি অবতার প্রতিম পুরুষগণ জীব কল্যাণে জন্য নানাভাবে নানা কথায় নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করে গেছেন।

কি তপস্বী, কি দাতা, কি যশস্বী, কি মনস্বী, কি সদাচারী কেউই সেই পূত কীর্তি কথা শ্রবণ না করে মঙ্গ লাভ করতে পারে না। হে সত্যানন্দদেব, হে যুগ ভগবান, তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ কথা শ্রবণ কীর্তন, তাঁদের স্মরণ বন্দন সেবন—তাঁদের চরণে আত্ম নিবেদন প্রভৃতি ভক্তি সাধন দ্বারাই মানুষ দেহাত্ম বোধ হতে মুক্ত হয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে।

আজ প্রভুর জন্মদিন আগত; এই পুণ্য দিনে এই করুণাবতারকে স্মরণ করে মনের মোহ মায়া দূর করি আজ মনের পবিত্র বেদিকায় আমাদের প্রাণের আহ্বান জানাই। শুভদিন আগত তোমাদের মন পঙ্কে ফুটবে পদ্ম আর তার সৌরভে মনে প্রতিজ্ঞা জাগাবে—আমরা "ফুল সুন্দর হব।"

শ্রীকৃষ্ণ কংসের সঙ্গে যখন মল্ল যুদ্ধের জন্য মল্ল ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁকে দেখে উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর মনে যেমন বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়েছিল, কেউ তাঁকে দেখে ভাবছেন "হায়! এমন সুন্দর যুবকটী আজ এ দৈত্যের হাতে (কংসের) মারা যাবে;" কোন যুবতী কৃষ্ণকে দেখে ভাবছেন কোন্ হতভাগিনী আজ এমন মন মোহন স্বামী হারা হবে। বৃদ্ধারা ভাবছেন "কোন্ পাষাণী মা এমন সুন্দর ছেলেকে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ছেড়ে দিয়েছে।"

আবার যুবকেরা কৃষ্ণের বীর মূর্তি আজানুলম্বিত ভুজ নবদূর্ব্বাদলশ্যামতনু দেখে, মনে মনে হর্ষিত হয়ে ভাবে "আজ কংসের শেষ দিন, ওর জীবনের যা কিছু দেনা পাওনা এই যুবকের কাছেই মেটাতে হবে"।

শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন মনে যেমন ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার ঢেউ তুলে আধার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রসের পরিবেশন করে গিয়েছিলেন আমাদের শ্রীঠাকুরও বিভিন্ন মনে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

তিনি একাধারে অতীন্দ্রিয় পুরুষ আবার সাধারণ মানুষের কাছে অতি সাধারণ সহজ সরল শিশুতুল্য। তিনি দার্শনিক কবি নাট্যকার সাহিত্যিক সঙ্গীতকার শিল্পী ছিলেন, তাই ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞ আর শিল্পীরা এসেছেন তাঁর কাছে তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে।

তাঁরাও শ্রীঠাকুরের অমৃতময় বাণী শুনে নিজেদের ধন্য ও পরিতৃপ্ত বোধ করেছেন। শ্রীঠাকুরের মঙ্গলময় কথা শুনে কত পুত্রহারা পিতৃহীনা, স্বামীহীনা পেয়েছেন অন্তরে গভীর শান্তি।

আমরা নিজেই দেখেছি,—পিতৃশোককাতর-শিশু, স্বামীহীনা স্ত্রী, পুত্রহারা মাতা অসহ্য শোকে মুহ্যমান হয়ে এসেছে শ্রীঠাকুরের কাছে নিজেদের অন্তরের বেদনা জানাতে কিন্তু আশ্চর্য্য এই জীবন যাদুকরের (অল্প সময়ের মধ্যেই) মুখ নিঃসৃত বাণী তাঁদের এনে দিয়েছে প্রাণে গভীর প্রশান্তি; অন্তরের পাহাড় প্রমাণ দুঃখ যেন কোন্ মন্ত্র বলে সরে গিয়েছে। শ্রীঠাকুরের এমনই ছিল মোহ নাশকারী অমৃতবাণী।

তিনি প্রায়ই বলতেন "ফুল সুন্দর হও" আর নাম করে যাও।

যাঁরা ভাগ্যবান, "যীশুর মতে যাঁদের কান আছে" তাঁরাই এই ভাগবতী কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারবে।

'ফুল সুন্দর হও' বাক্যটি শুনতে খুব মিষ্ট কিন্তু কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলে তবে'ত প্রাণ আকুল হবে? 'শ্যাম' নাম ত' অনেকবার, অনেকেই শুনছেন কিন্তু শ্রীরাধা ছাড়া আর কার প্রাণ আকুল হয়েছে? শ্রীরাধার মন পুষ্পটি বিকশিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণেই স্থান পেয়েছে।

ফুল আপনার জন্য ফোটেনা; এই জগৎ উদ্যানে ফুটছে সে জগৎ স্রষ্টার চরণে নিবেদিত হবার জন্য। কিন্তু ফুলটি একদিনেই সৌন্দর্য্যবান হয়ে ফুটে ওঠে নাই, তার প্রস্ফুটিত হবার জন্য তাকে অনেক তপস্যা করতে হয়েছে; তবে সে স্রষ্টার চরণ পাবার যোগ্যতা লাভ করতে পেরেছে।

শ্রীঠাকুরের "ফুল সুন্দর হও" কথাটির তাৎপর্য্য হচ্ছে তোমার জীবনপদ্মটি যেন সুরভিত হয়ে দেবতার চরণ পাবার যোগ্যতা লাভ করে।

শ্রীঠাকুর প্রায়ই বলতেন 'নাম করে যাও তা হলেই হবে'। বেশ সহজ কথা শুনে শ্রোতা তখনই ঘাড় নেড়ে বলেছে হ্যাঁ ঠাকুর 'নাম জপ করিত' কিন্তু তখন কি কেউ বুঝেছে এই নাম জপ কথাটির গুরুত্ব কত?

যতটুকু শ্রীঠাকুরের মুখে শুনেছি সেটুকু ছাড়া এর গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা আমার নাই। শ্রীঠাকুর বলতেন—

"শাস্ত্র হচ্ছে ধর্ম্মের বাহক আর ধার্ম্মিক ধর্মের বাহক; আবার ধার্ম্মিকের কয়েকটী লক্ষণ আছে, যথা—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি। জগৎ স্রষ্টার দ্বি-অক্ষরী নাম। নাম ও নামী অভিন্ন।

আবার জাগতিক বন্ধন মুক্তি সকল জীবেরই কাম্য; এই বন্ধন মুক্তি হবে মুক্তি দাতার মর্জ্জি মাফিক। তবে এটাত বোঝা সহজ যো-সো করে যদি বড় কর্তাকে সন্তুষ্ট করতে পারা যায় তবে তাঁর খাস মহলের প্রজা হতে বেশী দেরী থাকে না। তাই মুক্তি পেতে হলে নামীর প্রসন্নতা উৎপাদন করা চাই। এই প্রসন্নতা অর্জ্জনের জন্য, আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে সর্ব্বদা তাঁর নাম উচ্চারণ, তাঁর নাম গুণগান, নামশ্রবণ আর তাঁর নাম জপ করা চাই। এই নাম জপেই হাজার বৎসরের অন্ধকারময় মন গৃহ পবিত্র ভগবানের নামের শক্তিতে হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠে হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি ভস্মীভূত করে।

ঈশ্বরের অনন্ত লীলা আর এই লীলা বা কর্ম্ম অনুযায়ী তাঁর অনন্ত নাম। অনন্ত নাম জপের দরকার নাই।

ভক্তের যে নামটী ভাল লাগে সেটী জপ করতে করতেই মনে প্রশান্তি আসে, শ্রদ্ধা আসে শ্রদ্ধা থেকেই জ্ঞান—এই জ্ঞান হচ্ছে মুক্তির সোপান। এই জ্ঞান হচ্ছে বিষয়ের দোষ দেখা আর নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করে সাধকের কায়মনোবাক্যে পবিত্র সমাহিত হয়ে নাম জপে মেতে উঠা; তখন সাধকের আত্ম নিবেদনের সাধনা পূর্ণ হতে চলে।

মহা প্রভু কেঁদে কেঁদে বলেছেন—"ওরে তোরা একবার হরি বল—একবার বল" এই একবার নাম করাতে জীবের দুঃখ জ্বালা যে শীতল হবে একথা তিনি জানতেন। সাধারণ লোক মোহ পাশে, সংস্কার পাশে বদ্ধ থাকায় নামে রুচি থাকে না; বল্‌লেই বলবে ওসব এখন নয় বুড়ো হলে তবে। শ্রীঠাকুর ঠাট্টা করে বলতেন বুড়ো হলে নানা রোগে ধরবে, তখন রোগ যন্ত্রণায় কাতর থাকবে না তাঁকে ডাকবে। মহাপ্রভু যেমন জীব কল্যাণের জন্য নাম সংকীর্তন করে পথে-পথে দেশে-দেশে বেড়িয়েছেন—যাতে সাধারণ লোকের কানে একবারও ঐ মহানাম যায়—গিয়ে মনে বাসা বাঁধে। আমাদের ঠাকুরও নানা ভাবে, নানা রকমে কলির তারক ব্রহ্ম "শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা নাম" করিয়েছেন, যাতে সাধারণের প্রাণে বাসা বাঁধে—সে জন্য করিয়েছেন থিয়েটার, নিজে গেয়ে গেয়ে (সঙ্গে ভক্তদের নিয়ে) বলিয়েছেন নাম—

'গদাধরের জয় বল
ত্রিনয়নীর জয় বল
রামকৃষ্ণের জয় বল'

'সারদে শিবে ত্রিনয়নী রক্ষ মাম্
সারদে শিবে ভবতারিণী শ্রীরামকৃষ্ণ পাহি মাম্।
"জয় দুর্গে জয় দুর্গে"

ইত্যাদি মহানাম, মহামন্ত্র কলির জীবের কষ্ট দুর করবার জন্য রেখে গিয়েছেন।

শুধু গোপালের জন্য

শ্রীসুধেন্দু মল্লিক

শুধু গোপালের জন্যে এতো তাড়াতাড়ি।
দমবন্ধ ছুটে যাই, হাওয়া বলে সামাল সামাল
কোন্ পথে গেলো আহা দুরন্ত দামাল।
কেউ কি দেখেছো যেতে
একা যেতে নিষেধ করোনি ?
কেউ আছো এমন নিষ্ঠুর, অমল শিশুর
দুটি পা ধুসর দেখে তবু তাকে ব্যাকুল ধরোনি ?
ধ্বনি হতে ধায় প্রতিধ্বনি।
বলো সে কোথায় গেলো, কেউ কি ভুলিয়ে নিলো তাকে
শুধু গোপালের জন্যে মাগো, আমি ডেকেছি তোমাকে।

এখানে ঝড়ের রাতে কদমের ফুলগুলি ঝরে
ঘ্রাণ তার ভেসে যায় ব্যথিত মন্থরে।
নদীর তরঙ্গ হানে তীব্র করাঘাত
মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে মৌন আকাঙ্খার কোটি কোটি হাত
চলেছে অন্ধের মতো; কতো দূরে পড়ে থাকে তোমার সংসার।
ডোবে সুখ, মন্ত্র মূর্তি ঘূর্ণিতে ডোবে সারাৎসার।
গোপাল কি দেখে এই সব।
অজ্ঞাত বাসের ক্লান্তি বিষাদ ব্যর্থতা পরাভব।
মা, আমি অনন্তকাল অপেক্ষায় একা খুব যাবো।
একটু পাবোনা ভয় দুঃখ কিংবা, আমার স্বভাবো।
এমনি হেলায় যাওয়া প্রতিবাদহীন—
যেন বা স্বপ্নের মতো আলোকিত তারাভরা উদাসীন রাতে
হাত রেখে প্রসারিত হাতে, পরম নিশ্চিন্ত যাবো
দীনতার মতোই নির্ভীক নিঃসন্দেহ যাবো গূঢ় বনে
যেখানে গোপাল, মাগো, স্তব্ধপদ এই পথিকের অন্বেষণে।

পুষ্পাঞ্জলি

শ্রীকৃষ্ণপ্রভা ভাদুড়ী

এ বিশ্ব ভবন খানি তোমারই নিজে হাতে গড়া,
একটী দিব্য ধাম।
অঞ্জলি লহ প্রভু এ পুষ্প মালঞ্চের
প্রাণভরা সহস্র প্রণাম।
কত না বর্ণাঢ্য শোভা প্রকৃতির তৃণ পত্রে
চিত্রার্পিত নয়নাভিরাম,
ছন্দে ছন্দে লীলায়িত গীতমাল্যে স্বতোস্ফূর্ত:
তব পুণ্য নাম।
চিদ্ ঐশ্বর্যে বিভূষিতা বসুন্ধরা এ তোমারই পূর্ণ-
মনস্কাম।
গৈরিক জাহ্নবী ধারা কলগুঞ্জ প্রার্থনায়
তোমা পায়ে জানায় প্রণাম!
হে দেব, হে রাজ অধিরাজ, হে দয়াল প্রভু,
প্রাণের ঠাকুর আর প্রেমের ঠাকুর,
দূরাতীত নও তুমি কভু।
তুমি আমাদের চির নিজস্ব জন
বহু তপস্যালব্ধ বাঞ্ছিত রতন।
হৃদি কন্দরে স্থিত তব রত্ন সিংহাসন।
মর্মর দেউল তলে ধ্যানমগ্ন তুমি মহাকাল,
চরণে ভূলুণ্ঠিত বৈরাগ্যের পূত নামাবলী।
প্রকৃতি রহস্যময়ী শ্রীচরণে অর্ঘ দেয়
প্রেম পুষ্পাঞ্জলি
অন্তরের সঙ্গোপনে ব্যাকুল প্রার্থনায়,
ডাকে ওগো রাজার দুলাল
খোলো আঁখি খোলো; লহ এই পূজা ধূপারতি;
লহ তুমি প্রাণের প্রণতি।
নিঃশব্দ মুহূর্তগুলি, শোনে সেই নাম গান
তুমি চিদানন্দ।
নমঃ নমঃ হরি সত্যানন্দ, হরি সত্যানন্দ, হরি সত্যানন্দ।
তুমি আছো আলো করে এ বিশ্ব সংসার।
আশীর্বাদ ঝরে পড়ে, অহৈতুকী কৃপায় তোমার।
জলে, স্থলে, পুষ্প ভারাণতা বৃক্ষে, লতায় পাতায়
সজল সন্ধ্যাকাশে জ্যোতিঃ স্নিগ্ধ তারায় তারায়।

সুধাকণ্ঠী দোয়েলের গীত ছন্দ রসে
তোমারই এ দেব নাম প্রার্থনায় জপ করে
প্রাণের উল্লাসে।
মধুপ গুঞ্জনে জাগে বিকচ মাধবী কুঞ্জে
তোমারই দিব্য আবির্ভাব।
তৃণে তৃণে চিত্রায়িত ঝরা শেফালীর ছন্দে
তব পদ চিহ্ন সমুদ্ভব।
পূর্বাশায় রক্তিম অরুণোদয় নানা বর্ণে
মেঘ ছন্দে করে তোমার আরতি;
তপঃসিদ্ধ গঙ্গাজলে অগ্নি শুদ্ধি মন্ত্র পাঠে
দেয় পূর্ণাহুতি।
নিরন্ধ্র নিশীথ রাত্রে সুমধুর সুরে শুনি
কার বংশীধ্বনি?
কে বাজায়, কে বাজায়? মধুর মুরলী কে বাজায়?
শান্তিময়ী নিশীথিনীকে সুরে সুরে কে কাঁদায়?
নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে ঘোরে,
বনে বনে কোন্ অরণ্যচারিণী?
সে কি ছায়া? সে কি মায়া? সে কি জীবনের
অদৃশ্য অলক্ষ্য রূপ?
তোমার তপস্যা করে সঙ্গোপনে সন্তর্পণে
অশ্রুজলে জালি চিত্ত ধূপ।
সে পূজায় শুদ্ধি কাঁদে অহর্নিশি
সিদ্ধির সীমন্তে;
শুদ্ধি তুমি, সিদ্ধি তুমি সাধকের
হৃদয় প্রত্যন্তে।
তুমি সেই অনাদি কালের সত্য ক্ষীরোদ মন্থন।
সৃষ্টি স্থিতি লয় তুমি নিত্য চিরন্তন।
তবু তুমি আমাদের শ্রীগোপাল কুঞ্জবনে রাজ অধীশ্বর।
ঋষি তুমি ক্রান্তদর্শী দেব মনোহর।
পুষ্পাঞ্জলি লহ প্রভু অশ্রুসিক্ত পূজা প্রার্থনায়,
কায় মনে আশীর্বাদ যাচি তব পায়।
শুভ জন্মদিনে লহ প্রাণের প্রণতি প্রেমানন্দ।
নমঃ নমঃ হরি সত্যানন্দ, হরি সত্যানন্দ, হরি
সত্যানন্দ।

চিরন্তন

সন্ন্যাসিনী শ্রীঅর্চ্চনা মা

আমরা মাটির মানুষ
কোন সুদূর যুগ থেকে
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে আমরা আহ্বান করি
কাকে ?
একটা অদেখা সত্যকে।
ওপারটা যে কোথায় তা তো জানি না
শুধু বুকের মাঝে একটা অনুভব
একটা মৃদু শিহরণ
যা দেখি না কিন্তু আছে
আমার আর অদেখার মাঝে
একটা নিসীম প্রান্তর
সেটা পার হওয়া যায় না
এই দেহের বোঝা টেনে
তাই ডাকি ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে।
মনে হয় ঐ তারায় ঘেরা দেশ
অনেক দূরের আকাশ
ওটাই হয়তো সেই অজানা ওপার।
বলি আমাদের মন পৃথিবীর লতায় বাঁধা
ওগো অদেখা তুমি এস
এক এক ফোঁটা অশ্রুভরা চাওয়া
জমে জমে পাথর হ'য়ে যায়
মনে হয় সেতুবন্ধ হ'ল এপারে আর ওপারে।
সে কি আসে ?
হ্যাঁ আসে
অনেকগুলো ঋতুর আড়াল ঠেলে
দিন রাত্রি আলো আঁধারের সিঁড়ি বেয়ে

ফুল পাতা পাখীর সাজানো
অনেকগুলো গানের শেষে
সে আসে।
সেই অজানার অদেখা দেখার সীমায় এসে দাঁড়ায়
আকাশ আলোর শাঁখ বাজায়
মাটির সবুজের মাঝখানে
একটা সোনার প্রতিধ্বনি নেমে আসে
একটা নরম পায়ের সাড়া।
আমরা মাটির মানুষ অবাক হ'য়ে যাই
চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি
ভাবি আর দেখি…
অদেখা কিন্তু অচেনা তো নয়।
নিটোল নীল চোখ দুটো যে অনেক যুগের চেনা
সে চোখের দৃষ্টির একটা ঝলকে
সব নেভা প্রদীপগুলো যে জ্বলে ওঠে!
ওযে হাসে আবার কাঁদে, ও দুটোই চেনা
আমাদের সুখ আর দুখের দোতারায়
দুটোই বাজে ভৈরবী আর পূরবীতে।
একটা শান্তি একটা স্বস্তি....
তাহলে অদেখার প্রথম দেখায়
নূতন পরিচয়ের দ্বিধা থাকবে না,
থাকবে একটা দ্বিধাহীন আনন্দ
আর দুবাহুর মালায় একটা স্পন্দিত আবেগ।
বলবো ওগো অদেখা তুমি তো ছিলে
আজো আছ পরেও থাকবে
অদেখায় যা বোধির সত্য
দেখায় তাই তো রূপময় আনন্দ
রূপ আর অরূপের মোহনায়
তুমি চিরন্তন সত্যানন্দ।*

---

* শ্রীসত্যানন্দদেবের ৭৫তম পুণ্য আবির্ভাব স্মরণে রচিত এই কবিতার শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক কৃত ইংরাজী অনুবাদ এই সংখ্যার ইংরেজী বিভাগে প্রকাশিত হ'ল।

লোকে লোকে

শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত

উত্তরা পথে—অজানা পথের পথিক আমি। এই উঁচু নিচু পথকে আমার বড় ভাল লাগে। এ পথে চলতে চলতে আমার অজানা জীবন-পথের কথাই মনে পড়ে বারে বারে। তবে জীবন পথ কোলাহল মুখর আর এই পথ নীরব শান্ত-ভাবগম্ভীর।

চলার পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য একটি শান্ত তপোবনে আশ্রয় পেয়েছি। হিমালয়ের কোলে এর অবস্থিতি। আনমনা হয়ে বসে আছি গিরিরাজের পাদদেশে। পশ্চিম দিগন্তে দিনমণির ক্লান্ত কিরণে গোধূলির রাঙ্গা ধূলিতে অঙ্গরাগ সমাপন করে—সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে এল ধরণীর বুকে।

পশ্চিমের দিক চক্রবালরেখা রক্তিমাভ। অস্তাচলের সূর্যদেবকে মনে মনে প্রণাম করে প্রশ্ন করলাম, "তুমি রোজ কোথা থেকে এসে প্রভাতে উদয় হও এবং পৃথিবীকে সারাদিন আলোতে স্নান করিয়ে আবার কোথায় কোন অজানা দেশে অস্ত যাও—বলো তো!" পরক্ষণেই মনে হল সূর্যদেব তো স্থির। অস্থির তারাই—যারা ঐ সূর্যকে প্রদক্ষিণ কোরে চলেছে অহরহ। এই প্রদক্ষিণের আবর্ত্তন চক্রে যাবতীয় যা কিছু পড়ে সবই অস্থির। সূর্যদেবের উদয়-অস্ত কিছুই নেই। উদয় অস্ত আছে শুধু আমাদের সকলের—যারা এই প্রদক্ষিণ—আবর্ত্তনের গতিতে বাঁধা আছি। এই ভাবনায় কত সময় যে আমারই অজ্ঞাতে কেটে গেছে জানি না।

অনুভবে বুঝলাম রাত্রি নিঝুম। ধরার বুকের কলকোলাহল যেন ক্লান্তির কোলে সমাহিত। স্তব্ধ পরিবেশ। নির্বিকার রাত্রি যেন ধ্যান মগ্ন। মনে হয় অষ্টাঙ্গ যোগের চরম অঙ্গ সমাধিতে পরমের সাথে মিলনের তুরীয়াতীত অবস্থা। আমার নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যেন আমার আপন কানেই প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে—শঙ্কা ভরে। যদি নিঃশ্বাসের শব্দ রাত্রির এই যোগ-সমাধিকে ভঙ্গ কোরে দেয়।

নভতলে অনন্ত অসীম আকাশের নীচে, সবুজ ঘাসের গালিচার উপরে দেহ এলিয়ে দিয়ে, একান্তভাবে একা একাই এই অখণ্ড নীরবতা উপলব্ধি ক'রে চলেছি। পরমের কথা কেমন কোরে যেন আমার অজ্ঞাতেই মনকে দোলা দিয়ে গেল। মনে ভেসে এ'ল এক মুক্ত পুরুষের বাণী।—"একমেবাদ্বিতীয়মের খোঁজে একা হও।" মনে হলো সত্যিই তাই। বুদ্ধির দ্বারা পরমের সাথে মিলিত হওয়ার নামই বোধহয় বুদ্ধিযোগ। আমি যে একান্তভাবে সর্বদা—সর্বাবস্থায় শুধুই একা—এই সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ কোরে, আপন থেকেও আপনকে একমাত্র সাথীরূপে পাওয়া অনেকটা সহজ সাধ্য। একা না হলে, একক—একান্ত সখাকে ধরা কষ্টকর। এক—অদ্বিতীয়কে পেতে হলে একাকী হতেই হবে। বহুত্বের মধ্যে—সকল ভাবের মধ্যেই যে সেই এক বা অখণ্ডেরই খেলা। তাই পরমের সাথে মিলনে আমাকেও এই বহুত্বের মধ্যে একত্বে সকলের মাঝে একান্তভাবে একাকী—এই মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। "বহুর মধ্যে একের সন্ধানে একা হও"—এই বাণী যেন ঘুরে ঘুরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আমার দেহের প্রতিটি রন্ধ্র পথে। আবার মনে হ'ল সত্যি সত্যিই আমি বড় একা। আমার বলতে তো সত্যিই কেউ নেই, কিছুই নেই। আমার একান্ত আপন বলে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারি এমন জন তো আমার সত্যিই কেউ নেই। জগতে "সত্যই" একমাত্র চিরস্থায়ী অজর—অমর—অক্ষয় এবং অব্যয়। আমার চারিদিকে যা কিছু আমার বলে দেখি, ভাবি বা মনে করি, তাদের ভিতরে কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। আজ বা

কাল তারা সকলেই তো মহাকালের গহ্বরে লীন হয়ে যাবে—আমারই সামনে বা পিছনে। থাকবে শুধু একমাত্র "তুমি" আমার একক সখা—আমার জন্মজন্মান্তরের অদ্বিতীয় সাথীরূপে—"সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্" রূপে।

মনে হল এই বুদ্ধিযোগের দ্বারা সর্বত্র পরমের লীলা দর্শনে অভ্যস্ত হলেই অন্তরে এবং বাইরে স্নিগ্ধ, শান্ত, নির্মল জ্যোতি হয় উদ্ভাসিত। মনে প্রাণে আনে সমভাবের জোয়ার। আনন্দের সাগর উথ্‌লে ওঠে এবং আপনাকে পরমানন্দময় বলে উপলব্ধি করা সহজ হয়। হয়তো এরই নাম সচ্চিদানন্দ লাভ।

নীল গগনের বাগান, অসংখ্য তারার ফুল সজ্জিত হয়ে যেন কার আবাহনে রত। পার্থিব যে কোন স্নিগ্ধ আলোকে লজ্জায় মুখ লুকোতে হয় ঐ অনাবিল আলোর বর্ণালী মেলায়। অনন্তকোটী তারার আলো—কিন্তু প্রতিটির আকার এবং আলোর তীব্রতা ও রং যেন অপরের থেকে ভিন্ন। বহুর মাঝে একটা উজ্জ্বল তারার দিকে শূন্য মনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মনে হল—সে যেন মিটিমিটি কোরে আমাকেই বিশেষভাবে নিরীক্ষণ কোরে চলেছে, তার ভাষাহীন নীরব ভাবের ভিতর দিয়ে। আমারই অজ্ঞাতে যেন সে আমার সমস্ত সত্তাকে বহন কোরে নিয়ে চলেছে ঐ অসীম অনন্ত তারার দেশে—মহাশূন্যে, মুক্ত গগনের সুপ্ত পথ বেয়ে বেয়ে, চলেছি তো চলেছি। অফুরন্ত—অসীম—অনন্ত আকাশ পথে। ঐ পুঞ্জে পুঞ্জে সুশোভিত অখণ্ড রহস্যাবৃত নক্ষত্র লোকে—তাদের স্পর্শ কোরে মানব জন্ম সার্থক কোরে তুলতে। আমি যেন ভেসে চলেছি এক অব্যক্ত আনন্দ শিহরণের দোলায় দোলা খেতে খেতে। হঠাৎ একটা প্রখর আলোর জ্যোতি যেন আমার মানসিক গতিকে রুদ্ধ কোরে দিল। সে যেন আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল আমার অনধিকার প্রবেশের কথা। বলে গেল—"এ পথ শুধু মাত্র যোগীদের জন্য। এ পথে তোমার প্রবেশ অধিকার নেই। ফিরে যাও।" বজ্রাহতের মত থমকে দাঁড়ালাম। আমার চমক ভাঙল—সম্বিৎ ফিরে এলো।

মনে পড়ল পরমাণু বিজ্ঞান এবং মহাকাশ গবেষণামূলক একখানা বিদেশী পত্র পত্রিকার কথা। এই পত্রিকায় একটা প্রবন্ধে ছিল—মহাকাশের সীমাহীন অবয়বের একটা হিসাব এবং পরমাণু বিদ্যার প্রথম পথ প্রদর্শক, আমাদেরই বৈদিক যুগের অনন্ত জ্ঞানী, ঋষি-বৈজ্ঞানিক, অক্ষর পুরুষ মহামুনি কণাদের কথা। প্রবন্ধকার এই প্রবন্ধে তাঁর অসীম এবং অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ভারতের বৈদিক যুগের মহাযোগী, মহাঋষিদের উদ্দেশ্যে,—যাঁরা তাঁদের প্রবল যোগ শক্তির সাহায্যে নিমেষে অনন্ত লোক থেকে লোকান্তরে বিদেহ-ভ্রমণে ছিলেন একান্ত ভাবেই পারদর্শী। তাঁদের গণনা ছিল অভ্রান্ত এবং বিস্ময়কর আবিষ্কারের মহিমার কাছে বর্ত্তমান যুগের যে কোন বৈজ্ঞানিক শ্রদ্ধায় মাথানত করতে হয় বাধ্য।

মহাকাশে যে অনন্তকোটী সূর্য এবং শত সহস্রকোটী গ্রহ তারা বিদ্যমান—এর বহু উল্লেখও আমাদের বেদেই মেলে সর্বপ্রথম। এরই উপরে ভিত্তি কোরে মহাকাশ গবেষণায়, মহাকাশের যে কল্পনাতীত বিশাল পরিধির নক্সা আজ বৈজ্ঞানিকের চোখে ধরা পড়েছে সেটা সাধারণের কাছে পরমবিস্ময়কর বলে মনে হলেও প্রতিষ্ঠিত সত্য।

আমরা জানি, সূর্যদেব তাঁর ৯টি সন্তান নিয়ে যে সংসার পেতেছেন তার নাম সূর্যের সংসার বা সৌরজগৎ। হিসাবে বলা হয়েছে যে মহাশূন্যে ঐরকম ৯ লক্ষ সূর্য নিয়ে এক একটি নীহারিকার সৃষ্টি। এই নীহারিকার সংখ্যা হলো ১ এর ডান পাশে ২১টী শূন্য বসালে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাই। তাহলে মহাশূন্যে সূর্যের মোটামুটি সংখ্যা হলো ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ × ৯০০০০০ এতগুলি। এর পরে আছে এদের অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহরূপী সন্তান সন্ততিরা। এই পরিমাণও নাকি শুধু আমাদের পজেটীভ্ (+) আর মহাকাশের পজেটিভ্ যতদূরে এক ততদূর পর্যন্ত মাত্র। আমাদের পজেটিভ্ মহাশূন্যে যেখান থেকে নেগেটিভ্ (−) হবে—তার সংখ্যা আজও বৈজ্ঞানিক অনুধাবনের বাইরে। এই মহাবিশ্বের বিশাল ও পরম বিস্ময়কর রূপের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবীর অস্তিত্ব বোধহয় একটী বালুকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

আরও মনে হলো ঐ যে অনন্তকোটি সূর্য নক্ষত্র গ্রহ এবং উপগ্রহ মহাশূন্যে ভেসে চলেছে, এরা প্রত্যেকেই তো

আপন আপন নির্ধারিত গতি পথে প্রবল গতিতে অনন্তকাল ধরে চক্রাকারে ধাবমান। এক পলকের তরেও তো বিশ্রামের কোন সুযোগ এদের নেই। এরা বুঝি থাম্‌তে জানে না। চলাই এদের ধর্ম, অস্থিরতাই এদের স্বভাব।

প্রশ্ন জাগে—ঐ যে অখণ্ড চলার গতি—এ গতির শক্তি এদের কে দিল। গতি পথ একান্তভাবে নিখুঁত রেখে—কোন্ অদৃশ্য শক্তি এদের চালিত কোরে চলেছে—নির্ধারিত পথে একই গতিতে অনন্তকাল ধরে? পরম বিস্ময়ের কোন্ অসীম শক্তির বিধানে এরা আছে বিধিবদ্ধ। কে পারে এই প্রশ্নের সত্যে-প্রতিষ্ঠিত উত্তর দিতে? মনে হয় এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র যোগী বৈজ্ঞানিকের দ্বারাই সম্ভব—তাঁর উপলব্ধ সত্যের ভিত্তিতে।

মহাশূন্যের ঐ অগণিত চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রকে আমরা এই পৃথিবীর মানুষ চন্দ্রলোক সূর্যলোক নক্ষত্রলোক বলে থাকি বা "লোকে লোকে" বলে জানি। আবার পৃথিবীর মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক পৃথক ভাবে বোঝাতেও আমরা "লোকে লোকে" বলেই বোঝাই। এবারে প্রশ্ন হল, যে নামে আমরা ঐ গ্রহ তারা নক্ষত্রকে বুঝাই সেই একই নাম কেন এসে প্রতিধ্বনিত হল ভূলোকের অধিবাসী মানুষকে বোঝাবার জন্য। এর কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যে, সাধন শাস্ত্রে একটা কথা আছে—"যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।" যার অর্থ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তার সব কিছুই মানব দেহেতে বিদ্যমান। এ কথা যদি সত্য হয় তবে প্রত্যেক মানুষকে যথার্থই মহাশূন্যের এক একটা লোকের সাথে তুলনা করা চলে। হয়ত এই ভাবধারা থেকেই অনন্তকোটী দেহধারী মানব সন্তান আজ ধরার বুকে—"লোকে—লোকে" নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত।

যে সন্ধ্যা সূর্য-বিরহ ব্যথায়, অস্তরাগের চন্দন মেখে এই শান্ত পরিবেশে তপস্যার আসনে বসেছিল, কালের চক্র পলে পলে এসে, সেই সন্ধ্যাকে উষার বেশে সাজিয়ে দিয়ে গেল। বুঝলাম যে উষা এবার শিশুতপনের সপ্ত রংয়ের মালায় মিশে যাবার জন্য ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের অপেক্ষা-রত।

তাই আমার শেষ জিজ্ঞাসা সদ্য তপস্যার আসন ত্যাগ কোরে ওঠা উষার কাছে.—"ঐ দূরে অসীম অনন্ত গগনে, নীহারিকার বুকে অনন্তকোটি লোক নিজ নিজ নির্ধারিত পথে যে পরম শক্তির নিয়ন্ত্রণে ধাবমান—সেই একই অমোঘ অখণ্ড শক্তিই কি ধরার বুকের অনন্তকোটি লোককে অলক্ষ্যে চালিত কোরে চলেছে এই জন্ম-জীবন মৃত্যুর খেলার ভিতর দিয়ে—চক্রাকারে অবিরাম গতিতে॥"

★

কাব্য—সেকাল ও একাল

স্বামী মহানন্দ

প্রাচীনকালের সাহিত্য ও কাব্য আর বর্তমান কালের, এই দুয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা পার্থক্য থেকে যায়। রসজ্ঞ পাঠক এই পার্থক্যটা অনুভব করতে পারেন অবশ্যই। স্বদেশ থেকে বিদেশে এসে পড়লে যেমন আবহাওয়ার পার্থক্য অনুভূত হয় এও অনেকটা সেই রকম।

কালিদাসের 'শকুন্তলা' আর গ্যেটের 'ফাউষ্ট' দুইই উচ্চশ্রেণীর কাব্য কিন্তু দুইটিতে একই রস বোধ হয় অনুভূত হয় না। কালিদাসের মেঘদুত ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য মানসসুন্দরী—দুটি কিন্তু কাব্য জগতে আলাদা স্বতন্ত্রবিশিষ্ট প্রতিবেশী।

কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে একটা কথা মনে থেকে যায় সেটা হচ্ছে পূর্ণতা আর পূর্ণতার অভাব। প্রাচীন কালের সাহিত্যে পূর্ণতা—বর্তমান যুগের সাহিত্যে সেটারই অভাব যেন থেকে যায়। বর্তমান কালে কবিরা জগতের মানদণ্ড হিসেবে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করেছেন। বলা যেতে পারে জগৎকে মাপবার জন্য সুতো হিসেবে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগিয়েছেন। এখানেই প্রাচীনকালের কবি ও বর্তমান কালের কবির পার্থক্য। প্রাচীনকালের কবিদের জগৎ-পরিধি মাপবার সূতো ছিল দৈব আর বর্তমানে কবিদের হাতে আছে আপন ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব যত বড়ই হোক জগৎকে মাপতে সেটা যথেষ্ট নয়। সুতো নিশ্চয়ই কম পড়বে আর সুতো যতো কম পড়বে অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব যত কম হবে ঠিক সেই পরিমাণে জগতের অংশ বিশেষ কবির অজানা থেকে যাবে। অপূর্ণতার সংজ্ঞা এটাই।

খণ্ড জীবনকে নিয়েও কবিতা লেখা যেতে পারে কিন্তু তার মধ্যেও পূর্ণতার আভাস পাওয়া দরকার। "জল যদি স্থির হয় তবে নিশ্চয়ই তার মধ্যে প্রতিবিম্ব পড়বে." আবার ঠাকুরের কথায় বলতে পারি "একসের ঘটীতে কি পাঁচসের দুধ ধরবে, অথবা পিঁপড়ে একদানা চিনি মুখে নিয়ে ভাবছে, কাল গোটা পাহাড়টাই সে নিয়ে যাবে।" অর্থাৎ পূর্ণতার রূপ কবির অপরিচিত থাকলে সে কবি পূর্ণতার আভাস দেবেন কি ভাবে? এই অসামর্থ্যকেই অপূর্ণতা বলা চলে।

এমন কবি আছেন, যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ মনে না করে দৈবশক্তি রূপ সুতো হাতে নিয়ে জগৎপরিধি পরিমাপ করতে চান। দৈব ব্যক্তিত্বের চেয়ে অনেক প্রশস্ততর, সে কারণে জগৎ-পরিধি পরিমাপ তাঁর কাছে অনেক নিখুঁত। কাব্যের পূর্ণতার এটাই সবচেয়ে বড়ো কারণ। কারণ কবির হৃদয় হ্রদ শান্ত, সেখানে সাময়িক তরঙ্গের চাঞ্চল্য সূর্য্য প্রতিবিম্বকে অস্পষ্ট করে না। সে কারণে দেখা যায় প্রাচীনকালের কবির কাব্যের নায়ক দেবতা আর বর্তমান কালের কাব্যে নায়ক মানুষ।

এই দুই কালের মধ্যে প্রভেদও আছে। জগৎও অনেক জটিল হয়েছে, ফলতঃ জগৎপরিধি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়েছে। হোমার যে জগৎকে জানতেন, গ্যেটের জগৎ তার চেয়ে বৃহত্তর ও জটিলতর। দান্তে যে জগৎকে জানতেন, রবীন্দ্রনাথের জগৎ তার চেয়ে জটিলতর। ফলে মাপবার সুতোও কম পড়বে মনে হয়। কবি ব্যক্তিত্ব যদি সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে ক্রমাগত কমতির দিকটাই নজরে পড়বে। জটিলতা বাড়ছে, অথচ হাতে আর সুতো নেই ফলে অপূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। শিল্পের আদর্শ সম্বন্ধে মত অনেকটা পাল্টে গেছে। প্রাচীন কবিরা লক্ষ্য রাখতেন—পূর্ণতা কিভাবে সৃষ্টি করা যায়। আর একদল কবি আছেন তাঁদের শিল্পের লক্ষ্য হল সৌন্দর্য সৃষ্টি। যাঁরা পূর্ণরূপ সৃষ্টি করতে চান তাঁদের কাব্য স্বভাবতই সুন্দর হয়ে ওঠে। কারণ পূর্ণতা=সত্য=সুন্দর। আর যাঁরা পূর্ণতাকে অগ্রাহ্য করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চান তাঁদেরটা কতখানি সুন্দর হয় ইতিহাস তা বিচার করবেন। সাময়িক হাততালির বিচার ও সীমিত মন-সম্পন্ন পাঠকের বিচার বোধ হয় শেষ 'রায়' নয়। কবি রামকৃষ্ণের ভাষায় কথাটা বোধ হয় বোঝান যাবে—"বাবুকে জানতে পারলে, বাবুর সঙ্গে পরিচয় হলে—বাগানের কোথায় কি আছে সবই জানা যাবে। আর নইলে আংশিক জেনেই তৃপ্ত হতে হবে।" একদল আছেন, যাঁরা সাহিত্যে 'রিয়ালিজম' তত্ত্বে বিশ্বাসী। এঁরা যুগজর age of fever এর উপর জোর দেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার আপন অতিপ্রত্যক্ষতার ফলে যা 'রিয়াল' তা একমাত্র যে 'রিয়ালিটি'—নাও হতে পারে। আবার ঠাকুরের কথাতে বলছি—"সবাই নিজের চশমাতে জগৎকে দেখছে। কেউ কালো, কেউ নীল, কেউ লাল। ন্যাবা হলে হলদে ত' দেখবেই।" অবশ্য এ কথা এঁরা হয়ত মানেন না। World is seff projected. রবীন্দ্রনাথের মতে বলা চলে, নালাও সত্য আবার বাগানও সত্য। তাই বলে সারাজীবন নালার নোংরার গুণাগুণের হিসাব করে বাগানকে একেবারে উপেক্ষা করা কি ঠিক?

আর এক পর্যায়ে একদল আছেন যাঁরা, পূর্ণতাকে তত্ত্বতঃ ও কার্যতঃ অস্বীকার করেন। কেবল অতিপ্রত্যক্ষকে মূলধন করেই এঁরা মানচিত্র অঙ্কন করতে চেষ্টা করেন। মানচিত্র বলা ঠিক হবে না কারণ মানচিত্রও সমগ্রের ধারনা

আনে। এঁরা আমিন—সামনে যা দেখেন তারই জরীপ করে চলেছেন। বিক্ষিপ্তভাবে জরীপ হচ্ছে কারণ সমগ্রতার আদর্শের অভাব। অপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সুতো ছাড়া আর কোন সুতো তাঁদের হাতে নেই।

কবি ব্লেক বিশ্বাস করতেন পার্থিব বস্তুর মুখোশ পরে যে সত্য বিরাজমান দিব্য দর্শন একদিন তার মুখোশ খুলে দেবে। Wordsworth মনে করতেন কবির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ—যা তাঁকে বিধাতার সমগোত্র করে, তা হলো imagination শেলির মতে এই অদৃশ্য জগৎ পূর্ণ, দৃশ্যমান জগৎ তারই অপূর্ণ প্রতিচ্ছবি। কবির কাজ খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের আবিষ্কার ও প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের মতে, এক যখন লীলাময় হয়, যখন সে সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ পেতে চায় তখন সে নিজেকে সুপরিস্ফুট করতে চায়। তখন বিষয়কে উপলক্ষ্য করে, উপাদানকে আশ্রয় ক'রে সেই অখণ্ড এক ব্যক্ত হয়ে ওঠে।

এই পরম প্রকাশময়তাকে যে কবি-মন আপন অনুভূতির মাঝে অনুস্যূত করে নিতে পারে তিনিই প্রকৃত ক্রান্তদর্শী—খণ্ডের রাজ্যে থেকেও তিনি অখণ্ডের কবি, সেই পরম অখণ্ড সত্তায় একীভূত। ঠাকুর সত্যানন্দদেবের কাব্য জগৎ সেই খণ্ড ও অখণ্ডের মিলন ক্ষেত্র। তাঁর কবিতায় কখনও দেখি এই জীবনের প্রতিটী খণ্ড চিত্রের ভাঙাচোরার মাঝে পরম একের আবির্ভাব। এবড়ো খেবড়ো মাঠের মাঝে ছুটে যাওয়া একটা রেলের বাঁশীও সে কবিতায় আনছে ছন্দময় ধ্বনি—ফোয়ারার জল ঝরার ছন্দের সাথে তার বিরোধ ঘটছে না। আবার কখনও এই মাটির তৃষ্ণার মাঝে কপোতের মত উর্দ্ধমুখে চেয়ে সে চেয়েছে অসীমের আস্বাদ। আধুনিক কবিতার বাস্তবতাও যে সত্য শিব সুন্দরের অধিষ্ঠান হতে পারে, ঠাকুর সত্যানন্দের কাব্যে তারি আদর্শ মূর্ত্ত। তাই তাঁর কবিতা এ যুগের কাব্য সন্ধানীদের দিশারী নবযুগের পথিকৃৎ।

আবার দেখি প্রাচীন ও নবীনের মাঝে এক নতুন সেতু রচনা করেছেন আধুনিক যুগের আর এক কবি সাধিকা শ্রীঅর্চ্চনাপুরী। তাঁর মাধুর্য্য মণ্ডিত আধুনিকতম ভাষায় দিব্য প্রেম-পুষ্ট হৃদয়াবেগের সুক্ষ্ম-ব্যঞ্জনা মনকে নিয়ে যায় ভাব রাজ্যের এক সুউচ্চ স্তরে। মনে হয় এ যেন স্বপ্নের ভাষা। বিশ্ব প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যের মাঝে পরম কারুণিক জীবন দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করায় তাঁর কবিতায় এসে পড়েছে এক অপূর্ব্ব আত্মনিবেদনের ভাব। ঐশী প্রেরণার সঙ্গে এই প্রেম মণ্ডিত সমর্পণ তাঁর কাব্যকে মহীয়ান করে তুলেছে। সন্ধ্যায় ফোটা একটি রক্ত করবীর সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ মনকে খুবই ছুঁয়ে যায়—

"নিঃসঙ্গ মনের কথা যেন ঐ সন্ধ্যার করবী
ফুল নয় এক মুঠো রেঙে ওঠা ব্যথার পূরবী।"

একটি দুপুরও কবির লেখনী স্পর্শে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে সমর্পণের মাধুর্যে—

…"এই যা দেখছি সব তো একটা সম্পূর্ণ কবিতার টুকরো
একে মেলাতে হবে।
কিন্তু মেলাতে গিয়ে দেখি অনাদি কবির চোখে ঘুম নেই
নিদ্রাহীন চোখে তিনিই মেলাচ্ছেন সব অছন্দকে
একটি নিটোল ছন্দে।
তবে আর কি! এ লেখনী তাঁরি হাতে তুলে দিই না।"

লেখনী তাঁর হাতে তুলে দিয়ে যে লেখা—সে লেখাতেই ঘটে পরম অখণ্ড সত্ত্বার আবির্ভাব, খণ্ড-অখণ্ডের মিলন মাধুর্য্যমণ্ডিত সে কাব্যই ধন্য সৃষ্টি।

—•—

ভাববার সময় এসেছে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বামী অরুণানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব দর্শন করেছিলেন—"দেখলাম সেখানে রাম, কৃষ্ণ সব থলো থলো ফলে রয়েছে"। এর গূঢ় রহস্য তিনিই বলতে পারেন যিনি তাঁর ভাব ধারণা করতে সক্ষম। সাধারণভাবে আমরা বুঝি অবতার অসংখ্য হতে পারেন—এর কোনও সীমা করা চলে না। মর্ত্ত্যের মাটিতে নেমে আসা সমপূর্ণ তাঁর কৃপা—কোনও কার্য্য-কারণ তত্ত্ব এখানে খাটে না। যখনই প্রয়োজন বুঝবেন তখনই আসবেন। ঈশ্বর বালক স্বভাব, তাঁর কৃপা ধারা কখন নামবে কিছুই বলা যায় না।

দর্শন বিজ্ঞানের Law of Highest Indeterminacy ও Law of Irrelevancy তত্ত্বের সঙ্গে কিছু মিল পওয়া যায়। তিনি ধারণা না করালে কারও সাধ্য নাই। তাই ধরা দেবার জন্যই আসেন। মায়া শক্তিতে জগৎ সৃষ্টি করলেন—প্রতিটি বস্তুর মধ্যে রইলেন—আবার সর্ব্বব্যাপী হয়েও রয়েছেন—

স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্টাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে॥ ভাগবৎ॥

তিনি আসেন সন্তান হয়ে—পিতা-মাতা-সখা-বন্ধু হয়ে—জগদ্‌গুরু হয়ে—মহাচার্য্য হয়ে।

সাক্ষান্নারায়ণো দেব সর্বভূতেশ্বরঃ প্রভুঃ।
আচার্যরূপমাস্থায় কৃপয়া পাতি সংশ্রিতাম্॥ গীতা।

একমাত্র সৎসঙ্গে সাধুসঙ্গে তাঁকে দেখার দৃষ্টি খুলে যায়—বোধি লাভ হয়—তাঁতে ভালবাসা জন্মায়। তবেই এ অবতার তত্ত্ব বুঝবার জানবার ইচ্ছা হবে—তবেই ভাবনা আসবে, কোনও অহংকার, দম্ভের এরাজ্যে প্রবেশ নিষেধ।

জড়বুদ্ধির বাহাদুরী নিয়ে এ মাপতে যাওয়া নিতান্ত মূর্খের কাজ। কবীরজী বলেছেন—

"বিনু সৎসঙ্গ বিবেক ন হোই।
রামকৃপা বিনু সুলভ ন সোই॥"

চাই বিবেক—চাই কৃপা। "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরনে নৌকা"—শঙ্করাচার্য্য

বর্ত্তমান যুগে—'নারদীয় ভক্তির' বিধান দিলেন যুগাবতার। সে পথেই চলতে হবে তবেই আসবে সামগ্রিক কল্যাণ জীব-জগতের। না চললে আসবে সামগ্রিক ধ্বংস। তাই সমাজের মঙ্গল-কল্যাণ চাইলে—ভাবতে হবে বৈকি।

দেখা যায়—পূর্ণাবতার যখনই আসেন—তার কিছুদিন পরে রূপ পাল্টে আবার এসে পূর্ব্ব অবতারের লীলা মাধুর্য্য আস্বাদন করেন—মহিমা প্রচার করেন—জীবকে বুঝিয়ে যান—কিছু কাজ বাকী থাকলে শেষ করে যান। না হলে যেন পরিপূর্ণতা আসে না—মাধুর্য্য ও মহিমার প্রকাশ হয় না, তাই আসতেই হয়—বার বার। মহাপ্রভু না এলে—শ্রীকৃষ্ণ লীলার এমন পরিপূর্ণতার প্রকাশ হত কি? না। "ওরে অন্যান্যবার রাজার নায়েব গোমস্তা আসে এবারে খোদ"—কথামৃত। একথা কে ধারণা করবে? যা বলে গেলেন—ভাবুন একবার গভীর ভাবে—

"জানি কিনা আর একবার আসতে হবে"
"বায়ুকোণে আসতে হবে"

বললেন—"বীরভূমের বামুন মুঙ্গ"—কেন বললেন এ কথা? এর ভেতর কি কোনও ইঙ্গিত নেই। নিশ্চয়ই আছে—বৃথা কথা তাঁরা বলেন না।

আমরা কি ভাবতে পারি না—শ্রীকৃষ্ণের পর যেমন এসেছিলেন শ্রীরাধাভাবদ্যুতি বিগ্রহ শ্রীমহাপ্রভু প্রেম বিলোতে—তেমনি কেউ কি এসেছিলেন—শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ ভাব বিগ্রহ হয়ে? কি তাঁর রূপ—কি তাঁর ভাব—কি তাঁর জীবন? কি দিয়ে গেলেন—মাটীর মানুষকে—সারা দুনিয়াকে? হিমালয়ের গুহা কন্দরে কাটিয়ে গেলেন না—এই সমাজের বুকে থেকে—নিপীড়িত আর্ত্ত-তাপিত তৃষিত মানুষের আপনজন হয়ে তাদের দুঃখ ব্যথা বুকে বহন করে তিল তিল করে নিজেকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন।

আমরা কি জানতে পারি না—যে শুধু মানুষ নয়—পশু পক্ষী, জীব-জন্তু বৃক্ষ লতা গুল্ম, সৃষ্ট প্রত্যেক প্রাণময় সত্ত্বা এবং জড়ের মধ্যেও এক চৈতন্য সত্ত্বাকে প্রত্যক্ষ করতেন—পরম প্রেমময় সত্ত্বাকে দর্শন করে বিশ্বপ্রেমে আপন হারা হতেন।

ব্রহ্ম—পরমাত্মা—ভগবান—সব একাকার।

সাধন কালের একটী অবস্থা প্রসঙ্গে বলছেন তিনি—

"এক সময়, ধ্যানে বা অর্দ্ধজাগরিত অবস্থা বলতে পারা যায়, দেখি কি যেন এই দেহটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে, আর ঐ দেহের মধ্যে যে শক্তি (আত্মিক শক্তি) রয়েছে—সেই kinetic শক্তি যেন ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে, ক্রমশঃ সেটা Ethereal যে কম্পন সর্ব্বব্যাপী হয়ে রয়েছে তাতে মিশে গেল—এটা অনুভূতির বিষয়—উপলব্ধির বিষয়। বোঝাতে পারব না" —স্মৃতির তীর্থে, ৪র্থ খণ্ড।

The soul has reached the highest degree of sanctity when She sees God only—in all things and has no interests but His interest. (E. Underhill. Man and the Supernatural, P. 245)

এতো বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার বা Emotion-কে ঝাঁঝাবার জিনিষ নয়—কিংবা ন্যায়, যুক্তি, তর্কেরও সিদ্ধান্ত নয়, এমন কি দর্শন শাস্ত্রেরও মীমাংসার বিষয় বস্তু নয়—এ সর্ব্বোত্তম বিজ্ঞান—এ প্রত্যক্ষ জীবন দিয়ে—হৃদয় দিয়ে—বোধি দিয়ে। পরম সত্যকে নিজের অন্তরে ও নিখিল জগতে উপলব্ধি।

চোখে যা দেখেছি—কানে যা শুনেছি—তাই লিখছি—দিল্লীতে গান্ধীজী প্রার্থনা সভায় যাচ্ছেন হঠাৎ গুলি ছুটে এসে বিদ্ধ করল বুক, 'হা রাম' বলে বুক চেপে পড়ে গেলেন ………ঠিক সেই সময়—কলকাতায় আপন নিভৃত মন্দিরে কোন্ সে বিশ্বপ্রেমিক—বুকে অসহ্য ব্যথা অনুভব করে হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে বললেন—"বুকে খুব যন্ত্রণা—কি হল—কি হল-বলে যন্ত্রণায় অধীর হলেন।

যে অখণ্ড চৈতন্য ওতপ্রোতভাবে সকল সৃষ্ট চরাচরে ব্যাপ্ত তাঁর সঙ্গে একীভূত না হলে—বিশ্ব প্রেমে দ্রবীভূত না হলে কি এরকম হয়?

আধুনিক শিক্ষা—প্রগতি—বিজ্ঞানের সর্ব্বাধুনিক প্রয়োগতত্ত্ব বা আপেক্ষিকবাদ অথবা মহাকাশ বিজ্ঞানের দ্বারা এ বোঝান যায় কি?

এই ভাবতে গেলেই সব অহংকার বিসর্জ্জন দিয়ে শরণাগত হয়ে তাঁর নিরন্তর স্মরণ মনন করতে হবে।

ভাবুন তো……সর্ব্বত্যাগী মহাসাধক—নির্বিকল্পে প্রতিষ্ঠিত দুশ্চর তপস্যামগ্ন হয়েও অবহেলিত মানুষের জন্য যাঁর প্রাণ উদ্বেল হয়ে ওঠে তিনি কে?

দরজার বাইরে ফেলে দেওয়া এক সদ্যোজাত শিশু—সেই পরম তপোমূর্ত্তি যাচ্ছেন বালতি নিয়ে বাইরের কল থেকে জল নিতে……হঠাৎ চোখে পড়ল ঐ নিদারুণ দৃশ্য। ঋষির ধ্যান তন্ময়তা গেল ভেঙ্গে……গভীর মমতায় একান্ত করুণায়……ছেলেটিকে নিজের সাধনপীঠে এনে প্রয়োজনীয় বিছানার ব্যবস্থা করলেন।

দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে তুললেন তাকে। একদিন নয় দুদিন নয় দিনের পর দিন চলল তার শুশ্রূষা।

"দয়া নয়—দয়া নয় শিবজ্ঞানে জীবসেবা"—যে শিক্ষা পেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তারই "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়", নয় কি? এই পরম প্রেমিকের সারা দিনের সামান্য আহার—একটু দুধ, জলে সেদ্ধ বেগুন আর চারটী চীনেবাদাম। বসেছেন নিবেদন করে প্রসাদ

গ্রহণ করতে……হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে থমকে গেলেন……মুখে হাত আর উঠছে না……অধীর আগ্রহে কি শুনছেন যেন, সকলে সন্ত্রস্ত……কার আকুল ডাক বাজল তাঁর বুকে……উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে……স্তম্ভিত হয়ে শুনলো—যারা ছিল……"বেড়ালটা অমন করুণ স্বরে ডাকছে কেন"? খোঁজ নাও তো"। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল অনেকেই—…জানা গেল বেড়ালটীর বাচ্চাদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে কেউ বস্তা ভরে তাদের একজায়গায় ফেলে এসেছে।

পর মুহূর্ত্তে শুনলো সকলে বজ্রাহত হয়ে……"যতক্ষণ না ওর বাচ্চাদের বেড়ালটির কাছে এনে দেওয়া হবে ততক্ষণ আমি খাব না। তাঁর আরক্তিম নয়নে তখন প্রেম করুণার জাহ্নবী ধারা।

স্তব্ধ-বিস্ময়ে হতবাক্ সবাই……চিন্তা কথার সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো চারিধারে সেবকের দল…প্রায় একঘণ্টা পর ফিরে এল বেড়াল বাচ্চাদের নিয়ে……দেওয়া হল তাদের মায়ের কাছে……। নবীন বাউলের মুখে তখন কি অপরূপ ভাগবতী হাসি—…বললেন—"আমার আশ্রয়ে—ওরাও তো আছে……ওদের ব্যথাও আমার বুকে লাগে"। মনে পড়ে যায় শ্রীশ্রীসারদা মার একটি কথা ……মা বলছেন……"আমি মা—সকলের মা—জগতের মা"। ভক্ত প্রশ্ন করলেন…"আপনি কি পশু, পক্ষী, জীব-জন্তুদেরও মা? মা বলছেন—"হ্যাঁ আমি ওদের মায়ের ভেতর দিয়ে ওদেরও মা"

সারদা সরস্বতীর কি অনুপম বাণী। অসীম প্রেমে একীভূত সত্ত্বা……সেই একই সুর……"ওদের ব্যথাও আমার বুকে লাগে"।

ভগবান ছাড়া যে কিছু নাই—শ্রীঠাকুরের কথা—তিনিই সব হয়েছেন, এ দেখাবার জন্যেই তিনি আসেন। ভালবাসার কাঙ্গাল বলেই প্রেমের আগুনে জলবার জন্যেই অবতরণ করেন। বলছেন ঐ দেবতা—"ভক্তই আমার সব—ভক্তই আমার কাছে সব চেয়ে বড়"—স্মৃতির তীর্থে। ভক্ত—ভগবান ভগবান—ভক্ত এপিঠ আর ওপিঠ" কি আশ্বাস—কি করুণা।

ক্রীশ্চান মিষ্টিক John of Ruysbrocek বলেন —"The flame of the love of God consumes all. And in this love we shall burn without end through eternity—for herein lies the blessedness of all spirits."

অনুধাবন করুন আর এক দৃশ্য অপরূপ।

মাধবী ফুলের গাছ ঘরের পাশেই। রূপময় দেবতা রয়েছেন বসে। একদিন সন্ধ্যায় অসময়ে হঠাৎ এক ঝলক মাধবী-ফুলের গন্ধ আমোদিত করল ঘর। চিন্তিত মুখে একজনকে বললেন—'এ অসময়ে মাধবী ফুলের গন্ধ কেন? দেখতো জানলার পাশে মাধবী ফুলের গাছটা। দেখে এসে দেবতাকে জানাল—গাছ তো নেই, কে তুলে দিয়েছে। খুব রেগে গিয়ে বললেন "আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কে এমন কাজ করল, জান ওদেরও প্রাণ সত্ত্বা আছে। আজ থেকে এই আশ্রমে কোন গাছ কাটবার আগে আমাকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়। গাছটার দুঃখ হয়েছে খুব—তাই যাবার আগে আমাকে জানিয়ে গেল গন্ধ বিলিয়ে। ওতো আমার আশ্রয়েই ছিল।"

সকলে নিস্তব্ধ বাকহীন। সবাই ভাবছে এও কি সম্ভব। একটা গাছেরও ব্যথা যাঁর বুকে বাজে কে এই মহাচৈতন্যময় পুরুষ? সবসময় বিরাট চৈতন্য সত্ত্বার স্পন্দনে স্পন্দিত; মানুষ থেকে আরম্ভ করে পশু পক্ষী লতা গুল্ম সকলের ব্যথার ব্যথা দরদী হয়ে সকলের কল্যাণের জন্য বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন?

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও দেখি সেই লীলা। নৌকার মাঝির গায়ে চড় পড়ল অমনি শ্রীঠাকুর চীৎকার করে উঠলেন যন্ত্রণায়—দেখা গেল ঠাকুরের পিঠে আঙ্গুলের দাগ ফুটে উঠেছে। ঘাসের উপর দিয়ে কেউ মাড়িয়ে যাচ্ছে ঠাকুরের বুকে লাগছে মাড়িয়ে যাওয়ার মত। এক অখণ্ড চৈতন্য সত্ত্বার সঙ্গে যুক্ত। এ কি বুদ্ধি দিয়ে মাপা যায়? এ তত্ত্ব ধারণা করতে যাওয়া ছটাকে বুদ্ধির ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

ভগবান বলছেন ভাগবতে—

"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ

নস্বাধ্যায়স্তপত্যাগে নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্

—ভাগবৎ ১১।১২।১-২

মরমী ভক্ত লিখছেন তাঁর গুরু বন্দনায় -- 'শরণাগতোঽহং শত যুগ যুগং' শত যুগ যুগ ধরে শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা শুধু·······চিরদাস হয়ে। এই তো ভক্তের চির চাওয়া···· ভক্ত তো মিশে যেতে চায় না····· সম্ভোগ চায়···

নিত্যকৃষ্ণ—নিত্যদাস। নিত্য লোকেও চলে এই লীলা। মাঝে মাঝে আসেন নেমে মাটির মায়ায় নিজেকে বাঁধতে। নিজেকে বেঁধে অনেককে বাঁধেন। ভক্ত ভগবানে এ লীলা অপূর্ব—চলে লুকোচুরি খেলা। শ্রেষ্ঠ এ নরলীলা ···মনে তাই প্রশ্ন জাগে বারবার ? কে নেমে এসেছিলেন, যাঁর চরণে সব বিকিয়ে দিতে মন হয় –দেহ মন প্রাণ, যুগ যুগ ধরে·······তাতেও যেন মন ভরে না·······সব দিয়েও আশ মেটে না·······কি যেন বাকী থাকে। এ দুর্নিবার আকর্ষণ কার ? চাওয়া-পাওয়া দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে না। ভক্ত যখন নিঃশেষে নিজেকে উজাড় করে দেয় তাঁর চরণে তখন আমিটাই তুমি হয়ে যায়—সব তিনিময়। ভক্ত হয় ভরপুর—তখনই "ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা"—কথামৃত

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাইতো আমি এসেছি এই ভবে"।

এই লীলা করতেই তিনি আসেন—মিলিয়ে দেবার জন্যই নিজেকে মেলে ধরেন—তাই অবতার—সৃজাম্যহম্—'সম্ভবামি যুগে যুগে' বলেন, পরম আশ্বাস দিয়ে যান।

সপ্তর্ষির শ্রেষ্ঠ ঋষি শিবাবতার স্বয়ং স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন····"ওর নিগুণ ব্রহ্মের ধারণা হয় কিন্তু অনন্ত কোটী ভাব সম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের কোনও ইয়ত্তা করতে পারলাম না"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাঁকে নামিয়ে নিয়ে এলেন তাঁর কাজ করার জন্য—সবদিয়ে ফকির হলেন যাঁর কাছে—তাঁর মুখেই এই উক্তি······কি অনন্ত শক্তি—কি অনন্ত প্রেম স্বরূপ। তাঁকেই আমরা দেখতে পাই ছোট্ট মানুষ হয়ে অবতার রূপে। এ ভাবতে গেলেও চাই আকুল প্রার্থনা—

"দয়া তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে—
নইলে কি আর পারবো তোমার চরণ ছুঁতে"

একমাত্র তাঁর কৃপা দয়া না হলে কিছুই বুঝবার যো নাই। তাই তাঁর কৃপার ভিখারী হয়ে—দরদী হৃদয়ে······· মরমী মন দিয়ে ভাবতে হবে। "দরদী নইলে তাঁরও প্রাণ বাঁচে না"। সেই ভাব দেখলেই তিনি ধরা দেবেন। আজ তাই দরকার দরদী মনের মরমী ভক্তের—যাঁরা বোঝাবেন অবতারবাদের পরম তাৎপর্য, যাঁরা জেলে দেবেন এই স্বার্থ হিংসা ঈর্ষা ভরা দুনিয়াতে—কল্যাণ আলোর শিখা —তবেই বাঁচবে আজকের পৃথিবী। আহ্বান জানাই ভূমার আলোয় নিবেদিত আলোকিত প্রাণে প্রাণে··········· তোমরা এসো—তোমরা স্মরণ করো—তোমরা প্রকাশ কর –কে এসেছিলেন যুগাবতারের যুগ-নির্দ্দেশ 'নারদীয় ভক্তি'র, আচরণ করে দেখিয়ে দিতে ? কে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন 'কথামৃতই এ যুগের বেদ—গীতা—সব আবার তারও ওপরে'। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথারই প্রতিধ্বনি—"এখানকার কথা বেদ বেদান্ত ছাড়িয়ে গ্যাছে"। তাই কি বলেছিলেন—"জানি কি না আর একবার আসতে হবে"। মরমী ভক্তের লেখা 'স্মৃতির তীর্থে'র পাতায় পাতায় তারই কি আভাস ইঙ্গিত ? উন্মুখ হয়ে শুনতে হবে······কোন্ সুরলোক হতে ভেসে আসছে ঐ সঙ্গীতের সুরমূর্ছনা····· "প্রেমকা ঠাকুর আয়া রে·······

আয়া...আয়া....আয়া রে......

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের
আশীর্ব্বাণী

ছোট্ট তোমরা ফুলের কুঁড়ি
দেবের আশিস্ মাথে
সপ্তলোকের স্বর্ণ কিরণ
ছড়িয়ে আঁখির পাতে ॥

★

সত্যানন্দ স্বামী

স্বপনবুড়ো

মণিময় মন্দির গঙ্গার তীর—
মৃদু সমীরণে মন হল যে গভীর।
গঙ্গার কুলুতান শুনি একেলা –
ওপারের আকাশেতে মেঘের খেলা!
নিরিবিলি বসে থাকি, মনে জাগে সুর –
মণিময় মন্দির কে করে মধুর?
গগনেতে মালা গেঁথে চলে বলাকা—
রাঙা মেঘে কাঁথা বোনে কার শলাকা?
হেথা কেবা জ্বালিয়াছে যজ্ঞ-অনল?
মানুষেরে ডাক দিল ত্যজিতে গরল।
হেথা জাগে নব সুর, নব ভাবনা—
প্রাণ দিয়ে পরশিতে তারে পাব না?
পশু পাখী মানুষেরে বেসেছে ভালো—
হেথায় জ্বেলেছে কে গো প্রাণের আলো?
ত্যাগ, প্রীতি, ধেয়ানের সলিতা ধরি—
জ্বেলেছ "অমর জ্যোতি" সাধনা করি।
প্রাণ দিয়ে জাগায়েছে শত-শত প্রাণ—
"সত্যানন্দ স্বামী" হেথা অম্লান॥

★

সত্যব্রত

প্রবুদ্ধ

সত্যই ঈশ্বর ঈশ্বরই সত্য
এ কথাটি চাও যদি বুঝতে,
তবে কেন ছুটে চলো মিথ্যা কাঁচের পানে
চলো চলো যাই সত্যের সোণামণি খুঁজতে।

যুগে যুগে ঈশ্বর মানুষের মতো হয়ে
ধরণীর ধূলিতলে এসেছেন,
তাঁরা সত্যের হোমানলে নিজেরে আহুতি দিয়ে
মানবের মহাবেদী রচেছেন।

সত্যের জয়রথ চলবে
ঋষিদের মন্ত্রটি ফলবে,
মিথ্যার মেঘজাল ছিন্নিয়া
সত্যের সূর্য্যটি জ্বলবে।

আনন্দ হিল্লোল প্রাণে কি বহাতে চাও?
তবে সত্যব্রতে ভুলে থেকো না,
সত্য আনন্দ অমৃত চাও যদি—
সত্যের মুখোসেতে মিথ্যাকে ঢেকোনা।*

* আমাদের ঠাকুর শ্রীসত্যানন্দ দেবের বাবা মায়ের দেওয়া নাম ছিল—সত্যব্রত। তিনি আমাদের কাছে এই বলে শিক্ষা দিতেন—Be true to yourself—নিজের কাছে সত্য হও।

প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণকুন্তল বসু

আমাদের মুখে দিলে ভাষা
বোবাদের দিলে না তো তাহা,
আমরাতো চোখে দেখি বেশ
অন্ধরা দেখে না যে আহা।
দাও কথা বোবাদের প্রভু
অন্ধকে দাও তুমি দৃষ্টি,
তুমি শুনি দয়াময় হরি
আমাদিগে করিয়াছ সৃষ্টি।

খেলার ঠাকুর—ছোটদের

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

মনে পড়ে তো অনেককথা! কিন্তু .বলতে গেলে বলা তো ফুরোবে না। আচ্ছা আমাদের সেই ছোট্টবেলার ছোটদের ঠাকুরের কথাই বলি……....

সেদিনের আশ্রম গলির ভেতর তার স্বল্প বিস্তৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আধো আলো আধো অন্ধকারে মেশা একটা বিরাট ইতিহাসের স্বরুর ছবি বলা চলে। ছোট্ট, বাঁধানো উঠোনে জামগাছের ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো রোদ এসে পড়া সকাল আর একটি সল্‌তের বুকে এক ফোঁটা আলো জ্বলা সন্ধ্যা। তারি মধ্যে স্বরু হল একটা যুগের পথ-চলা। আমরা ছোটর দল আসতাম ঠাকুরের সঙ্গে খেলতে। ঠাকুর ছিলেন আমাদের খেলার সাথী। অবশ্য এও ঠিক সেই খেলার ছলেই অনেকগুলি কচি মনে ঠাকুর সংসারের খেলা ভোলার সাধ জাগিয়ে ছিলেন। এখন থাক্ সে-কথা। আজ ভাবতে বড় অবাক্ লাগে যে ঠাকুর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর ধ্যানে ডুবে আছেন, সেই ঠাকুর যখন ছোটদের দলে থাকছেন তখন যেন একটি লীলা-চপল গোপাল। কত নোতুন নোতুন খেলা তৈরী করেছেন। একদিন মনে আছে, এরোপ্লেন এরোপ্লেন খেলা স্বরু হল। ঠাকুর start বলেন, আর ছোটরা তখন দু হাত ডানার মত ক'রে মেলে মুখে প্লেনের মত আওয়াজ ক'রে উঠোনটাকে ঘুরতে স্বরু করে। এই ভাবে তিনবার ঘোরার পর ঠাকুরের কাছে এসে যে আগে থামে তারই হয় জিত।. আবার এর ফাঁকে ফাঁকে ডানা ভেঙ্গে এ্যাক্সিডেণ্ট হওয়ার অভিনয়ও চলে। কখনো চলে জল-কুমীর খেলা, লুকোচুরি খেলা। সবচেয়ে মজা লাগতো জল-কুমীর খেলার সময়। একটি ডাঙা থেকে আর একটি ডাঙায় যাবার সময় ঠাকুরের নামের একটি অক্ষর 'রা' অথবা 'মা' কিংবা "জয় ঠাকুর" বলে জলে নামা হত। ঠাকুর বলতেন "জলে কুমীর আছে, ধরবে, নাম কর্"। কিন্তু কুমীর তো ধরতোই। তখন মজা করে বলতেন, "এই রে ধরা পড়লি! নিশ্চয়ই তুই বিশ্বাস করে নাম করিস্ নাই।" অবশ্য ঠাকুর স্বয়ং যখন কুমীর হ'তেন তখন ধরা দেওয়ার সাধটা সকলের মনেই জেগে উঠতো। শুধু তাই নয়, যে ধরা পড়তো তার মনে গর্ব্ব হ'ত, কারণ এ ধরা-পড়া তো অনেক ভাগ্যেই ঘটে।

ফিকে হলুদ রঙের আলো জড়ানো সারাটা বিকেল কলরবে ভ'রে থাকতো। এমনি খেলায় অবশ্য অনেক সময় বড়রাও যোগ দিতেন। সারাদিনের কর্ম্মজগতে তাঁরা কেউবা উকিল কেউ বা অফিসার বা আরো কিছু। কিন্তু বিকেলের আশ্রম পরিবেশে তাঁরাও ছোটর দলে ছোট হয়ে ঠাকুরের লীলার আসরে যোগ দিতেন। মনে পড়ে হরিদাস কাকুর কথা। সেদিনের সিউড়ীর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, একাধারে বীরত্ব ও শিশুত্ব দুটিই ছিল তাঁর মধ্যে। সেবার বেশ বড় একটি ফোড়া হয়েছে তাঁর কোমরে। আগের দিন রাত্রে খুব যন্ত্রণা। পরের দিন কিন্তু যথারীতি আশ্রমে এসেছেন। এসেই দেখেন, ছোট বড় অনেকেই যোগ দিয়েছেন, লীলাসুন্দর ঠাকুরের সঙ্গে জল-কুমীর খেলায়। হরিদাস

কাকুও নেমে পড়লেন খেলায়। ভুলেই গেলেন তাঁর ফোড়ার কথা। সেদিন আবার চপগোপালের চপ হচ্ছে আশ্রমে। চপগোপালের একটু পরিচয় দিয়ে নিই। ঠাকুরের একটি দীনভক্ত সে। ছোট্ট তেলে ভাজার দোকান ছিল তার। ঠাকুরের আশ্রমে মাঝে মাঝে আলুর চপ তৈরী করে মুড়ির সঙ্গে সে ভক্তদের খাওয়াতো। তার হাতের গুনে খেলার সাথে সেই চপ আর মুড়ি বেশ জমতো। ভক্তদের মাঝে জেগে উঠতো আনন্দের সাড়া। সকলে মজা করে গাইতেন, "রামকৃষ্ণ বল নেচে চল বদন ভ'রে গাওরে নাম"। আবার আখর দেওয়া হ'ত, "বদন ভ'রে খাওরে চপ"। সেদিন হরিদাস কাকু মহানন্দে খেলছেন, ঠাকুর এবং আমাদের সঙ্গে। মাঝে মাঝে "হরি রামকৃষ্ণ" "গুরু ভগবান" এই ধ্বনি উঠছে। ঠাকুরের কি লীলা, হরিদাস কাকু যন্ত্রণা নিয়েই খেলছেন! হঠাৎ উঠোন থেকে রামকৃষ্ণ নামের হুঙ্কার তুলে তিনি লাফিয়ে বারান্দায় উঠতেই পা পিছলে পড়ে গেলেন। ঠাকুর ছুটে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। ভারি শরীর, পড়ে না-জানি কোথায় আঘাত লাগলো। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন ব্যস্ত হ'য়ে—"কোথায় লাগলো হরিদাস?" হরিদাস কাকু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"লাগেনি ঠাকুর, বরং লাগা ভাল হয়ে গেল।" ঠাকুর অবাক! "তার মানে?" হরিদাস কাকু বলেন, —"একটি ফোড়া হয়েছে, বেশ যন্ত্রণাও হচ্ছে। কাল সারারাত কষ্ট পেয়েছি কিন্তু আজ পড়ে গিয়ে সেই জায়গাতে আঘাত লাগলো, জোর একটা ধাক্কা খেয়ে ব্যথাটা কমে গেল।" ঠাকুর বললেন—"দেখ দেখি, বলতে হয়, তোমার ফোড়া হয়েছে! তাহলে কি খেলতে দিই?" হরিদাস কাকু বললেন, "খেলে তো ভালই হ'ল ঠাকুর, আর তো কৈ ব্যথা অনুভব করছি না।" তারপর হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন "গুরু ভগবান জয় জয়।" সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল আর এক মাতন। চপগোপাল নিয়ে এসেছে তার চিরপরিচিত আলুর চপ। বিতরণ করছেন শ্রীঠাকুর। ছুঁড়ে দিচ্ছেন চপ, ভক্তদের মাঝে, চলছে কাড়াকাড়ি। এই রকম হুড়োহুড়ির মধ্যেও কি কম দুর্ঘটনা ঘটতো! কিন্তু সেই আনন্দ উৎসবের মাঝে সেগুলো যেন নগণ্য মনে হ'ত।

ঠাকুর ওপরে আলোচনা করছেন ভক্তদের সঙ্গে। আর আমরা ছোটর দল নীচে ছটফট করছি। কখন ঠাকুর আসবেন, আমাদের খেলা সুরু হচ্ছে না যে! অবশেষে গিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে উঁকি মারি। গোধূলির আলোর আভা এসে পড়েছে ঠাকুরের সারা মুখে। তন্ময় হয়ে বলে চলেছেন নানা তত্ত্ব কথা। প্রবীণ ভক্তদল শুনছেন মুগ্ধ হ'য়ে। হঠাৎ ঠাকুরের চোখ পড়ে সিঁড়ির দিকে। বলে ওঠেন, "আরে! তোরা এখনও খেলা সুরু করিসনি।" বলি—"না ঠাকুর, আপনি আসুন তবে তো!" ব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়েন ঠাকুর। বলেন, "আজ এইখানেই থাক্, আমি একটু ওদের সঙ্গে খেলে আসি।" জনৈক প্রবীণ ভক্ত একটু আপত্তি করেন—"বাবা আজ খেলা থাক্না। কেমন হরি-কথা হচ্ছিল।" ঠাকুর হাসেন। বলেন, চপল হ'রিটি যে ছোটদের মধ্যেই খেলা করেন বেশী। আসুন না আপনারাও যোগ দেবেন। প্রবীণ ভক্তটি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে নেমে আসেন ঠাকুরের সঙ্গে। অবাক্ হ'য়ে দেখেন ছোটর দলে আরও ছোট হ'য়ে ঠাকুর কেমন করে নিজেকে হারিয়ে ফেল্লেন আর আনন্দ খেলায় মেতে উঠলেন। খেলা শেষে নাম সুরু হ'ল। তারপর ঠাকুর ওপরে উঠে গিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে চিনে বাদাম ছুঁড়তে লাগলেন। আমরাও উন্মত্ত হ'য়ে 'হরি রামকৃষ্ণ' 'হরি রামকৃষ্ণ' বলে বাদাম কুড়ুচ্ছি আর অবাক্ হয়ে দেখছি সেই ক্ষুণ্ণচিত্ত প্রবীণ ভক্তটিও নিজের গাম্ভীর্য্য ভুলে নেমে পড়েছেন আমাদের মাঝে আর আমাদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে বাদাম কুড়ুচ্ছেন। আনন্দ হুড়াহুড়ির পরে তিনি বলেছিলেন, "মহাজনের পক্ষে সবই সম্ভব। সত্যিই অবাক্ কাণ্ড। একেবারে ব্রজের গোপালের মত গোপ বালক বালিকাদের সঙ্গে খেলায় মেতে গেলেন!" ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

কখনও হয়তো ইংরাজী ছবির বই নিয়ে বসেছেন আমাদের নিয়ে। কোনও একটি ছেলে জায়গা না পেয়ে ঠাকুরের কাঁধে হাত দিয়ে ঝুঁকে দেখতে গেছে, ছুটে এসেছেন জনৈক ভক্ত—"এই এই করছিস্ কি।" ঠাকুর হেসে বলেন —"এখন আমি ওদের দলে। তোমরা এখন কিছু বলতে পাবে না।" থেমে যান তিনি। আর ঠাকুর আনন্দে ছবি দেখাতে থাকেন।

কত কথা গল্পচ্ছলে বলতেন, যা নরম মনে খুবই দাগ কেটে যেত। তার মধ্যে থাকতো জীবন গড়ার উপদেশ। কবি মন, চিত্রশিল্পী মন, এই গুলিও বেছে নিতেন নানান্ ছলে। হয়তো ছোটদের মধ্যে কেউ ছবি আঁকতে পারে। তাকে গানের দুটি লাইন বলে বল্লেন, "গানের ভাবটা ছবিতে ফুটিয়ে তোল দেখি!" তাঁর সেই কথার-শক্তিতে ছোট্ট হলেও সেই শিল্পী অনেকখানি ফুটিয়ে তুলতো তাঁর গানের ভাব তূলির মুখে। আবার কারো কবি-মন, তাকে আকাশের একটা রঙ দেখিয়ে বললেন, "একটা ভাল কথা বল্ দেখি"। সঙ্গে সঙ্গে সেও ঠাকুরকে খুশি করার মত একটি শব্দ বা ভাব প্রকাশ করলো।

নানাভাবে করতেন ছোটদের বুদ্ধি পরীক্ষা যেমন, "বল্ দেখি, বাড়ী থেকে আসবার পথে কি কি দেখেছিস ?" যে যত বেশী খুঁটিনাটি বলতে পারলো সেই হল জয়ী। স্মৃতিশক্তির পরীক্ষাও নিতেন, কয়েকদিন আগের কোন ঘটনা পুঙ্খানু-পুঙ্খ রূপে বর্ণনা করতে ব'লে। লক্ষ্য করতেন কে কত নিখুঁত বর্ণনা করছে এবং কার বর্ণনা করার মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে। মাঝে মাঝে ধ্যান করার খেলাও খুব হ'ত। কে কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে স্থির হ'য়ে বসে থাকতে পারে অথবা এক পায়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। এ সব খেলায় ছোটদের আকর্ষণ থাকার কথা না। কিন্তু কি অদ্ভুত ঠাকুরের প্রভাব! এসব খেলাতেও ছোটর দলে কম উৎসাহ দেখা যায়নি। বরং এক এক সময় দুজনের মধ্যে এত জোর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হ'ত যে, ঠাকুরকে বলতে হ'ত "আচ্ছা, আজ আর থাক্, তোরা দুজনেই জিতেছিস।" বড়দের চোখ এড়িয়ে কতবার ছোটদের নিয়ে লুকিয়ে চলে যেতেন মাঠে। অবশ্য বড়র দল ঠিক গিয়ে হাজির হতেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। কেউ কেউ বা বলতেন, "না ঠাকুর, এবার ঠাকুরের সঙ্গে ছোট হয়েই আসতে হবে দেখছি।" ঠাকুর বলতেন, "কেন এই জন্মেই ছোট হ'য়ে যা না। মনটাকে শিশু ক'রে ফেল।"

সামনে ঘিরে বসতো ছোটর দল। বড়দের অভিযোগ সেখানেও। "এই সব সর দেখি, প্রণাম করতে দিবি না নাকি?" ঠাকুর মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন। বলছেন, "দেখ বাপু, ওরা সরে কি না।" আবার এদিকে আমাদের ইশারা ক'রে বারনও ক'রে দিচ্ছেন। আধখানা মুখ ঢেকে সে ইশারা করার ভঙ্গিটি এখনও মনে পড়ে। কখনও বড়দের বলেছেন, "তোমাদের কত খোলস, সে খোলসগুলো ছাড়ো তবে তো আসবে।" একবার তো ছোট্কা (ঠাকুরের ছোট ভাই) দিলেন আমাদের কোলে এক কোলা ব্যাঙ ফেলে। এমনি কতদিন কত মজাই না হ'ত। কখনও বলতেন, "ওরা মহামায়া, ওদের 'স্তব' কর তবে দরজা ছাড়বে।" একবার এই নিয়ে একটি মজার ঘটনা ঘটলো। শোভামা এসেছেন বাড়ী থেকে। ঠাকুর ইশারা করতেই আমরা সব হাতে হাত দিয়ে ঘিরে বসে রইলাম ঠাকুরকে। ঠাকুর সব মায়েদের বললেন, "এই দেখ বাপু, এরা সব তো ঘিরে বসে আছে, কেমন করে আসবে প্রসাদ নিতে, দেখ।" কেউ বলে জোর ক'রে যাবো, আবার কেউ বা চেষ্টাও করে হাত ছাড়িয়ে ঠাকুরের কাছে এগিয়ে যেতে। ফুলমা (বীণাপুরী) বলেন, "ঠাকুর, এতো কৃপার যুগ। ঠাকুর কৃপা করে এগিয়ে আসুন।" শোভামাকে জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুর, 'তুই কি বলিস ?" শোভামা হাসতে হাসতে বললেন ..."ঠাকুর! তুলসীদাসের একটি দোঁহা আছে—"রাম সে অধিক রাম কে দাসা।" ঠাকুর খুব খুশি। হাত তালি দিয়ে বলে উঠলেন, "বেশ কথা। রাম সে অধিক রামকে দাসা / কোই সে নহীঁ ফাঁসী ফাঁসা।" আর কি। আমরাও খুব মজা ক'রে চেঁচিয়ে গাইতে লাগলাম—রাম সে অধিক রাম কে দাসা। কোই সে নহীঁ ফাঁসী ফাঁসা। আনন্দ কলরব করতে করতে ঠাকুর নেমে এলেন নীচে আমাদের সবাইকে নিয়ে।

এখনও চোখে ভাসছে সে দিনগুলো—আলোর মত সেই জামতলা, পিছনের বাগান, সুবাস ভরা গুলঞ্চ গাছ, নীম গাছে পাখীদের ভীড় আর পালিয়ে যাওয়া কুলেরার মাঠ, শাপলা দীঘি। মনে আছে অনেক শরতের সকাল হেমন্তের বিকেল। কিছুই ভুলিনি। এখনও মনটা মাঝে মাঝে গিয়ে বসে সেই চলে যাওয়া দিনগুলোর তীরে। আর উতোর গোঠের সুর গুনগুনিয়ে ওঠে মনে। সে সুর বলে, ব্রজের রাজা তার রাখাল সাথীদের ফেলে একাই চলে গেল কেন ?

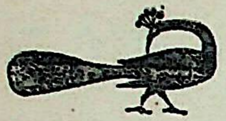

জয় ঠাকুর

মণিমন্দির
জয়ন্তী ফাল্গুন ১৩৮২

ও আমার বুলবুলি ভাইবোনেরা,

এই ফাগুনের বিশেষ সত্যানন্দ-প্রীতি-শুভেচ্ছা নিও। ঋতুরাজ বসন্তের ফাগুন হ'ল আনন্দের মধুমাস। ফাল্গুনী প্রকৃতির যে দিকে তাকাই দেখি শুধু জাগরণের, আনন্দের উজ্বল প্রকাশ। ফলে ফুলে মঞ্জরিত কুসুমিত ফাল্গুন, পলাশ কৃষ্ণচূড়ার আগুন রঙে রাঙা। রাঙা ফাগুনকে বড় আনন্দ-উদাস পবিত্র-সুন্দর লাগে। আহা বুলবুলিরা! ভাবি ফাগুনের বুকে এমন অসীম আনন্দে সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠার জাগরণী মন্ত্র আর নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেবার ত্যাগ-রঞ্জিত রূপ কে এঁকে দিল! কার প্রেরণায় কার আবির্ভাবের সোনার পরশে ফাল্গুন এমন দিব্য আনন্দে মুখর হয়ে উঠল! বুঝেছি বুঝেছি বুলবুলি, ফাগুন যে বারবার পেয়েছে দেবতার আশীর্বাদ। রাঙা পূর্ণিমায় গৌরাঙ্গ প্রভুর কাছে সে পেয়েছে নাম—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিয়েছেন মহা সমন্বয়ের, মহামিলনের মহাবাণী—"যত মত তত পথ" আর কৃষ্ণা দ্বিতীয়ায় শ্রীসত্যানন্দ ঠাকুর দিলেন পবিত্রতার মহামন্ত্র—"এ যুগের কথা পবিত্রতা।"

দখিনা বাতাসের দোলায় পাতার মর্ম্মরে শুনি যেন ফাগুনের পবিত্র নামের মৃদু গুঞ্জরণ। মুকুল মঞ্জরীতে আর কুসুমের বিচিত্র বর্ণে গন্ধে শুনতে কি পাওনা বুলবুলি ফাগুনের মিলনের গান! অনুভব কর কি, পলাশ কৃষ্ণচূড়া ফাগুনের বুকে জ্বালে যে-পবিত্রতার আগুন! দেবতার আবির্ভাবকে স্বাগত জানাতে, ঠাকুরের চরণে নিজেকে উজার করে সঁপে দিতে সব দিক থেকে ভরে নিয়ে ফাগুন উঠেছে ফুটে। তাই ফাগুন এমন মধুময়, এমন আনন্দময়।

দেবতার আবির্ভাব-স্মরণ-রাঙা ফাগুন আমাদের মনেও জাগায় দেবস্মৃতির দিব্য-স্মরণ-আনন্দ। দেবতার পুণ্য আবির্ভাব স্মরণে দেব পূজায়, উৎসবে ফাগুনের মতো আমরাও উঠি মেতে। এবারও আমরা দেবতার আবির্ভাব স্মরণ উৎসব পালনে সকলেই হয়েছি ব্রতী। কিন্তু সবার মাঝে এবার উৎসাহ, প্রেরণা ও আনন্দের স্পন্দন যেন অনেক অনেক গুণ বেশী অনুভব করছি। তা না হবে কেন বল বুলবুলি? এবার যে আমাদের ঠাকুর শ্রীসত্যানন্দদেবের পঁচাত্তরতম জন্ম-জয়ন্তী—প্ল্যাটিনাম উৎসব। কাজেই এই বিশেষ পুণ্য আবির্ভাব-উৎসবকে সকল দিক থেকে সার্থক করে তুলতে হলে সেই রকম বলিষ্ঠ উদ্যম ও প্রচেষ্টারই তো প্রয়োজন। কিন্তু বুলবুলি, ঠাকুরের আবির্ভাব আনন্দে পূর্ণ বিকশিত এই সুন্দর ফাগুনকে দেখে কি মনে হচ্ছে জান—মনে হচ্ছে, ঠাকুরের শুধু স্মরণ-উৎসবই নয় আমাদের এই দুর্লভ মানব জনমও সত্যিকার সার্থকতা লাভ করবে যদি আমরা সব দিক থেকে নিজেদের ফাগুন প্রকৃতির মতই পবিত্র সুন্দর করে মেলে ধরতে পারি। ঠাকুরের নামে গানে ভাবাদর্শে আমরা যদি জীবনকে শিবসুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি তবেই আমাদের ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব পালন সার্থক হবে।

তোমরা কি জান না বুলবুলি! তোমাদের জন্য যে তাঁর চিরচঞ্চলতা, সীমাহীন ব্যাকুলতা। তোমাদের কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য, তোমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য অফুরাণ স্নেহ ভালবাসা দিয়ে কত ভাবে তিনি দিয়েছেন শিক্ষা ও প্রেরণা। আপন আচার আচরণ, অমৃত বাণী উপদেশ, গান, কবিতা, সাহিত্য, অভিনয়, খেলাধুলো, ত্যাগ-তপস্যা সবের মধ্য দিয়েই তোমাদের তিনি দিয়েছেন মানুষের মত মানুষ হবার, বড় হবার মন্ত্র-আদর্শ। মনে কি পড়ে না বুলবুলি তোমাদেরই উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর কবিতাগুলি—

"বড় হবার মন্ত্র তোমার বুকেই আছে গাঁথা," "মনের ভেজাল রেখ না," "ভাল যা তা সবাই চায়"—এসব

তো কত তোমরা আবৃত্তি করেছ! তারপর ঐ যে আর একটী কবিতা—ছোট্ট বেলায় কেমন সাহসী ছিলেন তার পরিচয় রয়েছে যাতে লুকিয়ে—

"রথতলা নাম শুনেছ তো গোঁসাইদের ঠাঁই
সেথায় বারেক জমা হলাম ছেলেরা একজাই।
দেখেই বলে কোল্‌কেতারই ছেলে তুমি বড়
এসো আজি লড়বে দেখি সাহস কত দড়।
অনেক কসরৎ করেই সব এক মিনিটে হারে
সবাই বলে সাবাস ভাই চলো নদীর পাড়ে।
অজয় তীরে ব্রিজের উপর এসেই বলে—নাও
লাফিয়ে এবার পড় দেখি সাবাস নিয়ে যাও।
লাফিয়ে পড়ি রাখতে মান সেই সে উপর হতে
উবুড় হয়ে নরম বালি আঁকড়ে কোন মতে।
অজয় নদী পার হ'তে যে ডুবেই গেছি যবে
সাহস ক'রে চ'লেই জেনো মরণও ভয় পাবে।
বীর স্বামীপাদ বলেই দেছেন সাহস যেন রেখো
মানুষ হবার মন্ত্রটী তাঁর বুকের কোণে এঁকো।

তারপর সেই "ছোট্ট কথা"—

"বড় কথা বলতে যে চাই
ছোট্ট কথায় যত
জীবনটাকে ক'রে তোলো
গোলাপ ফুলের মত"

কত আর উদাহরণ দেব বুলবুলি? শুধু কি বাংলায় লিখেছেন। তোমরাই তো তাঁর একমাত্র ছেলেমেয়ে নও, সারা বিশ্বের ছেলেমেয়েদের জন্য যে তাঁর চিন্তা। তাই জগতের প্রায় সবদেশে যে ভাষাটা চলে সেই ইংরেজীতেও ছোটদের জন্য লিখেছেন কত কবিতা। সেগুলোতেও ঐ একই সুর, বড় হবার প্রেরণায় ভরা আর মানুষ হবার মন্ত্রবীজে গাঁথা। তোমাদের বোঝবার সুবিধার জন্য আমাদের অর্চনা মা ঠাকুরের ঐ ইংরেজী কবিতাগুলিরই একটির শুধু ভাবটুকু নিয়ে 'কিশোর কুঁড়ি' নামে বড় চমৎকার একটা কবিতা তোমাদের :উপহার দিয়েছেন—এত সুন্দর যে, সেটা তোমাদের না শুনিয়ে থাকতে পারছি না—

আধো জাগা কিশলয়
তোমরা কি ভালবাসোনা উধাও নীলিমারে?
চাওনা কি ফিরে আলো-পানে মুখ তুলে
বল কোথা চাও যেতে
হোথায় নয় কি? ঐ যে স্বর্গ ডাকে স্বর্ণিম দ্বার খুলে।
বাসো ভালো তবে ফুল-উজ্জ্বল হৃদয়টী
বাসো ভালো ভরা জীবনকে
অফুরাণ প্রাণ শক্তিতে হও প্রস্ফুট
পরাজিত করি মরণকে।
কথা আর কাজে সহজ চলার
গতিটি থাক
পরম জ্ঞানের পাথেয় লও
হও শুচি আরো সুন্দর
জানি জানি আমি, আঁধারের শিশু
তোমরা নও।

শুনলে তো বুলবুলি! তোমরা আঁধারের শিশু নও। তোমরা আলোর শিশু। তাই বলছিলাম, ফাগুনের মত তোমাদেরও সত্য-শিব-সুন্দর হয়ে ফুটে উঠতে হবে। ফুল সুন্দর হয়ে তাঁর চরণে নিঃশেষে নিবেদিত হতে হবে। তবেই ঘটবে তাঁর মঙ্গল আবির্ভাব তোমাদেরই মাঝে, তোমাদেরই বুকে—তখন তোমাদের নিয়ে এই জগৎ সংসার হয়ে উঠবে শান্ত ও সুখের আগার। কাজেই আজ তাঁর কথাতেই তাঁর জন্মদিনে এস আমরা প্রার্থনা জানাই তাঁর চরণে—

তোমার জন্মদিনে
একটা কথাই নিও।
ফুলের মত চরণ তলে
থাকতে আমায় দিও।

—বড় ময়ূর

'ফুলের মত হও'

মনকুমার সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে তীর্থংকরদের প্রবেশ মাত্র স্বামী সত্যানন্দজীর যে আশীর্বাণীটি আকর্ষণ করে সেটি হল একটি উজ্জ্বল নিশান : 'ফুলের মত হও'। মন্দির ও নাটমন্দিরে দৃষ্টিগ্রাহ্য আর সব কিছুকে যেন ছাপিয়ে এই মরমী আহ্বান,—প্রিয়জন—ভক্তজনদের টেনে তুলবার এই আকৃতি। রক্ষাকবচের মতো এই ফলকটিকে যিনি তাঁর অন্তরতম ইচ্ছার অভিব্যক্তি রূপে তুলে ধরেছেন, তন্মুহূর্তেই আশ্রম যাত্রীর মনে করতেই হয় তিনি হলেন একজন 'কবি-সন্ন্যাসী'। ফুল সাক্ষী করে শুদ্ধতার ও পূর্ণতার সাধনায় ডাক দেয়া 'কবি-সন্ন্যাসীর' পক্ষেই স্বাভাবিক। এই ভাবে সবচেয়ে সহজ-সুন্দর বস্তুটিকে যিনি সাধক ও প্রেমিকদের সামনে আদর্শের প্রতীকরূপে তুলে ধরেছেন, তাঁর মধুর আধ্যাত্মিক সত্ত্বাটিও তারি মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

কবি-সন্ন্যাসী দুই জগতের সেতুবন্ধ। কবি সংসারী হয়েও দিগন্ত পারের স্বপ্ন দেখেন, তাঁর চোখে ক্রান্তির ও কালান্তরের স্বপ্ন। সন্ন্যাসী সংসারবাসীদের মধ্যে থেকেও তাঁদের বাইরে, তাঁদের উর্ধে। এই সংসারে থেকেই সন্ন্যাসের জপমালা তাঁর কাব্যের উপাদান। এই সংসার-সন্ন্যাসের অনুপম আশ্বাসটিই বোধ করি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অবতরণের শ্রেষ্ঠ সংবাদ। পাঁকে থেকেও পাঁকাল মাছের মত থাকা—ঘরের মানুষের কাছে এত আপন অতি পরিচিত পথ নির্দেশ আর কবে কার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি? একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে: এ কর্মব্যস্ততার ও যন্ত্র-সভ্যতার যুগে সমস্যা মূলতঃ একটিই : সংসারে থেকেও নিরাসক্ত থাকা, অসংসারী হওয়া; কর্মব্যস্ত হয়েও কর্ম-ত্যাগীর নির্লিপ্তি অর্জন করা।

অন্তর্মুখী কবি-সাহিত্যিকই সংসারের সেই সাধকশ্রেণী, যাঁরা সংসারের বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে থেকেও অন্য জগতের, অন্য ভাবের ধ্যানে নিমগ্ন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই খানেই তাঁদের মিল। অন্য কথায়, এ-যুগে কবি ও সন্ন্যাসীর সেতুবন্ধই বন্দী বিধাতাকে উদ্ধার করতে পারে, সংসারী মানুষকে তার অন্তর্নিহিত শুদ্ধ আধারে প্রত্যাবর্ত্তন করার, অন্তহীন ভোগের ভেতর অন্ধকার থেকে সীমিত বস্তু-সন্তোষের সহজ আলোকে উত্তীর্ণ হবার পথ দেখাতে পারে।

পাঁকের পারে যে পরিশুদ্ধ জগত, যে নতুন সৃষ্টির দিগন্ত, ধ্যানস্থ কবির সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে; কিন্তু সে-নব সৃষ্টির জগতে প্রবেশের পথটি তার জানা নেই। এ-পথের পথিক হচ্ছেন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী উত্তরিত পুরুষ। সংসারের আসক্তির আবিল বসনের বদলে নিরন্তর ত্যাগের গৈরিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত। সন্ধানী মানুষকে তিনিই পথ দেখাবার যোগ্যতা রাখেন। তাই বলা যায়: কবিত্বের যেখানে শেষ, সন্ন্যাসের সেখানে শুরু। কিম্বা বলা যায়, কবিত্বের পূর্ণতম পরিণতি সন্ন্যাসে, যেখানে কবি শুধু ক্রান্তদর্শী নন ক্রান্তস্পর্শী। নতুন জগত ও জগতের আলো তখন তাঁর মুঠোয়, মাত্র লেখনীর মুখেই নয়। তখন তিনি শুধু বিপ্লবের স্রষ্টা নন, বিপ্লবের স্রষ্টা সৈনিক।

আসলে অন্তর্মুখী সাধনার সিঁড়ি বা আধাররূপে কাব্যসাহিত্যের যতটা প্রকাশ, পরিণতি, ততটাই তার স্থায়িত্ব। সৎসাহিত্য মানেই 'সত্' বা যা আছে, যার অস্তিত্ব চিরকালের, সেই মূল্যবোধে আধারিত আস্বাদিত সাহিত্য। কী আছে এই প্রশ্নের উত্তরই ভারতীয় সভ্যতার মূলাধার উপনিষদের বাণী। পরমহংসদেব তাঁর সর্বাত্মক ভাগবতী ভাবনার মুখে বলেছেন—ঈশ্বরই আছেন। 'ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু'।

অতটা বলতে যদি 'বস্তুবাদী' 'যুক্তিবাদী' ও 'বিজ্ঞানী'র মুখে বাধে, তবে তাবৎ প্রাণ-জগতের অখণ্ডতা

অবিভাজ্যতা তো অবশ্যই সর্বমান্য ? এই অখণ্ড প্রাণসম্পন্ন অস্তিত্বই আমার ঈশ্বর হউক, তাবৎ ক্রিয়া-কর্মের অভীষ্ট হউক—ক্ষতি কী ? এই অখণ্ডবুদ্ধিই অনন্ত জ্ঞান। জ্ঞানী-ঋষিগণ এই অনন্ত জ্ঞানের মূর্তি, পূর্ণতম ভাবের পৌরুষকেই ঈশ্বররূপে ধারণ করেন। এই অখণ্ডতার জ্ঞান বা অনন্তের উপলব্ধিতে পৌঁছুবারই একটি পথ বিজ্ঞান। জ্ঞানে উত্তীর্ণ হবার এই বিশেষ পথটিরই নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের পরিণতি চিরন্তন সত্যের নব আবিষ্কারে, অখণ্ড প্রাণের সঙ্গে সহমর্মিতায়। অর্থাৎ, যেমন ভাববাদী কবির পরিণতি সন্ন্যাসে, যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীরও পরিণতি পূর্ণজ্ঞানে। এরও ভাবগত অর্থ হল : মূল বস্তুর সন্ধানে কবি এবং বিজ্ঞানী একই অভীষ্টের সাধক, যদিও দুজনের পথ ভিন্ন। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, জগৎ সংসারে যিনি যে পর্যায়ের কর্মী হউন, তাঁর পেশা বা বৃত্তি যা-ই হউক, ইষ্ট ও অভীষ্ট-জ্ঞান যদি তাঁর 'সত্যকার স্বপ্ন' হয়, শেষ পর্যন্ত পাঁকের পাক তিনি অতিক্রম করতে পারবেনই; সংসারে থেকেও তিনি অখণ্ড-প্রাণের টানেই স্বার্থ সর্বস্বতার বৃত্তকে কাটিয়ে সন্ন্যাসের উদারভূমি স্পর্শ করতে পারবেন। এইভাবে খণ্ড থেকে অখণ্ড 'হওয়ার' যাত্রাই যেমন কবি সাহিত্যিকের তেমনি বিজ্ঞানীর তীর্থযাত্রা। আপন ব্রতের পূর্ণাঞ্জলি এইভাবেই দিতে হয়, লক্ষ্যবস্তু এইভাবেই পেতে হয়।

যেতে যেতেই যাত্রী 'হয়ে ওঠে'। অর্থাৎ যা কিছু আমরা করি, তার সার্থকতা হওয়ার মধ্যে, করার বাহুল্য বা বৈচিত্র্যের মধ্যে নয়। কোন করা-ই করা নয় যদি তা আমাদের যুক্ত, আরও যুক্ত না করে; খণ্ডচিন্তা খণ্ডজীবন থেকে অখণ্ড চিন্তা ও অখণ্ড জীবনের যাত্রায় এগিয়ে না দেয়। অধিকাংশ কর্মব্যস্ত মানুষের জীবনেই ওই 'হওয়ার' চেতনা ও তাগিদ নেই; তা-ই জীবনভর ভুরি পরিমাণ কর্মের অঙ্ক জমলেও আসলে জীবনের খাতাটি শূন্যই থেকে যায়। তৃপ্তি ও প্রাপ্তি দুদিক থেকেই নিষ্ফলতা, মরুর নীরসতা। কত 'করেও' এতটুকু না 'হতে' পারার এই ব্যর্থতা যে কী নিদারুণ, কী মর্মান্তিক তার দহন, ভুক্তভোগীরা যদি তা লিখে রেখে যেতেন, এই পৃথিবী চোখের জলে ডুবে যেত। চোখের সামনে মাঠভরা ফসল শুকিয়ে গেলে চাষীর বুকে যে আর্তনাদ ওঠে, নিরঙ্কুশ বিষয়ীর কর্মব্যস্ত জীবনেও বিষের উদ্গারে সে-আর্তনাদ অবশ্যম্ভাবী।

এবং আমাদের 'হয়ে ওঠা'র সাধনায় আমরা শুধু 'ফুলেরই মত' হয়ে উঠতে চাইব। শতদলের প্রস্ফুটনের মতই জীবনকে শতধারে উৎসারিত করাই 'হয়ে ওঠা'। আবার একদিন এই পূর্ণ-বিকশিত পদ্মই সম্পূর্ণ আত্মবিচ্ছেদের মধ্যে ঝরে পড়ে। আসলে এই নিবেদন হচ্ছে বৃহত্তর ও মহত্তর প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন সত্যে প্রতিষ্ঠিত করা। গাছের ফুলই তখন দেবতার অর্ঘ্য হয়ে ওঠে। এই নিবেদন বা সমর্পণ ভাবনাই কর্মের প্রবৃত্তির মধ্যেও নিবৃত্তিকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলে, তাকে জাগিয়ে রাখে। এই নিবৃত্তি আসলে নতুনতর ও বৃহত্তর প্রাণে পৌঁছুবার প্রবৃত্তি, বেড়া ভাঙবার ক্রমবর্ধিত ব্যাকুলতা।

নিজের বলতে কিছুই যখন তার থাকে না, যখন সে লুটিয়ে পড়ে তখনই যেমন ফুল সকলের হয়, দেবপূজ্য পরিণতিতে ধন্য হয় তার জীবন জীবনদানে, সংসারী মানুষের জীবনেও হুবহু সে-কথা সত্য। 'করা' যখন আত্মপরতার বেড়া ভেঙে পরার্থপরতার আঙিনায় প্রবেশ করে, তখনই তা 'হওয়া'র ধর্ম অর্জন করতে থাকে। বিশ্বস্রষ্টার অনবদ্য নির্মাণ কৌশলেই কোন প্রাণেরই বিচ্ছিন্ন বিকাশের সুযোগ নেই: আছে সকলপ্রাণের সংযোগে, বিশ্বযোগে বিহারের বিপুল অবকাশ। যে-কর্মে এই সার্বিক প্রাণের পটভূমি আছে, সে-কর্ম সঙ্কীর্ণ স্বার্থের চাপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, সে-কর্ম যতখানি 'করা', ততখানি 'হওয়া'ও।

স্বজন-পরিজন ছাড়াও গাছপালা, পশু-পাখী এরাও আমাদের আপনজন, আমাদের প্রতিবেশী। প্রাণের বেদন ও প্রতিবেদন এদেরও আছে—শুধু এদের ভাষাটা আমাদের সকলের অধিগম্য নয়। এদের বাদ দিয়ে মানুষের প্রতিবেশ নয়, সুতরাং মনে রাখা দরকার, যখন আমরা 'হয়ে' উঠতে যাই, তখন সেই তপস্যার মধ্যে এদের অস্তিত্বও মানুষের তুলনায় কিছু কম সত্য নয়। যথার্থই কোন প্রাণবান মানুষও আকৃতির বিচারে প্রাণের তারতম্য করেন না।

অতএব, আমাদের ক্ষুদ্র সংসারকে বৃহৎ জগতে উত্তীর্ণ করতে হলে প্রাণের বিস্তারই হচ্ছে তার নীতি। এই নীতিরই ব্যবহারগত পদ্ধতি হচ্ছে দুর্বল, অসহায়, অবোধ প্রাণের সেবা। তাই তাঁর সহকর্মিদের গান্ধীজী একটিমাত্র 'মাদুলী'ই দিয়েছিলেন। সেটি হল: 'কোন কর্মের ভাবনা মনে জাগলেই মনে মনে চিন্তা করবে সেই মানুষটির কথা, তোমার জানা-চেনা জগতের মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্গত, যে সবচেয়ে নীচে, সবচেয়ে পিছে। এবং যদি মনে করো তোমার কবলিত কাজ তার এই দুর্গতি মোচন কিছুমাত্র সহায়তা করবে, তাহলে নিঃসংশয়ে এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে।' যে-কোন বিজ্ঞানসম্মত নির্মাণের কৌশলও হল গোড়া থেকে গড়ে তোলা। একেবারে নীচুতলার মানুষের কাজে যখন আমাদের সেবা পৌঁছয়, তখন বুঝতে হবে, তা সমাজের সবার কাছেই পৌঁছেছে। সার্বিক প্রাণে পৌঁছবার পথ-পদ্ধতিই হল শুরুতে সবচেয়ে অবনত প্রাণটিকে আপন করে নেওয়া।

এই আপন করার মধ্যেই 'করা'র সার্থকতা, এবং শেষ পর্যন্ত ফুলের মত 'হওয়া'র মধ্যে 'করা'র যে কারিগর, তার অভীষ্ট পরিণতি। সর্বস্ব দিয়ে সর্বস্ব পাওয়ার প্রতীকরূপে ফুলের জুড়ি নেই। সূর্যমুখি তাই ফুলের অনাবিল আত্মপ্রকাশের শক্তি: পাঁকের মধ্যে থেকেও পদ্মের নিরন্তর গতি ঊর্ধলোকে। তাঁর কর্মকেও অনন্তের সুরে বেঁধেই সংসারী সন্ন্যাসী হওয়ার গৌরব অর্জন করে থাকেন।

———

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ—সন্তজনের উপলব্ধিতে

স্বামী মৃগানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ সম্বন্ধে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী তাঁদের অনেক গভীর গোপন উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে। আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সাধু সম্মেলনেও স্বনাম ধন্য বহু সাধুসন্ত তাঁদের অপূর্ব অনুভূতির কথা বলেছেন অকুণ্ঠ চিত্তে অকম্প্র কণ্ঠে। শ্রীঠাকুরের পুণ্য পঁচাত্তরতম জন্মবাসর উপলক্ষে এঁদেরই কিছু উক্তি সংকলন করে নিবেদন করি এই পুষ্পার্ঘ্য।

"শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ ছিলেন আধিকারিক পুরুষ। তিনি সত্যকে অর্জন করেছিলেন, প্রকাশ করেছিলেন। আমার সঙ্গে সত্যানন্দজীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। বহুবার এসেছি এখানে, বরানগরে, সিউড়ীতে। তাঁর প্রীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করছি, তাঁর প্রেমালিঙ্গন অন্তরে অন্তরে অনুভব করছি। সত্য যিনি, আনন্দ যিনি, তাঁর বিলোপ নেই। সত্যানন্দ চিরকাল বিরাজমান থাকবেন। সাধারণ জগতে যারা আছে– তাঁর কথা স্মরণও করে না—তাদেরও তিনি উদ্ধার করবেন।"—

—[**স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী**। নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম]

"অপূর্ব তাঁর (স্বামী সত্যানন্দের) ত্যাগ···সেই অসাধারণ ত্যাগ করেছেন বলেই তাঁর ত্যাগ-মাহাত্ম্যে গঙ্গা-তীরের এই সুন্দর আশ্রম, বীরভূমের নানা আশ্রম গড়ে উঠেছে। অসাধারণ ছিল তাঁর পবিত্রতা, তাঁর ভালবাসা, তাঁর তপস্যা, সব বিষয়েই তাঁর গভীরতা। তাঁর প্রতিভা ছিল অনন্য। তাঁর গুণ অনেক। মানুষটি তিনি কেমন ছিলেন সে কথাও ভাববার মত। মানুষ সত্যানন্দের অনুসরণ করুন, তাহ'লেই কল্যাণ হবে। এই সুন্দর মহান জীবন সকল সাধু সমাজের অনুকরণীয়।—

—[**স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (রবি মহারাজ)**। বেলানগর, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম]

"স্বামী সত্যানন্দজী আমার ভাইয়ের মত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ত্যাগী ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি এমন ক'রে নিজেকে চেপে রাখতেন, সে কথা ভাবতে চোখে জল আসে।"—

—[**স্বামী সত্রূপানন্দ** (শান্ত মহারাজ) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা]

"তিনি মহান পারাবার—ভাষা দিয়ে কতটুকু প্রকাশ করা যায়—তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর। তাঁর আসার কারণ জানি না, জানি না কে এসেছিলেন। তবে মনে পড়ে রামকৃষ্ণদেবের সেই ইচ্ছার কথা—আবার আসতে হবে। যে যাকে চিন্তা করে তার সত্তা পায়। ঠাকুর সত্যানন্দ দিবারাত্রি নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-অভেদানন্দকে চিন্তা করেছেন আজীবন। তাই তিনি তাঁদের সত্তায় সত্তান্বিত হ'য়ে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মত্ব পরিসমাপ্তি হ'য়েছিল তাঁর। তিনি ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ, শুদ্ধ সাত্ত্বিকতার প্রতিমূর্তি, নির্বিকল্প রাজ্যে ধাবমান মনকে শিশু সঙ্গে, গোপালের সঙ্গে লীলা ক'রে সাধারণের কল্যাণে নামিয়ে রেখেছিলেন। তিনি যোগ সাধন করেছেন স্বর্গের সাথে মর্ত্যের, সন্ন্যাসীর সাথে গৃহীর। উদারতার প্রতিমূর্তি তিনি সব সাধুদের আমন্ত্রণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রেমের স্পর্শে কত পাষাণ হৃদয় গলে গেছে, জ্ঞানের আলোয় কত হৃদয় আলোকিত হয়েছে—তাঁর দুয়ার সবার কাছে উন্মুক্ত ছিল।"—

—[**স্বামী অমলানন্দ**। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম, সোদপুর]

"বিভুপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের হৃদয় ছিল অফুরন্ত করুণার উৎস। কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির বিবিধ রক্তরেখায় তাঁর মহান প্রাণপদ্মটি বিকশিত হ'য়ে উঠলেও দেখা যায় প্রেমই সেই বিকাশের মূল সূত্র বা উৎস।"

—[**শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মচারী**। দক্ষিণ বাংলা সারস্বত আশ্রম]

"স্বামী সত্যানন্দের সমস্ত শিক্ষা তাঁর নিজ জীবনে আচরিত। সত্যানন্দদেব শুধু তত্ত্বজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তত্ত্বদর্শী, শুধু academic knowledge নয়, তাঁর ছিল realisation তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমি সে কথা বুঝেছি। তাই তাঁর প্রতি এত আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তিনি ছিলেন যেন bridge between ancient and modern."—

—[**স্বামী শুদ্ধানন্দ**। হিন্দু মিশন]

"আমি তো তোমাকে গোপালই দেখছি বাবা (শ্রীঠাকুর সত্যানন্দকে সম্বোধন ক'রে), তবু পারলাম না—আর ভাবলাম সিউড়ির মত জায়গায় এ আবার কি ? এসে দেখি সত্যিই বাবা গোপাল আমার এখানে নব বৃন্দাবনের সৃষ্টি করেছে। সিউড়ির মহাভাগ্য ভিন্ন আর কি। ....সেই তো! সেই ছোট্ট ছোট্ট হাত দুখানি, ছোট পা দুটি, ছোট সুন্দর কচি মুখখানি, সব স-ব ছোট্ট... ! যেখানে তুমি সেইখানেই যে বৃন্দাবন বাবা গোপাল !' —

—[বৃন্দাবনের সিদ্ধ সাধিকা **সরোজিনী মা**।]

"এ যে একেবারেই সেই রামকৃষ্ণ মাখা !"— —[**শ্রীদুর্গা মা**। সারদেশ্বরী আশ্রম, কলিকাতা]

"স্বামী সত্যানন্দ শুধু আশ্রম জীবনেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি প্রবর্ত্তন করেছেন বিভিন্ন কল্যাণ কর্ম্মের। আমি বিশ্বাস করি আজকের পৃথিবীর এই হিংসা সংঘাত দাবানল প্রশমিত হবে তাঁর কৃপায়।"

—[**স্বামী প্রেমানন্দ**। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ]

"ঠাকুর সত্যানন্দ সম্বন্ধে যা জেনেছি তাতে মনে হয়, ঠাকুর রামকৃষ্ণই সত্যানন্দ স্বরূপ। ঠাকুর সত্যানন্দকে দেখে, তাঁর গুণাবলী দেখে, তাঁর জীবন অনুশীলন করে নিঃসন্দেহে বলা যায়—যিনিই ঠাকুর রামকৃষ্ণ তিনিই ঠাকুর সত্যানন্দ। রামকৃষ্ণ সত্যানন্দের মধ্যে কোনও ভেদ নাই।" —

—[**স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী**। হৃষিকেশ সাধন কুটীর]

"আমি কায়মনোবাক্যে এই কথা বলছি— তিনি যেতে পারেন না, তিনি রয়েছেন, তোমাদের মধ্যেই তিনি রয়েছেন—এ আমার উপলব্ধি। এখানে তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই তিনি রয়েছেন। এখানে এসে দেখলাম...সত্যি দেখলাম গোপাল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর পাদ-পদ্মে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ কর। ...গঙ্গার ঐ কূলের মঠের খ্যাতি যেমন জগদ্ব্যাপী, তেমনি এপারের কীর্তি একদিন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।"—

—[**স্বামী অসিতানন্দ**। অধ্যক্ষ, শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ]

অশ্রু

ডাঃ পতিতপাবন মিত্র

"নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল"—কিন্তু সব নয়নের জলই কি ফুল? নিশ্চয়ই নয়। যে মূল্যবান অনুভূতিতে অশ্রু নির্গত হয় সেই অনুভূতিই "ফুল সুন্দর"।

Physiologically যে ক্রিয়ায় অশ্রু নির্গত হয় সেই সমস্ত ক্রিয়াই ফুলের মত সৌরভ পূর্ণ নয়। আমাদের প্রতি চোখের বাইরের দিকে একটা করে গ্রন্থী (lacrymal gland) থাকে। সেখান থেকে অশ্রু সর্ব্বদাই উৎপন্ন হয় ও আপনা আপনি চোখবন্ধ করা ও খোলার জন্য capillary action এ সেই জল lacrymal duct দিয়ে নাসিকা অভ্যন্তরস্থিত একটি blotting paper এর মত পদার্থে শুষে যায়। চোখের জলের কাজ হোল conjunctiva বা চক্ষু আবরণীকে শুষ্ক বা অস্বচ্ছ হতে না দেওয়া। কোন কারণে এই আবরণীর প্রদাহ হলে (conjunctivitis) বেশী জল পড়ে যার কিছুটা নাসিকা বা সোজাসুজি বাইরের দিকে গড়িয়ে পড়তে পারে। তাহলে চক্ষু আবরণী বা দৃষ্টি শক্তি রক্ষা করে বলেই কী এর নাম মুক্তা? না, এই অশ্রুর সংগে অন্তরের মুক্তা সম মূল্যবান কোণ অনুভূতির যোগসূত্র বর্তমান যখন থাকে তখনই শুধু অশ্রুকে মুক্ত বিন্দুসম বলা হয়। কোন ঘটনায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বর্গ থেকে এককভাবে বা মিলিত ভাবে উৎপন্ন তড়িৎ প্রবাহ মস্তিষ্কে যায় ও মস্তিষ্কের নির্দ্দেশে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কতক গুলি ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ইচ্ছাকৃত (voluntary) বা অনিচ্ছাকৃত (reflex)। আমাদের চোখে অশ্রুধারা নির্গত হওয়াও তাই। চক্ষুর কোন পীড়া অর্থাৎ চক্ষু থেকে উৎপন্ন তড়িত প্রবাহ মস্তিষ্কের নির্দ্দেশে যদি অশ্রু নির্গত করে সেটা শুধু চোখের জল বলব। কিন্তু এই তড়িৎ প্রবাহ যদি অন্তরে সৃষ্ট হয় অর্থাৎ অন্তরের অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নির্গত হয় তখন এর নাম কান্না। কান্না সব সময়ই reflex বা আপনা আপনি হয়।

আমরা অভিনয়ের দৃশ্যাবলীতে নিজেদের অস্তিত্ব ভুলে নাটকের পরিবেশের সংগে একাঙ্গীভূত হয়ে হাসি অথবা কাঁদি। ছেলের বিয়ের মত আনন্দের দিনেও মা কাঁদেন হয়ত শোকাবহ কোন পূর্ব্ব ঘটনার স্মৃতির রোমন্থনে। স্মৃতির টুকরোগুলো অতীতের অসীমে হারিয়ে যায় ও ফিরে পাবার আর উপায় থাকেনা, তাই বার্দ্ধক্য কাঁদে যৌবনের স্মৃতিতে, যৌবন কাঁদে শৈশবের স্মৃতিতে। 'শ্রাবণ কাঁদে ফাগুনের স্মৃতিতে"—যেন বৃদ্ধা প্রকৃতি বর্ষারূপে কাঁদে যৌবন ভরা বসন্তের বিরহে।

জীব ও জড় জগতের প্রতিটী অণু পরমাণু সমধর্ম্মী বা বিপরীত ধর্ম্মী অণু বা পরমাণুর সংগে মিলনে অভিলাষী, সেই মিলন বাধা প্রাপ্ত হলে হয় বিফলতা বা হারিয়ে যাওয়ার কান্না, আমি বিষয়ী অথবা বিষয়ের সংগে আমার প্রেম, বিষয় হারিয়ে গেলে হবে বিফলতার কান্না। খেলায় হেরে গিয়ে বা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়েও আমি কাঁদতে পারি। আমি ডাক্তার, রোগীর কষ্টে বা মৃত্যুতে আমি কাঁদতে পারি। সাগর—কাঁদে

'উতল সাগরের অধীর ক্রন্দন
নীরব আকাশের মাগিছে চুম্বন"

বার্দ্ধক্যে হা কৃষ্ণ বলে কাঁদা ছাড়া কোন ভাষা নাই। মধু প্রেমী ভ্রমর কাঁদে ঝরা পুষ্প দেখে। আলো প্রেমী পতঙ্গ কাঁদে নিবে যাওয়া আলো দেখে। সাঁঝের আকাশ কাঁদে উষার অরুণাভার বিরহে। বিজয়া দশমী কাঁদে আগমনীর বিরহে।

ফাগুন বিরহে শ্রাবণের নয়ন কোণের ভাষা
"কাঁপিছে দেহলতা থরথর
চোখের জলে আঁখি ভরভর...."

কল্পনায় ডাকে

"ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়া তরীর মাঝি
অশ্রুভরা পূরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি

অন্তরে জাগে ক্ষীণ আশা

"যেন বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে
বাধা লঙ্ঘনে দিবনা আমি ফাঁকি...."

দিশেহারা হয়ে ডুকরে কেঁদে বলে

"......তুমি আবার এসো আবার......"

কিন্তু পূর্ব্ব দুঃখ ভরা স্মৃতি যেন আবৃত্তি করায়

"....আজকে তোমার আসার পথে
অনেক কাঁটার ব্যথা......"

তাই হয়ত বা ফাগুন বিরহী কোন শ্রাবণের আকুতি—

....তব শ্রীচরণে একটি মিনতি এসোনা—
...দুঃখ আঘাতে ব্যথিত হইতে
আর প্রভু তুমি এসো না।

এই বিরহের কান্নায় কিন্তু আনন্দও আছে; যেন প্রেমময়ের সুখের জন্য শান্তির জন্য ত্যাগেই এ কান্নার আনন্দ। স্ত্রীর চোখে এই আনন্দাশ্রু বয় স্বামীর প্রমোশনে। ছেলে পাশ করলে মা কাঁদেন।

সহানুভূতির কান্নাও আমরা জানি বা কাঁদি, তাই

"দণ্ডিতের সাথে কাঁদে যবে
দণ্ডদাতা সমান আঘাতে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার"

আর আছে অনুতাপের কান্না ক্রীষ্টান ধর্ম্মে যার নাম confession ও ইসলাম ধর্ম্মে যার ভাষা "হায় হাসান হায় হোসেন।"

সমধর্ম্মী প্রেম বা সখ্য (between molecules) প্রভু ভৃত্যের প্রেম বা দাস্য, মাতা পুত্রে প্রেম বা বাৎসল্য বিপরীত ধর্ম্মী প্রেম (magnet and iron) এই সমস্ত বিভিন্ন রসের প্রেম ছাড়া আর একটা প্রেম আছে সেটা জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেম। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই প্রেম এবং সার্থক এই মিলনাকাঙ্খার আকুলতার কান্না। এই ভাবাবেগের বা উচ্ছ্বাসের অশ্রু বিন্দুই "আঁচল ভরা ফুল"—পূজার শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। সেই নীরই নাভিস্থল মথিত হয়ে মোহরূপী শিবের জটাজুটের বন্দীত্ব থেকে কলুষ নাশিনী সুরধুনীর মত প্রবাহিত হয় ও সেই অশ্রুনীরই অমূল্য রতন। হারিয়ে যাওয়ার বা বিফলতার কান্না অথবা বিভিন্ন দুর্দ্দশা দেখে সহানুভূতির কান্না আমরা কাঁদবো কেন। যাঁর ইচ্ছায় সমগ্র সৃষ্টি, যাঁর ইচ্ছায় প্রেম বিরহের লীলা বিলাস—সুখ দুঃখের হাসি কান্না, তাঁরই করুণা গঙ্গা প্রবাহিত করার জন্যই শুধু কাঁদবো অন্যথায় অন্তরের জীবাত্মার ক্রন্দনও পরমাত্মার সহক্রন্দনের জন্য দায়ী হবে আমাদের ত্রুটীপূর্ণ পদক্ষেপ। সে আবেগের গলিত প্রবাহে মানুষ আপন অস্তিত্ব ভুলে যায়। সে উচ্ছ্বাসের জোয়ারে মোহময়ী যোগমায়া পথ ছেড়ে দেন। সেই মহাভাবের যোগ্যতা কী আমরা অর্জ্জন করতে পারবোনা, যদি সম্বল হয় শুধু মাত্র এই অশ্রু? মন্ত্র, পুষ্প, পূজা উপচার সবই যেখানে মহাভাবের অশ্রু, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের শ্রীচরণে শাস্ত্রের শস্ত্র কী সেখানে মুল্যহীন নয়? বৃষ্টির জলে আবর্জ্জনা দূরীভূত হওয়ার মত—মনের কালিমা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে অসহনীয় শ্রাবণ রাত্রি—ফাগুনের সোনা ঝরা শান্ত সকালের মত সৌরভময় হতে পারে একমাত্র প্রেমেরই এই অশ্রুনীরে।

ধর্ম্মের গ্লানি এলে শ্রীভগবান বারে বারে এসেছেন, কেঁদে কেঁদে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে আমাদের কাঁদতে শিখিয়েছেন ও ভুলে যাওয়া পরমাত্মাকে চিনতে শিখিয়েছেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে তিনি নীল কৃষ্ণ চরণে লীন হবার বাসনায় সুনীল সমুদ্রের আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছেন।

তাইতো আজও কৃষ্ণভক্তের গানের ভাষা

"শূন্যপ্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর
দীনবন্ধু দয়া সিন্ধু প্রেম বিন্দু—কাতরে করো দান"

বীরভূমের বাউলরূপী ভক্তের কণ্ঠে বাজে

এ প্রাণের একতারাতে, এ আঁখির দুঃখ ধারাতে
ফোটে তোর শরণ মুকুল গো"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রূপে তিনি মা-মা করে কেঁদে কেঁদে ধরার গরল কণ্ঠে ধারণ করে লীলা সংবরণ করেছেন। তাই মরমী কবির গানের ভাষা—

"প্রাণের ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর আবার ফিরে এসো
যাবার বেলা গেছ বলে আসবে আবার চোখের জলে
এসো তেমনি প্রেমানন্দে ভেসো"

কান্না ভরা আকুলতা নিয়ে ভক্ত কাঁদে

"কোথা তুমি নারায়ণ কেঁদে বলে দু'নয়ন"

তাই তিনি আবার এসেও ছিলেন ভক্তের অশ্রু ভেজা আকৃতির এই আকর্ষণে, সেই ফাগুনেরই আর একটী দিনে, যেদিন ভক্ত কণ্ঠে বেজেছিল—

'রূপশিখাঞ্জনে এসেছো জ্যোতির্ময়

মুগ্ধা ধরণী আনত চরণে নয়নে অশ্রু বয়"

চিরদিনের ও আজকের ভক্ত সাধারণের প্রার্থনা গীতি—

"কত গান তুমি গেয়ে গেছ হরি কথার ছড়ায়ে মানিক

স্মরণের মালা গেঁথে নিছি আজ

আঁখি জলে বুক ভরিয়ে"

আজকের বিশেষ প্রার্থনা—

"জীবন মরণের আর কিছু নয়, আর কিছু নাহি চাহি

শুধু তব কৃপা হে বিশ্ব বিধাতা

শুধু তব পথ বাহি চলিতে আমারে দিও

দিও এই নয়নে দুটি অশ্রুল কথা"

তৃপ্তিভরা কান্নার আবেগে বলতে চাই—

এতদিনে জানলেম যে কাঁদন কাঁদলেম সে কাহার জন্য

ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য।"

আমরা আজ যে ভগবানের দেহ ধারণের দিন উদযাপন করতে চলেছি তাঁর উদ্দেশ্য বলি

"কথার কুসুম ফুটিয়ে ছিলাম তোমার চরণ ঘিরে

হাসির সোনায় গাঁথা সে নয় ভেজা নয়ন নীরে"

আজও তিনি আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় চির জাগ্রত ধন—যে ধনের শ্রীচরণে লীন হবার আশায় আমরা আজ সবাই উদগ্রীব। তাঁর তিরোধন নাই। যতদিন আমাদের ভালবাসা তাঁকে চাইবে ততদিন তিনি নিশ্চয়ই প্রেমময় রূপে ধরা দেবেন। কল্পনায় রূপ দিতে গিয়ে হয়ত বা ফেনিয়ে উঠছে একটা চাপা কথা তবু বলি—

চরণ পরশ বিরহ জ্বালায় চাহি অহরহ জ্বলিতে

সজল নয়নে আর্ত্তি চরণে (এ) দীন চাহে লীন হইতে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন—

"আমার শেষের শতদল, শুধু দুটী ফোঁটা জল

তার একটু খানি হবে না কী চরণে সফল ?"

আমি বলি, হবে হবে, সফল হবেই যদি সেই জলের ফোঁটা দুটী তাঁরও দুটী ফোঁটা আনন্দাশ্রু ঝরাতে পারে। শেষ নাগ শয্যায় তিনি ঘুমন্ত নন—তিনি আমাদের চির জাগ্রত করুণাবতার।"

গান ও স্বরলিপি

কথা : শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

সুর ও স্বরলিপি : শ্রীপ্রবীর মজুমদার

ফাগুন তোমার সবুজ সুতোয়
গাঁথা সোনার দিন
আমি দেখেই বুঝেছি
আলো দিয়ে শুধবে এবার
আঁধার যুগের ঋণ
আমি বুঝেই রেখেছি ॥
আকাশ বলে মাটিকে আজ
আমার পানে দেখো
(কিসের) ভাষা আমার চোখে
বাস্তবেরি খাতায় আঁকা
কল্পনা রঙীন
আমি দেখেই চিনেছি ॥

কৃষ্ণা তিথির মন কি
শুধু আঁধার দিয়ে গড়া
কোথায় পেলে ভরা চাঁদের সাড়া।
সাঁঝ সকালের মোহনাতে
দাঁড়িয়েছে এই ক্ষণ
এখন আসছে যুগান্তর
প্রতীক্ষারি শেষে পাব
কার সে চরণ চিন
আমি জেনেই ফেলেছি ॥

|| স — গ — | — — গ ম | — — প ধ | — র্সণ ধ প |
ফা ০ গু ন | ০ ০ তো মা | র ০ স বু | জ সু তো য় |

| — — ণ ধ | প ধ মপ ম | ম — — — | — — জ্ঞমজ্ঞ রণ্ |
০ ০ গাঁ থা | ০ সো না০ র | দি ০ ন্ ০ | ০ ০ আ০০ মি০ |

| — — স গ | — মপ গম গ | গ — — — | — — — — |
০ ০ দে খে | ই বু০ ঝে০ ০ | ছি ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

— — প প | — প প — | প — প মপর্স | — র্স র্স প |
০ ০ আ লো | ০ দি য়ে ০ | শু ধ্ বে ০০ | ০ এ বা র |

| — — প প | দ দ দ ণ | পদ পণ দ — | — পদপ ম গ |
০ ০ আঁ ধা | র যু গে র | ঋ০ ০০ ০ ০ | ণ্ আ০০ মি ০ |

| ম র রগ র | র ম ম ম | ম — — — | — — — — ||
০ ০ বু০ ঝে | ০ ই রে খে | ছি ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ||

|| — — র্স র্স | — র্স র্স ম | ম — ম — | — গ ম — |
০ ০ আ কা | শ ব লে ০ | মা ০ টি ০ | ০ কে আ জ |

| — — ণ ণ | — ণ ণ র্স | র্স — র্স প | — প প — |
০ ০ আ মা | র পা নে ০ | দে ০ খো ০ | ০ কি সে ০ |

| মপ ধ ধ ধ | — ণর্স ধণ ধ | ধ — ধ — | — — — — |
০০ র ভা ষা | ০ আ০ মা০ র | চো ০ খে ০ | ০ ০ ০ ০ |

[ম — গম পণ দপ মপ ম —]

{|| — — ণ্ — | স গ গ — ম — গম পদ | ঃপ মপ ম — |
০ ০ বা স্ | ত বে রি ০ খা ০ তা০ ০০ | য় আঁ০ কা ০ |

| — — দ — | দ দ — দণ | পদ পণ দ — | — পদপ ম গ |
০ ০ ক ল | প না ০ র০ | ভী০ ০০ ০ ০ | ন্ আ০০ মি ০ |

| ম র রগ র | র ম ম ম | ম — — — | — — — — ||
০ ০ দে০ খে | ০ ই চি নে | ছি ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ||

|| — — ধ্ — | স র সর গম | ম — মগ রগ | পম গ পম জ্ঞ |

|| ০ ০ কু ন্ | ণা তি থি ০র | ম ন কিং ০০ | ০ শু ধু ই |

| — — জ্ঞ র | স স ধ্স র | র র — — | — — — — |

| ০ ০ আঁ ধা | র দি য়েং ০ | গ ড়া ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

| — — ণ্ র | — ম ধ — | ম ধ ধ র্স | র্ র্স ধ ম |

| ০ ০ কো থা | য় পে লে ০ | ভ ০ রা ০ | ০ চাঁ দে র |

| জ্ঞ — জ্ঞ — | — — — — ||

| সা ০ ড়া ০ | ০ ০ ০ ০ ||

||: — — র্স — | র্স র্স র্স ম | ম — ম — | — গ ম — |

|| ০ ০ সাঁ ঝ | স কা লে র | মো ০ হ ০ | ০ না তে ০ |

| — — ণ ণ | ণ ণ ণ র্স | র্স — র্স প | — প প — |

| ০ ০ দাঁ ড়ি | য়ে ছে এ ই | ক্ষ ০ ০ ০ | ণ এ খ ০ |

| মপ ধ ধ ধ | ধ ণর্স ধণ ধ | ধ — ধ — | — — — — |

| ০০ ন আ স্ | ছে যুং গাং ন্ | ত ০ র্ ০ | ০ ০ ০ ০ |

| — — ণ্ স | — গ গ — | ম — গম পদ | :প মপ ম — |

| ০ ০ প্র তী | ০ ক্ষা রি ০ | শে ০ যেং ০০ | ০ পাং বো ০ |

| — — দ — | দ দ দ দণ | পদ পণ দ — | — পদপ ম গ |

| ০ ০ কা র | সে চ র ০ণ | চিং ০০ ০ ০ | ন্ আ০০ মি ০ |

| ম র বগ ব | ব ম ম ম | ম — — — | — — — — ||

| ০ ০ জেং নে | ০ ই ফে লে | ছি ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ||

গানের সুরে সুরে আপনাকে তাঁর চরণে লীলায়িত করাকে বলে সুরযোগ। সুরশিল্পীদের এতে সুবিধা হয়।

—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব

The Master Symphony-maker is the Supreme Bethoven who is playing this Cosmic Orchestra. One who can find out his own note from the beginning is a real rhymer.

Sree Sree Thakur Satyananda

ENGLISH

ORIENT PAPER MILLS LTD.

Manufacturers of :

QUALITY PRINTING-WRITING, PACKING-WRAPPING PAPERS
AND PAPER BOARDS. ALSO MANUFACTURE
SUPERIOR QUALITY 'ORMO' BRAND
AMMONIA PAPERS AND
POLYTHENE COATED PAPERS AND BOARDS.

Mills : BRAJRAJNAGAR-768216 ;
AMLAI-484117

"FOR FAST MAIL ALWAYS MENTION
POSTAL PIN CODE"

Birthday Blessings

from the immortal pen of

Sreemat Swami Satyananda Dev

A dew bud prays high demure
Make me good Oh! make me pure.
It had all Sun and had the showers
All for good and Heaven's dower.
Days wore on, it blushed serene
The sky above in bluey gleam.
A prayer and a will for good
All we need and all we should.

Advent Of Immortality

[*English rendering of* **Sri Archanapuri's** *Bengali poem* **"Amrita Avyudaya"** *by* **Sri Jyotsna Nath Mallik**]

Oh night speak more softly
Lamp you flicker not a bit
Forgetfully in southwind's restlessness,
Don't you hear ?
From the other side of the finite sky
Perhaps an eternity has broken silence
that is what is unuttered music
There you hear comes floating......
comes floating the profound tremor of the tune
the True the Good the Beautiful
All the mechanical tumult of that dark epoch
is awaiting in suspense
an improbable possibility......
Oh present, you forget yourself
in this timeless moment
forget your bloodstained strides
stop — stop your march
in the majesty of a joyous tranquil forgiveness
make this moment glorious
Oh men ! today on the second day of the new moon
in this supreme hour
for once you be immortals
welcome this auspicious moment in Vedic chants
say—we are not the children of death
we are the children of immortal bliss
Say—the brimming cup of nectar is in our hands
there the beam of bliss of the Upanishads is incarnate
He who beams in beatific beauty......
can't you see ? the immaculate manifestation
of the True the Good the Beautiful
Today is the sacred birthday of Satyananda
let us do obeisance
to this advent of immortality
Glory be to Satyananda.

World Psychology

Sreemat Swami Satyananda Deva

[In the previous issue, the author continued his discussion about "Modern Child Psychology" of A. H. Bowley, dealing with vocalisation, intellectual life in babies, perceptual development, development of movement and locomotion, fine motor co-ordination and visual perception.]

The speech developmn

The babbling and crowing are so many vocal plays of the child. The appreciation from the adults give him an incentive to new sounds. By ten months he can use one word significantly and by twelve he can do three or four distinguished words.

Language development :

It depends on a good cultural environment, a good pattern of adult speech and normal encouragement. High intelligence also is useful. Girls talk earlier and their vocabulary increases rapidly. They have advantageous position about linguistic development. The vocabulary of the child develops very slowly after one or two words are learnt. But at the nineteenth month the learning grows apace The first words learnt are sentence words—one word uttered for a whole sentence.

For the children, interjections, nouns and verbs are easily learnt. Later on adverbs and adjectives are learnt and conjunctions, prepositions and relational elements appear on the last phase. Children brought up in institutions can talk later than individually cared children in favourable homes. Stimulating attitude of the superiors and a favourable home environment leads to a better learning of speech. Two to five years are the golden age of speech learning.

Social Emotional Development :

Parents are the first focal point of emotional relationship of a child. The next important emotional attitude is towards his brothers and sisters. In case of keen jealousy and rivalry when the question is sharing the parental love there is conflict and repression means spending undue energy.

Generally the boys have devotion towards their mother and antagonism to their father. The opposite is the case with the girl and this appears highly between two to four years.

A child's relationship to adults may be summed up as his dependence up to eighteenth month—their independence up to three years and cooperation up to four His relation to other children is aloofness up to two years ; it is aggressiveness up to three and friendly up to four.

Intellectual growth :

With the growth of social and emotional nature the child is more concerned with this environment than with his own self His questions, his manipulative interests are the result and he needs opportunity to satisfy these A dull child plays longer, talks slower and thinks less quickly, is less alert and less interested with his environment. Three things are handicaps to the young boy—a limited and non-encouraging environment, a poor physique and an emotional inhibition, that makes the child suffer undue strain or conflict.

The problems of the pre-school days :

Temper tantrums :

The parents have to control the high angry feelings. By the age of four these come not so often.

Destructiveness :

This is due to the child's willingness to learn the how and why of things. These may be also to seek relief of the repressed ideas of anger etc. against his parents.

Quarrelsomeness :

The child by this tries to adjust himself to the society.

Comfort habits :

The child may come to resort to these when he is bored, disturbed or meets with exacting circumstances.

Fears and anxieties :

These reflect the unconscious mind of the child. He needs free play to master these.

Play :

Play psychology has a long history. H. Spencer speaks of it as a channel through which the child tries to give an outlet of the abundance of energy.

K. Groos thinks of it as a preparation for life. S. Hall speaks of it as a recapitulatory theory. Fishing, hunting plays are of this kind. Montessori and Froebel thought that play has an education value. These are designed to teach him shapes, sizes, height, volume, sound etc. This makes him learn leadership, adapt himself to the playmates, learn to compromise, co-operate and withstand antagonism and defend property rights.

The earliest play is free muscular play done without any playmate. Manipulatory play is principally with things.

Destructive and constructive play :

In dramatic play the child gets valuable experience.

The school days :

Interests :

Children in the age from five to eleven show interest of various kinds, namely collection of marbles, wild flowers, train numbers and so on. These differ with boys and girls. Boys like games of speed and skill and constructional activities, climbing and athelatic feats, keeping animals, cycling, camping, ameteur engineering and scientific activities. Girls like less active pursuits of family and school play, dressing, decorating and simple handicrafts, simple needle works and knitting and games of chance and skill.

Their interests prepare their future life of hobbies but they may be for joy and feeling of power.

At seven years of age, they have interest in realistic stories, animal stories, stories about home life, fairy tales, funny stories and school stories. From nine to eleven years the children love heroic, mystic, and adventurous tales, myths, legends, elementary scientific stories and books on hobbies.

Abilities ;

Girls can learn language more rapidly than boys. Boys have greater interests in science, and attention for power. They like scientific experiments and feel interested in biological studies.

In intellectual development we find memory span for digits and sentence developing gradually with the growth of the child.

In order to apply the findings of child's psychological developments to education the following is worth reviewing. We find, intellectual development is related closely to emotional development. Intellectual activity goes hand in hand with manipulation in solution of practical problems. Again learning must bear some relation to child's natural interest. As the child's age both mental and chronological developes, his facility for handling abstract symbols increases. The memorising capacity of the child at this stage is very keen. We find a great difference in different children's rate of intellectual development.

Social Development :

Boys and girls choose to have friends of their own sex. This tie of friendship is something that is of common interest, such as cycling They form secret codes. This age is called the gang age. The scouts, brigades, guides and such other societies are of interest at this age. His growth of intelligence leads him to avoid interference.

Emotional Developments :

This is sometimes called the latency period in which the excessive emotional period is kept in control to a greater extent. During the period of five to seven the child learns school adjustment and he learns to tolerate unkindness, pinpricks and antagonism. Children sometimes come in open rebellion and the authorities should wisely handle them.

Thakur Swami Satyananda As A Writer of English Verse

Dr. S. P. Sengupta

Years ago I received an invitation from Ramkrishna Sevayatan, Baranagore on the occasion of the Puja. Along with the formal letter there was a poem in Bengali, that was a wonderful pen-picture of an autumn, when the sky was all blue and silver, and the flowers had burst into a crimson stain. The rhythm, the lilt of the verse, the striking picturesqueness, and above all, the soul of the poem captured my imagination, and I thought that the poet must be an extraordinary man, who was not a mere wizard of words, but something more. It was poetry that was analogous to the vedic Mantra. Poetry that regales the ears does nct vibrate in the memory. But Swami Satyananda's poetry—be it in English or Bengali, lifts us from the mundane existence, and transports us to the empyrean heights. It is about such poetry that Shri Aurobinda writes in his *Future of Poetry*.

"The true creator, the true hearer is the soul. The more rapidly and transparently the rest do their work of transmission, the less they make of their separate claims to satisfaction, the more directly the word reaches and sinks deep into the soul, the greater the poetry. Therefore poetry has not really done its work, at least its highest work, until it has raised the pleasure of the instrument and transmuted it into the deeper delight of the soul. A divine Ananda ……is that which the soul of the poet feels and which, when he can conquer the human difficulties of his task, he succeeds in pouring also into all those who are prepared to recieve it".

On reading Swami Satyananda's verse I have felt that he never thought of rhetorical devices—the only stock-in-trade of a number of poets. An immortal child of bliss, Swami Satyananda has the beatific vision, which is the rare gift of only the mystic poets. Such poetry has no striving after effect. It wells out of the soul in profuse strains of unpremeditated art. It is about such visionaries that Wordsworth writes:

> "We are laid asleep
> In body, and become a living soul".

William Blake had this rare vision:

> "The Poet's work is done...
> Within a moment".

Such poets plant their feet both in earth and heaven. Shelley, though not quite mystic, rightly felt that

"Poetry is indeed something divine. ··· A man cannot say, 'I will compose poetry'. The greatest poet even cannot say it; for the mind in creation is as a fading coal, which some invisible influence, like an inconstant wind, awakens to transitory brightness; this power arises from within;···and the conscious portions of our nature are unprophetic either of its approach or of its departure".

Even to a superficial observer it will

appear that Swami Satyananda's English verse—and at the moment we are concerned with what he has written in English alone, is something that was not on sea or land, but the consecration, and the poet's dream. To say that Swami Satyananda was religious is an understatement. For he has realised God. One who can write such verse is far above the average run of men. He is an embodiment of God, and the words that emanate from him can shake the world.

Religion and poetry are inextricably intertwined. Poetic experience and religious experience, says Amos Wilder, "are profoundly and intimately related to each other if not consubstantial, and religion requires poetry in its discourse". Religion leavens our daily life, and we are made to feel that we are not alone. The religion that Swami Satyananda envisaged is the furthest from parochialism. It is deeply embedded in the love of life—it includes man, god and nature—the ripples on the river, the bush green grass, the pearls of dew drops glistening on the leaves, the azure sky, the snow-clad mountains, the warbling of the birds. A true Vedantist, Swami Satyananda finds life and divinity in every atom, every particle of the earth. Nothing human is alien to him. He seems to be at the same time inspired by the incandescence of spiritual fervour. His poetry is the outpourings of the soul, and can compare favourably with that of Blake, St John of the Cross, or Jalaluddin Rumi. He establishes an easy contact with the ultimate Reality.

The poems of Swami Satyananda are invested with mystical glow. "The true mystic", says Caroline Spurgeon, "is one who *knows* there is unity under diversity at the centre of all existence, and he knows it by the most perfect of all tests for the person concerned because he has felt it. True mysticism—and this cannot be overemphasised—is an experience and a life. It is an experimental science··· In its highest consummation it is the supreme adventure of the soul : to use the matchless words of Plotinus, it is "the flight of the Alone to the Alone."

Swami Satyananda has the spiritual vision to see the Truth, which is the prerogative of the select few. He is waiting wistfully for the Lord of Lord, who manifests Himself

> On the song of mango grove
> The dance of love and life.

The Lord of Lord is Shri Ramkrishna Paramhansa, who is love incarnate, and brings about a harmony in life.

> The spring is love and lush
> The lily laugh that gush
> You see it right and why.

The poet finds in his Master the magic wand, whose touch instils life into the inanimate world.

> Don't you hark the cry
> The dried leaves heave out
> Seek ye doth a sapless sigh
> On the wintry bout
> In hushing shout.

A keen observer of Nature, Swami Satyananda gives a detailed description of the different aspects of the universe, which breathe and pulsate at the thought of the Master,

> And sing a song dale
> In panegyric hail

It is the poet's sincere conviction hatt

Nature is doing her quiet work only to please the Master.

Do you know
The silent Nile
That meander a while
To slake the Egypt
For whom it greaves.

The language of Swami Satyananda is always limpid, and never degenerates into obscurity. He never uses the traditional or private symbols like W. B. Yeats, T. S. Eliot or Mallarme. From this point of view he is to be compared with the Georgian poets, who were remarkable for their clarity and lucidity.

In the nineteenth century Wordsworth was once charged with having introduced certain words, not compatible with the conventional poetic diction. Swami Satyananda freely uses scientific terms to describe the play of the Lord :

The world at our feet—an electronic play
You of science have none other say
But the super—consciousness in voice so grim
Cry aloud oh !

But usually the poet draws upon the variegated aspects of Nature, who is but the reflection of the radiant and benign smile of the Master. Swami Satyananda knows the rare art of bringing about a synthesis like Tennyson and Swinburne. He is not, however, blind to the withhery of expression,

The balmy morn
He kissed you sweet
Do you know who taught so neat
He's Gopala dear
The blue-boy dear.

Plain words ! Plain thoughts ! and yet they fill us with deep religious feelings. Himself inspired, he inspires others, and transports us to the land of heart's desire. A consummate master of lyric, Swami Satyananda knows how to spin out his poems out of rainbow film, moonshot mist, dewdrops and the sough of the wind. It would be hardly an exaggeration to say that he is a "reed through which all things blow into music". Our aural imagination is stirred as we listen to his magnificent lyrics, which often have the cadences of an orchestra.

Yet the mellifluous words never appear cloying. For, in his poems we find the perfect harmony between sound and sense, thought and expression. At times the deepest thought finds an eloquent expression in the simplest language. Could you imagine anything simpler ?

When daffodil dance
And lilac smile
Oh ! wait a while.
When the Cuckoo calls
The springs do speak
Oh ! whom you seek ?

The romantic strain is heightened when the poet sings :

The twitter free, the vibrant free
The champak day aquake
The mahua mind who beguiles
The Falgun lily love awake.

Swami Satyananda never takes pains to hide the exuberance of his feelings—his intense, ineffable delight as he thinks of his Master. In this respect, he is unmistakeably romantic. His imaginative sensibilities have all been awakened, and he becomes the lyre in the hand of the Master. Vibrant and Sonant, he sings of the glory of the Lord with the first fine careless rapture.

What I feel, and I suppose, my readers will readily share my feelings, that Swami

Satyananda, though dealing with a wide variety of subjects, never becomes depressed and melancholy. He radiates joy all around, for God is synonymous with joy.

To Swami Satyananda, the Holy Mother has no touch of mortality. Like her divine consort, she plants her feet on the earth and heaven.

The heaven and earth's bridal
Hand in hand is come
In the Saroda's self
Which the words benumb.

We never feel distressed, since the Mother is always with us—in our weal and woe, prosperity and adversity.

If you are Mother
Child I free
We would fairly live together
In weeping and in singing weather
Life would run sweet and low
Not in spree
Child I free.

The poet is a pantheist, for he perceives the spirit of the Mother in the earth, in life, the silvery sky, the bellowy sea.

Swami Vivekananda is also the polestar of the poet. Ramakrishna, the Holy Mother, Swami Vivekananda and Swami Abhedananda have all captured his imagination. "Before flooding India with socialistic or political ideas", said Swami Vivekananda, "deluge the country with religious ideas". "The abstract Advaita", continued Swamiji, "must become living, poetic, in everyday life; and out of bewildering Yogism must come the most scientific and practical psychology—and all this must be put into such a form that a child may grasp it". That is what Swamiji preached and practised. That is exactly what Swami Satyananda sought to inculcate.

That explains why Swami Satyananda, in his effusive tributes to Swamiji, drew a vignette, which stirs us to action, and never lulls us to sleep and languor. With action has been comingled the spirit of supreme love.

The deep of the star would it drop
In love of life on living crop,
Who braves the battle, who takes the stand
The cyclonic Swami, the fiery brand.

We have no difficulty in getting a clear picture of Swamiji, who was essentially a fighter against cant and hypocrisy, social injustice, and exploitation of man by man. Swami Satyananda feels no hesitation in describing Swamiji as 'avalanche',

When the avalonche rolls
Who can stand in glee,
When the thunder tolls
Don't you bend the knee ?
When the Swami bade
Lazarus Come to me,
Over the mirage came
The song of symphony.

We are in the darkling plain ; we are benighted ; we are in a state of incertitude ; lethargy and inertia have cramped our soul ; and who we are bewildered and have nothing to look forward to, we turn to Swamiji, who like an ever-vigilant sentinel leads us to light out of impenetrable

The night was blithe
And incensed morn,
Yon came oh Swami
With echoing horn.

Swami Abhedananda, a Chosen disciple of Ramakrishna, and a faithful lieutenant of Swami Vivekananda preached the tenets of the Vedanta :

What does Vedanta sing and say
It's not a minstrels idle lay.

Need you not in duel roam
Nor need in chain grieve and groan.

The cult of Abhedananda is, in fact, the cult of Ramakrishna and Vivekananda. At times the poet has felt that Abhedananda is lost and "Snugly laid in Nirvanic Cave". He, however, is fully assured that his Master is always with him :

No sound to smother the Abheda-stand
No hue and cry to break the trance
The calm of 'sat' and 'chit' do riegn
The deep of Ananda enhance.

'The Miscellaneous Psalms' are also the religious outpourings of the poet's heart, in which we find the same ineffable felicities in sound and colour, the same spontaneity of expression, the same spiritual fervour. Swami Satyananda does not have much faith in religious rites and dogmas. Even in his hagiology, namely, the poems of Ramakrishna, the Holy mother, Vivekananda and Abhedananda he is always above the pettiness of the parochial order. With his usual gusto and joyous abandon, he records his blissful experiences. At times he does use symbolism to capture the fugitive rainbows and the evanescent glories of the earth and sky, and the mysteries of life. When the biologist, the Botanist, the Psychologist, and the Freudians are groping in the dark to find a plausible explanation of life, the poet says assuringly :

Our Swami has said
With his head unbent
Life is a spirit
Struggling to express itself against the environment
It seems life is a spark of God
For all that can be and for all that is odd.

Swami Satyananda is a poet of hope, faith, and courage. Unlike Baudelaire, he does not look upon life as something morbid. He does not look upon the world as a 'Waste land'. He does not share the feelings of Neitzhche that the world is covered with a skin, which has a disease called man. The poet's unwavering faith in life, human goodness, and the imperishable beauty of Nature is derived from his unwavering faith in Ramakrishna. He has cast his faith in the Master, and that anchor holds.

"He was a *poet nacit non fit* a born poet. His sanskrit verses still have an appeal to our soul. He had a love for terra incogenta. ...He could say like Ulysis—to fight to struggle and not to yield. His love for man, his love for children, his peace and piety all made his personality an unique assemblage like a cluster of diamonds well set by a master artist bound to decorate the ruddy feet of the Mother from whom he was sent unbound.

[From "*Abhedananda, The Messiah of Vedanta*" by Sree Sree Thakur Satyananda.]

Pilgrimage to Udipi, Sringeri and Kollur

Sri P. S. Rao

[The above captioned article is scheduled to appear in the special issue of Bhabmukhey which is being brought out on the occasion of the Platinum Jubilee Celebrations of Sree Thakur's Birthday. However, before recording my impressions on our pilgrimage to the above places, it is appropriate to offer my humble but most respectful homage to Sree Thakur, the Spiritual Colossus, who practised spiritual discipline on a scale parallel, perhaps, only by that of Sree Ramakrishna, who could talk at will with the Divine Mother like the great saint and who, in reality, was no other than the Divine Mother Herself in human form

It was in March, 1964, that the Lord drew me near Him. My initiation, however, took place, after a long period of probation, in 1967.

Judging from His physical appearance and the aroma surrounding Him, it looked as though a golden image was cast in a golden mould and a life of fragrance given to it. Yet, if His divine fragrance did not permeate the length and breadth of the country, it was because He preferred a sequestered life to one of publicity and ostentation. His food and sleep were infinitesimally minimal for decades and yet he retained a figure and form which could be the envy of any one who bestowed on his body the best of care to rear it. In fact, He had everything in Him fit enough to make Him the King of Kings and yet by choice He remained a renunciate. His eyes could be mistaken for two beams of a searchlight and yet they conveyed copiously compassion, love and peace. His very presence enthralled and electrified the atmosphere and yet, He remained oblivious of His strength and stature. To state by way of recollection, at the time of initiation, sitting before Him in a room, I felt the thrill and throb of my heart when some very powerful current, simultaneously soothing and elevating, began enveloping me.

He preached no rigid religious dogmas nor did He prescribe any particular code of conduct for His disciples. His formula for spiritual progress, however, as I understand it, is as simple as it is potent, namely, purity and prayer. What impressed me most was almost the total absence of any demonstration or even talk of any miracles and yet the miracles did happen, by His grace, by the thousand, to the thousands of His disciples and devotees alike, as they continue to happen in profusion even to-day after His physical departure. In conclusion, I offer to Sree Thakur tearful salutations with a quotation from my earlier article entitled "I wash His Feet" written a little after His physical departure on August 5, 1969 :

"......... So, I have physically lost my Lord and so also the other disciples. With His departure, I notice my interest in life is on the wane. As a mark of respectful and affectionate remembrance, however, I have with me the most precious and proudest

of my possessions, His sandals. If, before prayer, in the process of saluting the Lord by placing my forehead on His sandals, tears trickle down on the sandals, how can I help it ?"]

A visit to a holy place can serve the dual purpose of being for pilgrimage as well as for pleasure. Travel and sight seeing is a delightful pastime to many and it can provide an exciting and refreshing change from the hurried daily routine. It was for pilgrimage and pleasure combined that I planned a trip to the above places and accordingly myself and my wife left Calcutta by mail at 6-35 P M on Ist October, 1975, reaching Madras Central Station at 5 A.M. on 3rd. The next train for Mangalore, West Coast Express, was at 12-30 noon and so we proceeded to the railway waiting room. The previous night, the most popular and respected leader of Madras State, Kamaraj, died in Madras City. The result was that every in-coming train brought and poured into the city a seething mass of humanity who came from everywhere. Every out-going train too had to carry similar surge which travelled free in and on the train. We occupied our reserved berths in the train by 11-30. Soon every compartment without exception was crammed to near cubic capacity. Even at 2-30 P.M. there was no sign of the train moving. The suffocation inside was unbearable and I felt that I could stand it no longer. So I mentally sent a S.O.S. to Sree Thakur. In less than a minute Madras Central was left behind !

The train arrived at Mangalore 6 hours late at 12-30 noon on 4th. Our son received us at the station. Mangalore, which is in Mysore State, is a neat promising sea-side town on the West Coast. After meal and some rest, we hired a taxi and reached Udipi, a distance of 39 miles, at 4 P.M. There are regular taxis and bus services between Mangalore and Udipi.

Udipi

Udipi, a neat, little Taluq town, a couple of miles away from the sea, has no rail connection. But it is well connected by road to Bombay in the north Mysore and Bangalore in the West via Mangalore and other places. There are daily De-Luxe Express bus services both ways between Bombay and Udipi, a distance of 450 miles which is covered in 22 hours. There are frequent De-Luxe Express bus services between Udipi on the one hand and Mysore and Bangalore on the other, a distance of 150 and 175 miles respectively from Udipi. Udipi is also in Mysore State. The principal language is Canarese, though with English or Hindi one can get on. About 5 miles from Udipi is Manipal with its vast educational complex where several students from all over India and also foreigners study.

The main attraction in Udipi is the ancient and renowned Sree Krishna Temple. We took accomodation in Birla Choultry which is attached to the temple. It has got 27 furnished rooms with fans some of which are self contained. The rent is nominal. In addition, some other temple accomodation and ample hotel accomodation is available. After a refreshing bath and tea, we visited the temple at 6-30 P. M.

The original name of Udipi was Udupi, which means the Lord of the stars i.e. the Moon, who is blieved to have done penance there. One cannot think of Udipi without associating with it the name of Madhwa Acharya (1238 A. D. to 1317 A. D) who installed

the idol of Sree Krishna at Udipi. There is a legend about the idol. It is said that Lord Krishna himself got this idol of Balakrishna made out by Viswakarma with a churn in its right hand and a chord in the other for his consort, Rukmini. Later, this idol got covered in *gopichandan*. A sailor from Dwaraka loaded this heavy lump in his boat as ballast in one of his trips along the West Coast and came near Udipi. Madhwa learnt by intuition that the boat carried the idol of Lord Krishna wrapped up in *gopichandan*. By the exercise of his spiritual power, he saved the boat, which was caught in a storm, from drowning. On the entreaty of the captain to choose anything from the boat as his offering, Madhwa took the lump of *gopichandan*. On breathing it, he found inside the beatiful and perfect idol of Sree Krishna.

The idol of Sree Krishna, which was installed at Udipi, is of *Saligram* stone, about three feet in height. This idol is reputed to have intrinsic powers. Madhwa gave *sannyas* to eight of his disciples and commissioned them not only to carry on the worship of the idol of Sree Krishna but also to spread Dwaita Philosophy. There are now eight *mutts* around Sree Krishna Temple in Udipi and the pontiffs of these *mutts*, who are the successors in the line of the original eight disciples initiated by Madhwa, carry on the worship of the idol for a period of two years each by rotation.

The temple, though small, is beautiful. The idol, bedecked with ornaments and flowers, looks sweet and charming. The idol faces the west. There is no front door to this temple. Instead, there is a window through which one could all the 24 hours get the *darshan* of the Lord from outside. The main entrance to the temple is from the southern side. Inside, there is a tank with a *mantapam* in the centre where certain temple functions take place. The *darshan* of the Lord in the *sanctum sanctorum* is through a silver pannelled window with nine square holes called Navagraha Window. In front of this window is stone *mantapam* for doing certain *pujas*. The entrance to the *sanctum sanctorum* is through the northern door. The idol cannot be touched by any one except the eight *sannyasi* pontiffs. From the time of Madhwa Acharya till to-day the worship of the idol is going on in an unbroken continuity. Inside the *sanctum* there are wick lamps, some of them having been originally lighted by Madhwa himself, which are still burning to-day. Daily there is a large feeding on behalf of the temple.

Just near Sree Krishna Temple there are two other ancient temples of Anantha-sena and Chandramoulishwar. A few miles away from Sree Krishna Temple are Balaram Temple on the sea coast, Janardhana and Mahakali Temples and Durga Temple on a hillock, the panoramic view from which is grand. About 60 miles away from Udipi are the famous Dharmasthala (Lord Shiva) and Subramanya (Lord Kartick) Temples which are connected by bus.

Sringeri

We left Sree Krishna Temple at about 9 P.M. and after dinner returned to the Choultry. Next day morning, i. e. on 5th, we visited Sree Krishna Temple again. After lunch, we hired a taxi and left for Sringeri at 12-30 noon, a distance of about 60 miles from Udipi. There is also a bus service but it is somewhat tedious. Almost the entire

road is through a reserve forest, including 10 mile ghat road going up to an elevation of about 3000 ft. on Agambi Hills. We reached Sringeri at about 3 P.M. As we would not be able to finish our rounds before 7-30 P.M., we selected some good restaurant and helped ourselves to a sumptuous tiffin and tea and proceeded on foot to see the temples.

For the propagation of the Advaita Vedanta Adi Sankara founded four seats, known as *mutts*, one in each of the cardinal directions of India. Sringeri Mutt is located at Sringeri, a tiny, beauty spot perched on the bend of a gurgling stream, the Tunga, on the inward slopes of the verdant Western Ghats. The scenic beauty is bewitching and the serenity of the sorrounding makes one spell bound. But the natural beauty of the place is matched by the beauty of the legend of its choice by Adi Sankara as the seat of the Advaita Peetha he founded there. As the sage wended his way from place to place to spot out a sanctuary of the spirit, he came upon this little hamlet where he saw a scene which conveyed a message of peace and compassion. It is said that he saw on the edge of the gleaning waters that a serpent raised its hood to offer shade against the blazing sun to a frog which was labouring to bring forth its off-spring. The scene signified oneness of life, the message of Advaita Vedanta, and so the spot was selected.

In Sringeri we first saw the Sarada temple. The temple structure which is about 70 years old looks well maintained. The inside is spacious and neat. The deity looks very beautiful. There was a crowd at the time on account of *navaratri* festival celebrations. In front of Sarada temple there is Jain pillar said to be 2300 years old.

A few feet away from Sarada Temple there is Vidya Sankar Temple, the 800 years old archaeological jewel, which is naturally protected under the Ancient Monuments And Archaeological Remains Act. Vidya Sankar was one of the Sankaracharyas of Sringeri Mutt who lived some 800 years ago. In his name the temple was constructed and he is worshipped in the temple in the form of a *linga* which is said to be very powerful. The temple was designed in the form of Sree Chakra. It is shown as having 9 stages or storeys, and as resting on a 12 wheeled chariot. The whole thing is in stone. It has 6 doors to represent 6 *devatas*. It has 36 corners representing 18 *puranas* and 18 *upa-puranas*. Inside the temple there are 12 pillars and on one day each month on one pillar for 10 minutes at 6 A. M. or so sun's rays fall through one door only. The pillars are called *raasi* pillars and on each pillar the image of *raasi-adhipate* is carved. On the inside roof of the temple in the centre there are the carvings of 4 crows and 2 lizards. During *abhishekam* in the temple some water is sprinkled on the carvings on the roof so that it can touch them and fall on the devotees in the hall which is considered to be purifying.

The township, including Sarada and Vidya Sankar Temples, is separated from Sankaracharya's residential building by the Tunga. The river is full of small and medium sized fish. As we approached the river to get into a boat to cross it, it was a pleasant surprise to see on the water's edge a swarm of fish indulging in acrobatics and friendly duels. Evidently, they are accustomed to feeding by visitors, with no one to catch them.

It is the ancient and brilliant line of spiritual succession that Sree Vidyatirtha, the present Sankaracharya of Sringeri, leads and guides his followers to-day. It is said that the tradition of penance, austerity, grace and blessing and of dedication to the good of mankind built up and sustained by his eminent predecessors amply abide in him. We saluted him and crossed the river back .

Sringeri Mutt has stood against all fanaticism and biggetry. It has freely extended its grace to all castes and communities. It is said that to-day it counts among its admirers and followers a large number of non-Hindus Its chief occupation is the conduct of worship and prayer for the good not of any particular sect or faith but of mankind as a whole. There is ample furnished accomodation available for the visitors to the *mutt* A couple of days stay in the *mutt* will be highly rewarding. As we were unprepared for stay, we left Sringeri at 7-30 P. M. and returned to Udipi at 11 A. M. after finishing our night meal in a small way-side hotel on Agambi Hills.

Kollur

On 6th, excepting for a leisurely strols in the town, we had no other programme. On 7th, we got into a bus at Udipi at 9 A M. and left for Kollur. There are two buses from Udipi to Kollur in a day and vice versa. Taxis are also available for Kollur The Udipi to Kollur is 45 miles. You pass through cocoanut groves, paddy fields and scrub land, on Bombay route and finally, after a deviation, through forest. After about 25 miles from Udipi for about 5 miles the bus travels alongside the Arabian Sea, at some places the sea being hardly some 20 yards away. We reached Kollur at 12-30 noon.

The name Kollur is said to have been derived from Kola Maharshi who is reputed to have done penance there in the past. Kollur is a tiny village in the forest. It is at the foot of the Western Ghats. The highly picturesque surroundings of Kollur form a fascinating gift of nature to mankind. Kollur is one of the seven famous pilgrim centres of the west coast and is a *Siddhi Kshetra*.

About 100 ft. from the bus stand is the temple of Sakti, known as Mookambika, after the name of Mookasura, whom, according to the legend, the Divine mother killed. The temple has a majestic look and is quite big The outward structures might have been rebuilt or repaired by devotees and rulers periodically but the *sanctum sanctorum* is very ancient. The dome is covered with pure gold. The Divine Mother is manifest as a Jyotirlinga, combining both Siva and Sakti, separated by a golden line in the centre, left being slightly bigger than the right. Later, Adi Sankara, during his visit to Kollur, installed a five metal idol of the Divine Mother on Sree Chakra in the posture of *padmasana*. The Divine Mother here is a manifestation of all the triple forms, Maha Kali, Maha Lakshmi and Maha Saraswati, all the three being symbolised in one form as Mookambika. Right in front of Mother's Temple flows a sparkling stream, Sawparna, lending enchantment to the entire surrounding.

Kobachadri peak of the Western Ghats piercing through the clouds is an awe inspiring sight from Kollur. The village has ample accomodation for visitors. There is also a canteen. A stay in Kollur is an exhillarating and exciting experience, for it is almost like staying in a forest. As in our trip to Sringeri, we came unprepared for stay and so we left Kollur by bus at 3-30 P. M. the same day.

On 8th evening we returned to Mangalore and on 9th morning caught the train for our return journey to Calcutta.

ETERNAL

[English rendering of Shri Archanapuri's Bengali poem "Chirantan" by Sri Jyotsna Nath Mallik.]

We are men of clay
With faces upward whom do we invoke—
Whom ?
An unseen truth.
Know not where is the other shore
Only a realization in the heart of heart,
A soft pulsation
Which I spy not but exists.
Between me and the unseen
An infinite waste
That cannot be crossed
Dragging the burden of this body.
So I call with face upturned.
It seems that star-girt tract
That far distant sky
That perhaps is the other shore of the unknown
Our mind, metells, is tied in earthly creepers.
O'unseen you appear.
Each drop of tearful gaze
Freeze and freeze into stones
It seems this shore and shore beyond ~~and~~ are bridged

Is He coming ?
Yes, He comes.
Shoving the screen of many a season
Stepping the stairs of day and night, light and gloom.

At the end of many a song
Set by flowers, foliage and birds
He comes.
He stands at the border of the seen and unseen of the unknown

ETERNAL

The sky blows the conch of light,
In the heart of the earth's green
Descends a golden echo
The tread of a tender foot.
Men of clay, we are amazed
We gaze and gaze and think,
We think and gaze···
Unseen but not unfamiliar still :
The pair of perfect blue eyes is familiar for many ages.
In one flash of a glance of these eyes
All the extinguished lamps are kindled.
Lo He weeps and smiles, both are familiar,
Both the chords of our joys and sorrows
Resound in musical modes of sunrise and sunset.
A tranquility and a benediction······
At the first sight then of the unseen
The hesitancy of a first meeting will not be there.
There shall be an unwavering joy
And in the garland of twin arms a pulsating passion
I shall say O' you unseen, you were there
You are here today, you shall be hereafter,
Which is truth in the knowledge of the unseen
In the seen, that is an embodied delight.
At the conflux of the form and the formless
You are eternal Satyananda.*

---

* The original poem composed in remembrance of 75th holy Birthday of Shree Thakur Satyananda Deva has appeared in the Bengali Section of this Number.

Homage to Swami Satyananda Deva

Principal K. C. Karmakar

Swami Satyanada Deva, so approprtiately Shri Thakur, is an embodiment of truth and delight, a transcendental soul manifesting the glow and force of Sri Ramakrishna. A renunciate disciple of Swami Abhedananda, He figures as a torch-bearer of India's time-honoured culture and values. A luminary in the spiritual firmament, He has irradiated the lives of millions with the spark of divinity. An inborn poet and a musician, He is ever enshrined in the hearts of His devotees and admirers.

His spiritual messages as embodied in the *'Vedachhanda'* are a source of inspiration to the readers. They are initiated into the mysteries of divine love, and a sense of purity dawns upon them. This enables them to purify the atmosphere they move in Indeed their outlook is broadened, and they venture to enter the kingdom of God through His love and enjoy a communion with the Lord. Besides, His noble intellection as expressed through is immortal works 'World Philosophy', 'World, Ethics' 'World Psychology' etc. will no doubt, guide all erring souls in the right direction down the ages.

Shri Thakur was a visionary as well as a practical philosopher with a reformative zeal. A great economiser of words as he was, he wanted others to follow suit with Him so that they might avoid the evils of talkativeness. Further He sought to lift the human mind to a higher peak of sublimity, and this, He thought, was possible through the recital of God's holy name and offering of prayers. As a believer in the gradual development of the life tree, He wished everybody to grow like a flower—"Be like a flower". May this wish be fulfilled, and let the life-tree bear flowers of sweet fragrance.

Shri Thakur was very simple at heart. In fact, He was as simple as a child, and He could identify Himself with the children, forgetful of the vastness of His learning and wisdom. It so happened that He was once busily engaged in playing with the boys. In the meantime, a great Pandit appeared on the scene for discussing philosophical problems with Him. The distinguished visitor was astonished to find Shri Thakur in that playful mood. He wondered, "Is this Swami Satyananda, so highly spoken of, in the enlightened circle ?" "I have come to you", said he, "for hearing your valuable comment on the Shastras. Will you please go inside the temple for the purpose ?" At this Shri Thakur drew the attention of the Pandit towards the boys and observed, "I am a playmate of the boys, and I am no better than a boy. I know little of the shastras". On hearing this, the great Pandit left the place, impressed with His childlike simplicity.

Besides, Swami Satyananda was a great poet and a musician. He composed thousands of divine songs in different languages. These were also sung by Him and His admirers. The songs are, no doubt, the highest literary expressions of Truth, Beauty and

Bliss, "For Him poetry, and songs are flashes towards the divine." (Prasad). In them the rhythmic Lila of the Lord has been manifested most artistically. And He aimed at social improvement through the efficacy of His powerful music. According to Him, spiritualism does not live in a vacuum On the other hand, it has had a social role to play, as is evident from His poetry and music as well as from His utterances.

Besides, His music or poetry has reached a high-water mark of excellence, so far as its diction is concerned. The words used by Him are most suggestive and dynamic in character, reflecting the effulgence of a Vision He will certainly live for ever through His music and poetry.

Creative Genius :

Indeed this Holy Man possessed a creative genius. For example, he founded an ideal *Sangha* in which both males and females were equally treated. In this regard He, no doubt, outdid the Buddha who could hardly look upon the opposite sexes with an eye of equality in His Sangha. Indeed Shri Thakur realised Swami Vivekananda's vision that the mothers of the country should join hands with the males in the vital task of promoting the welfare of the people. And this He achieved by virtue of His creative genius which is 'always for action'. Indeed His approach to things was most dyanamic and as such, He was dead against traditionalism. He could, accepting fully the views of Sri Ramakrishna, rennovate them with the creativity of His high spiritualism.

Blending of Religion & Science :

There is no gainsaying the fact that Shri Thakur had to his credit an undying freshness, an uncommon faculty of analysis This enabled Him. to deal with spiritual issues most psychologically and scientifically He found little difference between science and religion. In fact, he harmonised the two. For example, he believed in 'chitbidyutin' *i.e.* the atom or electron of thought or of consciousness. He was fully conscious of the infinite potentiality of 'chitbidyutin', which is as powerful as free electron. According to Him, the laws of science are not the monopoly of the world of matter. On the other hand, the world of religion too is being operated by them. He has shown how to apply the scientific laws to religion, thus synthesising science with religion. In this respect, He, no doubt, surpassed His Master who discovered consciousness pervading the gamut of the universe, there being nothing lifeless or devoid of sense or consciousness there.

His celebrated poem 'The Lord's play' throws interesting sidelights upon the electronic play going on in the world :

'The world at our feet—an electronic play
You of science have none other say,
But the super-unconscious in voice so grim
Cry aloud oh ! it's not so much serene......'

The lines are pregnant with wisdom. Here a poet, a spiritualist and a scientist have been rolled into one ; and an ivory tower of art has been erected on the foundation of scientific truth.

Personal Note :

The present writer feels extremely happy to recollect the red-letter day of his life, when he was fortunate enough to have a "Darshan' of his Holiness in the sacred precincts of Sri Ramkrishna Sevayatan. His divine smile followed by His belessings is still fresh in his memory. The gesture of love and sympathy shown by Him in the context of his ordeal indeed cheered him up, and enabled him to fight the odds of life in a vitiated atmosphere.

Besides, the utterance of the holy name 'Satyananda' has saved the writer from many a critical situation. Beginning from a ghastly nightmare to the most astute enemy in his practical life, the 'Satyananda Locket' has proved most efficacious indeed, and the recital of His name has dispelled all fears, and engendered faith in his drooping mind. Such is our revered Thakur, the intellectual-cum-spiritual prodigy of the age.

Credit goes to his friend Prof. Prasad, as he created the background for the said 'Darshan'.

Now that the spectre of disbelief and misunderstanding haunts the world, nothing short of a spiritual rejuvenation can save the situation. What is needed in this context, is the simplicity of a child coupled with the wisdom of a sage : the purity of love attended with an urge for self-purification, and so forth But all this can hardly be acquired by anybody unless he has been spiritually and intellectually enlightened. The hackneyed or stereotyped education imparted in the schools and colleges can hardly solve the impasse. What is now of the utmost importance, is to revive the decadent values in the present context, for which it is necessary to inspire mankind with the tennets of the great 'Shri Ramakrishna-Satyananda'—cult, thereby ushering in the advent of a spiritual renascence all over the world.

It will not be out of place to refer here to the Palpara Educational Camp which was inaugurated on January 31, 1973 with the motto of arousing a sense of values among the students and synthesising the time-honoured culture of India with the technological and scientific advancement of the age. May Shri Thakur bless the organisers of similar camps so that the spiritual fire, almost extinguished of late, may be re-kindled to maintain the real spirit of India.

On this auspicious occasion of the Platinum Birth Anniversary of Shri Thakur all should invoke His spirit and pray for the general well-being of the suffering humanity. May His blessings be showered upon the nations of the globe so as to ensure the possibility of world peace and to create an ideal world order for the rehabilitation of the vagrant souls, lost in nostalgic moorings. May the infinite potentiality of "chitbidyutin' be felt through out the length and breadth of the world. May every electron or atom of the universal consciousness be most operative in harbingering a new culture and 'civilisation based upon the hard rock of 'Shri Ramakrishna-Satyananda' ideology. Let mankind rise to higher reaches of spiritual victory by the transcendence of evil.

—

Swami Satyananda and His Works

Swami Neelananda

You know that Srimat Swami Satyananda is well known to all of us. Swami Satyananda Deva, a disciple of Sirmat Swami Abhedananda Maharaj was born in 1902 in Calcutta. He was the second son of Rai Saheb Mahendra Nath Mukherjee the then Deputy Commissioner of Police, Calcutta.

When Satyabrata was a student of Scottish Church College, at Calcutta, he felt an urge to realise God. In the meantime, he met Swami Abhedananda Maharaj and took initiation from him. While performing his religious practices he also passed M. Com. successfully in the University of Calcutta and completely dedicated his life to the worship of God. After realising God he founded the Sri Ramkrishna Ashram at Suri during the holy birthday of Sree Sree Ma Saradamani in 1939. Now, he appeared before his disciples as preceptor (Guru) and initiated many devouts. Around Suri he established many Ashrams and institutions like schools, colleges, libraries, dispensaries, relief centres and hospitals mostly in Bengal and partly in Bihar.

Like his Guru, Swami Abhedanandaji, he was a true seeker of knowledge. He was a poet, philosopher, music-composer, dramatist, litterateur and excelled in many other qualities. He wrote his books in Bengali, Hindi and in English. He composed songs in Oria and in Telegu. Among his books 'World Philosophy' in Three Volumes and 'World Ethics' were highly praised by many eminent scholars and those have been selected as reference books of philosophy by the universities of India and abroad. In his book 'World Philosophy', he worked out a synthesis of philosophies of the world. What is Philosophy ? He said, "Philosophy is the science and the art of living, or as the Stoics say, the art of living wisely, and it is the art of doing away with all the miseries as found by the Indian Philosophers." About World Philosophy he said, "the world is a unity in diversity. World Philosophy gives us divergent currents of thought, as also the unity underlying them all. This underlying theme is the music of life, it is the ruling principle, the key-note that runs through every soul. We should know this in order to live in harmony with the cosmic process. As there is a philosophy of the Greeks, a philosophy of the Indians and so on, so there is a philosophy for the whole world ; and the master principle behind it is truth, satyam. We may call it by any name, whether God in heaven, Brahman of the Vedas, Ahur Mazda of the Parsees, Allah of Islam, Tao of the Chinese or only a void of Nirvan but we have to be united with it through Love that does not die, the Love that is everlasting."

This everlasting love of mankind was one of the chief characteristics of his life. Not only mankind but his love spread over the whole of nature.

Swami Satyananda was a good poet also. Abouth his poetic works Dr. Satya

Prasad Sengupta, M. A., Ph. D. (London), Head of the Dept. of English, North Bengal University said, "Swami Satyananda appears to be an anachronism in the modern age. He is a poet who compares favourably with John Henry Newman, St. John Perse, and Francis Thompson. He has all the mystical glow, religious fervour and beatific vision of those writers, to whom poetry became revelation. "Song of the soul" is his a book of poems. A romantic thought has been expressed in his poem 'The Blue Moon' as,

"Just in bloom the cherry chime
The orphic spring is just divine
The orchard just begins to croon
Awake oh ! Moon, the blue-bell moon."

But he was realistic also. He believes that nothing is lost in this world. The world is changing. The past goes away and the new comes. And we always live with new hopes. In the last stanza of this poem he said,

"No hide and seek the Manna dew
On dried leaves is shed a new
The day is come and come too soon
Awake oh ! Moon, the blue-bell moon"

He was popularly called Sri Sri Thakur by his disciples.

We can compare Sri Sri Thakur with the great humanist Iswar Chandra Vidyasagar who had human milk in his heart. Sri Sri Thakur initiated people of every sect of the Hindu nation even muslims. To him there was no difference between different castes. Following Gandhiji he named people of so-called schedule castes as "Thakurdas" Inspired by the ideal of Buddha, Sri Ramkrishna and Vivekanand he founded an Ashram for renunciate nuns (Sannyasinis) also. He imagined that the civilisation of the Topoban (Forest) of ancient India would revive in our country.

Regarding our ideal of life he mentioned the term G. P. S. in his drama "Rabindood". G P. S means God, purity and service. He concurred with Vivekananda that service to mankind is service to God. And we must be pure in body, mind and soul.

He demonstrated a new outlook regarding mass religious practices. He organised many cultural functions and drama performances during the birth anniversary of Sri Ramkrishna, Abhedananda and Sri Sri Ma, where many scholars of the East and West discussed various topics of philosophy and religion and a large number of people attended conferences and profited.

Swami Satyananda Deva died on 5th August, 1969 at Baranagore, Sri Ramkrishna Sevayatana.

His holy life and ideals will be able to throw new light upon society and society will follow them.

———

Bammera Bhakta Potana

V. Ganesh Rav

It is an undisputed fact that the lives of great saints and born Bhaktas are a source of inspiration, and their paths and teachings are glittering guides to us for ever for our betterment. To whatever clime they belong, they leave their foot-prints eternal on the sands of time. They are the prime objects of admiration, adoration and love. They possess what is called God-vision and their lives are exemplary. They preach dogmas of religion and philospby for the spiritual uplift of the people. They know that 'Service to Man is service to God'.

We find the born Bhakta, Bammera Potana, as one of those seers of India who had been an inspired poet in the Telugu language At the instance of Sree Rama Himfelf, he composed an epic puranam, 'Srimad Bhavatam' in Telugu, a clear, independent and enlarged rendering from Vedavyasa's Sanskrit verison.

In this connection a few words on Vedavyasa are essential to be mentioned. He, coming under the spell of Lord Vishnu, was the first and foremost *rishi* that rendered the vedic lore into four parts. His original appellation was Krishna Dwaipayana. With a view to ameliorating the common man from the mundane bonds, he attempted first in Sanskrit language 'Maha Bharata'. But this did not give him contentment and at the instance of Narada, he completed 'Srimad Bhagavatham' in Sanskrit. This is an epic puranam describing Vishnu leelas, with unsullied bhakti permeating throughout.

It was this sublime Bhagavatham of Vyasa that attracted Bammera Potana, and, to the exceptional fortune of the Andhras in particular, he rendered it into Telugu. This is a mixture of poetry and prose, the former being predominant. He excelled the original in depicting exquisitely the stories of the leelas of Lord Vishnu and every Andhra must feel grateful for such a sacred and unique epic in the Telugu language, as it invokes in every reader unsullied *bhakti* that leads to the real goal of our lives, viz.—salvation.

Born in 'ONTIMETTA', its original name being 'Ekasilanagram', Andhra Pradesh, Potana was a Niyogi Brahmin of Koundnaya Gotra. His parents were Kesamanthri and Lakkamamba. He had a son, Mallanna by name, who was also a renowned poet. He lived during the period 1400 and 1450 A D. and that was the closing period of translations into the Telugu literature from the original Sanskrit and Puranams. Unquestion ably, Potana was a born Bhakta.

History tells that Potana lived during the regime of the Ruler of Venkatagiri Kingdom, Sarvajna Singh Bhupal. Potana was the only Telugu poet who preferred to suffer from dire poverty inspite of his unique literary talent that attracted several Kings of his time, who could have gladly offered wealth and villages only if he chose to dedicate his literary works to them. No other Andhra Poet had ever suffered such poverty. The Poet—TRIO, Nannaya, Thikkana and Yerraprogada, who translated Maha Bharatam into

Telugu enjoyed unique honours and amassed wealth at the courtesies and support of the then rulers. But Potana was the only exception not to kneel before the rajas and never to agree to dedicate his writings to any ruler. He lived a simple and honest life by tilling his meagre land and dedicated his sublime epic, Srimad Bhagavatham, not to any human being but to Lord Vishnu Himself. He also earned renown as honest and pure Bhakta, adoring the Goddess of Learning with unflinching faith and devotion. Bhagavatham epic is an exceptionally all embracing spiritual luminary which helps eradicate evil tendencies in man.

When he was very young, Potana used to look after the cattle. One day, when he was with the cattle at a hill near his place, to his good fortune he happened to stand surprisingly before Jithananda Yogi a kind and merciful saint, who, being impressed with the boy's bhakti, gave him the sacred Tharakanama Manthram. This created in Potana the exquisite poetic talent from his boyhood

On an auspicious day, when Potana was bathing in the river, he had the exceptional fortune of Sree Rama darshan. The Lord advised him to render Srimad Bhagavatham of Vyasa into Telugu and to dedicat that epic to Him so that he would soon be extricated from this mundane mire of *samsara*. Bhakta Potana felt ecstatic at this unexpected turn and obeyed the Lord accordingly.

It is really a God-sent Boon to the Telugu people to possess such an epic Puranam, Bhagavatham, of Bhakta Potana. Thus, his diction and style both in prose and poetry while rendering Vyasa Bhagavatham into Telugu, earned name and fame as a real Bhakta of Sree Krishna. Besides, the rhythmic style of poetry sweet and balanced, prosody, its metre, the use of apt figures of speech, similes metaphors and other poetical fancies in this epic Bhagavatham makes the reader spell bound.

In this Bhagavatham, Rukmini Kalyanam, Gajendra Moksham, Prahlada Charithram and the like are taught particularly to the boys and girls in teens to imbibe in them *bhakti* cult from their impressionable age. The language, diction and the balanced style of this epic puranam, earned unique name and fame to Potana which no one uptil this day could earn.

While on the subject, it may be interesting to know a few peculiar episodes relating to the depth and purity of Potana's bhakti for Lord Vishnu. His adoration of the Godess of Learning and Her response thereof are equally thrilling.

When Potana was writing Varahavathara episode of Lord Vishnu in the third *Skandam* of his Bhagavatham of twelve *Skandams*, the King of Karnata, enraged at Potana's stoic indifference in dedicating this epic *puranam* to him, sent his men to tie up Potana by a rope and drag him down with epic to his feet. At that juncture, Potana was praying with steadfast devotion and complete surrender at the feet of Lord Vishnu, when the Lord in the shape of Sweeta Varaha Rupa appeared before that gang and chased it away.

When Potana was composing poems in the eighth *Skandam* about the story of Gajendra Moksham, he wrote half a line in one verse while describing the rendezvous of

Lord Vishnu at Vyakuntapuram but could not proceed further to complete it. So leaving his writing in a depressed mood he went out to stroll. Meanwhile, it is said, Sree Krishna in the form of Potana entered his room and completed the line in the presence of Potana's young daughter. When Potana returned home and discovered what had transpired, he not only extolled the Lord but at the same time felt sad in not having the darshan of the Lord.

When Potana was writing the tenth *Skandam* about the story of Rukmini Kalyanam describing the blossming growth of Rukmini's youth, his baby daughter accidentally fell into the burning oven nearby. But when he completed the description his daughter escaped from the fire unscathed.

Potana's brother-in-law, Sree Nadha, was not only Potana's contemporary but also equally a celebrated Telugu poet. But his tenets of life and living were quite contrary to those of Potana. Sree Nadha never adhered to one raja in dedicating his literary writings. He turned around Andhra, saw innumerable rulers and used to please them with his verses and take wealth in return. Further, his literary ability was exhibited in defeating the court poets and laureates of several rulers in discourses on poetic diction and the like. It was said that once he had bathed in gold coins at one of his literary triumphs. He liked a luxurious living by selling his literary talents As such, he used to taunt Potana for his dire penury inspite of his sublime talent in writing Srimad Bhagavatham, an epic, unrivalled in the annals of literary history. Inspite of such contrast in the lives of those two luminaries, both were pious and possessed spiritual power.

One day, Potana was in his field directing his son in tilling the soil with a plough and two bullocks. At that time Sree Nadha was coming across in a palanquin to meet Potana to persuade him once again to dedicate his epic, Bhagavatham, to one of the rulers and to get rid of the life of a farmer. While coming in the palanquin for the said purpose, to exhibit his spiritual power he let off one-side carriers of his palanquin. Even then the palanquin moved on quite balanced. Potana's son saw it and pointed it out to his father. Potana at once let off one of the oxen of the plough and yet his work of tilling the field went on unhampered At this, the pride of Sree Nadha did not stop there. He let off the carriers of the other side of the palanquin and still the palanquin moved on miraculously. Now Potana also let off the other bullock of the plough and showed that his plough too could till the soil without any bullocks attached to it.

Sree Nadha got down from the palanquin as he approached Potana on the field and embraced him accosting Potana as "Tiller" of the soil. Without feeling offended, Potana coolly vindicated his position by retorting that instead of feeding his belly by selling his literary talent, he preferred an honest, and simple life, living, if necessary, on roots and herbs.

Sree Nadha one day went with his large retinue to Potana as his guests to embarass him as a host. Potana, in the circumstances could say nothing but send his son to raise a loan to feed the guests. However no loan could be raised. Yet, with great faith in the Goddess of Learning, he asked his guests to bathe in the river and be ready for

meals. Meanwhile he prayed to mother Vani who appeared before him and promised help To the amasement of all the guests, a princely feast was served to them in no time. Even at this juncture, Sree Nadha stressed on Potana again to get rid of his penury by dedicating his epic to one of the rulers. The story goes that hearing their talk, the Goddess of Learning appeared before Potana with tears in Her eyes. Understanding the reason for the mother's tears, Potana assured the mother that as long as life lasts in him he would never sell his epic even though he had to suffer from dire poverty.

Next, to find fault with the literary feat of Potana, Sree Nadha began scrutinising his epic Bhagavatham. In the eighth *Scandam* in the story of Gajendra Moksham, he picked up a verse which described the hurried appearance of Lord Vishnu to protect His Bhakta, the Gajendra, who was about to be dragged into the water by a large crocodile. It was depicted that Lord Vishnu heard the cries of Gajendra for protection and without uttering a word to Laxmi Devi and without carrying any implements even, He hurried to the rescue of Gajendra. Looking into this verse, Sree Nadha ridiculingly queried how the Lord could save Gajendra by hurriedly responding to its call for help with empty hands. Potana remained silent at the moment and thought of a suitable reply. Next day when Sree Nadha was about to dress his hair, Potana, hiding the son of Sree Nadha, dropped a heavy flat stone into the well and shouted to his brother-in-law that his son fell into the well. At once, Sree Nadha dashed with his undressed hair to the well. Then Potana estioned resortingly why he came there with empty hands without a ladder or rope or any helpers to save his drowning son. Thus, Potana aptly brought out the analogy that Lord Vishnu equally affectionate to His Bhaktas as Sree Nadha was towards his own son.

Thus, while his epic, Srimad Bhagawatham, marked out Potana as a literary genius, it was his steadfast and unflinching devotion to his ideal, namely, not to sell his Kavya Kanya to any king in spite of his grinding poverty but to dedicate it to God himself, that endeared him to the generations that followed as a great saint and seer.

We have seen Him

S. N. Sanyal

If any one asks, Have you seen Thakur Satyananda Deva ?

Of course I have, I would readily answer. Not only have I seen His glorious and divine Form I have also talked with Him. I was fortunate enough to have His blessings.

It may occur, is there any scope for such a question over such a simple matter. Apparently there should be none. Thousands of persons from different parts of the world and from various walks of life had seen Thakur Satyananda Deva while He was in the mortal plane. There is nothing peculiar in it. Deeper introspection will however reveal that the matter is not so simple as it looks. Learning and intellectualism will not help us much here. We will have to dive deep into our inmost soul for the answer to the next question. We have no doubt seen Him with our physical eyes but Who was He ?

No "seeing" is purely objective or purely subjective. It is an amalgam of the two. It depends both upon the quality of the object and the quality of the subject.

Innumerable persons had seen Thakur Satyananda Deva ; some from a distance, some from close range. Many had brief contact with Him in their lives, some had the privilege to live in close contact with Him over a number of years. Surely He did not appear the same to all of them.

Opinions will vary, what He really was ? A great scholar, a saint, a spiritual teacher of uncommon merit, a hermit dedicated to renunciation par excellence, a poet divinely inspired, an artist unique and supreme, a kind and loving parent of such kindness and love no mortal parent can ever dream of. Was He all in one or one in all. A fortunate few with rare spiritual vision saw in Him the Divine Mother Herself.

Still could we all come to any definite conclusion ! The veil of Maya is not easy to pierce As water hyacinth envelopes the pond the moment it gets free play so doubt clouds human vision imperfect as it is. Push it away, it comes again dancing. May be this is the Lila of the Divine when enacted under the sun. Light and shade, rain and sunshine, add charm to unfold the Beauty of Nature. Subtle hints, though rare, He gave regarding His Identity. Blessed be the pure in heart who caught the meaning and never allowed their vision to be clouded.

Long before the bugles heralded the battle on the holy place Kurukshetra many had acclaimed Lord Krishna as an Incarnation of God. There were, of course, many others who did not share this view. The Lord Himself set the issue at rest, when, in course of the conversation recorded as Shrimad Bhagbadgita, He revealed His true Self to His intimate friend and relation, Arjuna, and declared more than once is no uncertain terms that He was one with the Supreme. The final utterance must come from the Lord Himself

Lord Jesus the Christ said, My Father and I are one.

Coming much nearer in point of time we find that long before the young disciples of Lord Sri Ramakrishna gathered round Him He was declared to be an Incarnation of God by many scholars, saints and others. Still the Lord Himself, just on the eve of leaving His mortal frame and at the last stage of a fell disease, told Narendra Nath (Swami Vivekananda), He who was Rama and Krishna had come as Rama Krishna. The final judgment here also comes from the Lord so that there may be no scope for any doubt.

Doubters there are and doubters will there be. Let the doubters remain content with their doubts. Sophisticated argument, however advanced and powerful, will never lead to clear vision. It is the purity of heart which will throw clear light and show the real path. Let us not forget—Lord Satyanananda Deva Himself said on the eve of leaving the mortal plane, Trinayani and I are the same. He revealed His identity with Mother Trinayani at the last moment in clear language so that there may be no delusion, no straying away from the path. In keeping with the Tradition He has followed His Predecessors in declaring the Identity. The Lord has given His judgment. It is for us to comprehend the same and realize, we have seen Him.

Satyanandadev

Exponent of Education for Divine Life.

Prasad

Dull all-time low levels of instruction. geared to the text book—cut off from the flow of even the routine average form of life, with all out dependence on 'smattering' for an examination based work habit characterise our pattern of education. Few teachers have the courage, few guardians have the imagination, few planners have the sense of urgency to go beyond this.

Satyanandadev went to the root of this situation. He shed all the 'learned' things from his life, started living without the decorations of education, acquired over years. Disabusing from the imprint of the University education, clearing all the cobweb that highly educated Indians build around their personalities, he sought persistently to integrate himself with his inner fund of consciousness. His sadhana had innumerable facets : austere asceticism of the savants, larger than life ; time-less trance of a mystic ; deepest intuition of a philosopher to measure up Reality ; commitment for plainest life style so as to unravel ther eal strength of personality.

Thus this process of making of a multidimensional entity, uniquely became a restructuring of him into Thakur Satyanandadev as an outstanding educator of humanity.

Comparison is obnoxious. But no parallel is noticeable in recorded human history. Plato's methods for guardians, pale into insignificance ; scholastics of the continent, the Sramanas of India, Mutazillites of Arabia—and the Sufi's for that matter, may emulate the life regimen of Satyanandadev ; knowledge, religious truths, mystic realisations, all coalesce. No harping—"you should do this" ; but demonstration of what is to be done !

Ordinaries became plenipotentiaries when they came near him. Unlettered ones became literary personalities, unskilled labourers became technicians under his stewardship. Neglected section of people—women folk, tribals, untouchables found graceful openings of life. Orchards blossomed in semi-arid fallow tracts of land, shirkers became social and humanitarians to relieve the sorrows of suffering humanity—famine-stricken, poverty-ridden, disease-beaten.

Schools and colleges were founded to spread education for such people who could not dream of receiving this benefit. Personnel involved in this programme received constant training and rigorous re-training under him "so that

the institutions have a living philosophy before him, instead of degenerating in a routine stereotype." Almost all the important persons of Ashram are familiar with educational technology and operated programmes like science Fair, tape recorders, films (even filmed by the Ashram itself), National Days, cultural events, music conference of very high order—years before these mechanisms were accepted in affluent school systems of India. The little students are familiar with the lives of savants, patriots, scientists, laureates presented through the genre of poetry ; story in print, dramas in stage—produced by the author—Satyanandadev.

"International Convention* for Media and Technology in Education" for life, meeting in St. John's, New Foundland, Canada is considering some aspects of Satyanandadev's ideas and practices as India's answer to the question of salvaging civilisation in the age of technology.

What is technology if it is not controlled by powerful human personality ? It will take over our faculties, relegate us in our passive-most roles—if the manhood is not held supreme. So Satyanandadev enriches the refined intellects, proliferates the creative expression of the mind—sustaining all these through depth studies of the scriptures, practice of disciplining discipleship through meditation, hymns, silence-fire sacrifice in honour of the divine.

Leaders of current civilisation and the budding students of social engineering would find rich treasures from the monographs recording Satyanandadev's daily messages or thematic deliverances and the background notes on his creative endeavours to transform the life from the gross to the divine—into subtle and fuller manifestation, verging on the "Life which is a divine spark."

---

* In June, 1976 [Post Box 5169]

Sri Satyanandadev Wins

Sri Asit Biswas

Let us prefer a genius to a mere scholar. Allow this genius to grow into an active, sociable and lovable gentleman. This gentleman now gets to be strictly moral, pure and unselfish. Next he must undergo a process of self-searching so that he may reach the final target of peace and realisation. But even after all this the role of a saviour remains to be executed by him. Such a saviour catering to our real needs and tastes became a concrete reality when Thakur Satyanandadev was born seventy five years ago. He never fails to win our hearts. That is perhaps a fact more potent and pertinent for an admiring novice than any of the eulogies that may garland the great soul.

I intend to present here just a few of the special and distinctive features and aspects of his life that may interest a wayfarer in the spiritual line. The Swami in his boyhood belonged to what we call aristrocracy, he being the son of a great police official. Paradoxically enough, he had his master degree in commerce. But he had the best resistance from his seniors in cultivating celibacy and an ascetic order of life. They rather put on encouraging gestures for his yogic traits and talent. This does not echo the average story of the aching hearts—the parental frustration that precedes the expedition of almost all our budding yogis. Very early and very fortunately he had an unconflicting choice for the Ramakrishna order of spiritual guidance. Eventually he was initiated by Swami Abhedananda who in their monastic order was noted for a great range of intellectual interests, erudition, his Vedantic zeal coupled with his profound experience of the rajayoga variety of sadhana. How this great preceptor estimated the potential yogi in Sri Satyanandadev is a matter of animated interest to me. But that is out of place here

The spiritual career of Sri Satyanandadev has two distinct phases—one marked by the solitudes of Birbhum, the other by the Gangetic Calcutta which brought him a wider circle of admirers. One may with profit follow how the light of Birbhum gradually grew to be the mellow voice of Bengal—the Bengal as perhaps dreamt by Sri Ramakrishna himself. Pious souls including a number of holy woman left their worldly way of life and clustered round him just to be intimately guided by this great Guru. Now that Sri Satyanandadev is no more in physical frame, the influence of his charming personality is unmistakable in the abiding spirit breathed by the organisation left by him. The Swami performed two superhuman jobs apparently opposed to each other. An interpreter of world philosphies was simultaneously a composer of a few thousand songs. Unlike Sri Ramakrishna he did not practise various religious rites so as to test the verity of the claims of the major religious sects, but he trekked a long and strenuous way into the intricate corridors of manifold systems of philosoply including psychology and ethics perhaps to weigh the comparative worth and universality of the Ramakrishna philosophy, and he gave short and lucid accounts of his precious pilgrimage. While cultivating fine arts in the service of God, he was keen on the requisite austerities for the spiritual aspirants who sought his shelter. Through graceful varieties the religious training that he himself undertook or imparted to the disciples became brilliant and vivacious and, therefore, remote from being mere ribs of rites and duties. You will find his disciples humble, gentle, working smilingly, all engaged, as it were, in rhythmic search for the great wisdom. Thus the legacy of the Guru is gently throbbing in every corner of the Sevayatan. According to me his speciality lay particularly in his mission of combining the traditional yogi with the graceful, accomplished gentleman of the day. He was, indeed, a finished artist, soft, gentle and kind both in his writings and dealings. A Matthew Arnold would find in him 'sweetness and light' becoming a truly cultured man, though in our present case sweetness includes purity, and light includes celestial enlightenment.

Sri Satyanandadev had the accommodative habit of a good learner. He was always

anxious to appreciate virtue and talent and also to supplement his own fund of knowledge. On the other hand, his childlike playfulness and his motherly affection coupled with his masterly treatment of all the faces of life must have, I presume, provided the nuns and sannyasins with some sort of domestic peace even in their dark hours of spiritual agony. His nature preferred the intimate role of a teacher to the height of a celebrated preacher. He, therfore, preferred the ashram floor to the open-air crowd-facing platfrom. A staunch Vedantist, he often conducted experiments on yogic methods, and in conjunction with modern science and psychology he succeeded in devising certain novel methods in this area. His handsome figure, to say the least, was nature's matching gift for his varied qualities. But his central concern was to seat Sri Ramakrishna in his true and proper glory and to illustrate in himself the ideal way of living as expounded by the great lord.

Sri Satyanandadev is not a closed chapter, but a living phenomenon, ever expanding with his inspired children. Many of his devotees sincerely believe that he was the incarnation of God, a strange re-advent of Sri Ramakrishna to perform a mighty role inscrutable to ordinary mortals. Some of them have their definite psychic experiences whcih go a long way to bolster their conclusion. The present writer is far from being competent to comment in this area of subjective appraisal.

Spiritual Talks

(From R. L. Goel's Diary)

12.2.66

It was Saturday, about 9-00 P M Swami Nirbedanandaji was sitting on his Asan in the western verandah. Phatikda, Dewan, Indu Babu, his son, Srivastava (a new comer) Dhyan Maharaj, 'R' and many other sadhus were standing there awaiting Lord's darshans Just then temple doors opened and Lord came out. All the devotees prostrated before Him and He blessed each one of them. Lord then entered the Temple Hall and called in the devotees after the lights were put on. The devotees prostrated before Bhagwan Ramkrishna and Ma Sarada. Once again Lord came out to western verandah and then entered the Temple room. Some of the devotees sat outside on the bank of the Ganges while others kept sitting in the verandah. Aarati had already commenced.

After Aarati was over all the devotees again assembled in the western verandah. Sri Charandas also joined by this time. Lord again appeared at 10-30 P.M. All the devotees prostrated before Him. Lord sat on His Asan.

Lord : Is there any question ? Or, we shall read Gita.

'R' ; Thakur, the Hindi Bhajan you sang during Aarati was very sweet

Lord ; (After getting the book) I composed this Bhajan just after going in after 9-30 P.M. In a hurry it of course could not be properly tuned. I just sang it.

Lord then read the Bhajan and explained it line by line. It relates to the Birth of Bhagwan Ramkrishna. His birthday falls on the 22nd of February. The Bhajan means as follows :—

In the autumn, the spring has come. The skies are decorated with the Moon of the second day. In those darkest of days in our country in particular and in the world in general Prabhuji came on the earth like a shooting star from unknown space between the Heaven and earth. The heaven could not come on earth. The earth wept and shed tears of dew drops and the Lord Ramkrishna came on the earth.

Lord then read one more Bhajan composed by Him in Hindi (Badhai—congratulation) on the birth of the Lord and explained the same :

Lord continued : The Bhajans are best written and composed in Hindi. Bangla Bhajans cannot be composed alike ; likewise Kali Kirtan cannot be composed in Hindi.

Dewan Dinanath recited an Urdu Verse and explained the same.

I am a small flower in the desert and you are a star in the heaven. I want to reach you. But I have no capacity. I fly upward. Go up a little. Fall and die away. But you are in the heaven. If you want to come on earth, you can. You can come in the form of a dew drop. Fall on my petal and quench the burning thirst of mine.

Lord : It is a good idea.

Charandas : Thakur, to-day when I was working for the Mandir, I needed the help of a man. One Ashramite here named Tarananda was standing here. I asked him if he had taken his meals. He said, yes. Then I asked him to come and help me a little. He immediately came and started helping me in the work of the Mandir. Actually he had not taken his meals. Some one came to ask him to go and take his meals. Tara just begged him to be excused as he was working for Lord's Mandir. Thakur, such an unswerving faith I have yet to see. Now does it come by Guru's (Kripa) Blessings, or efforts or Sanskaras ?

Lord : He is a very simple hearted and guile-less man. It is so easy for him to develop faith. It is the intellect which stands in our way of building up faith in God or Guru. Once at Dubrajpur it was past midnight and very cold. Tara was chipping wood for next morning. He had no cover on his body. From behind I said, Hooph. He ran from there and hid himself in a room. I again called him and in the meanwhile I placed a chadar on a tree. He came. I said, "Do you want a chadar ?" Go under that tree and a ghost will drop a chadar on you. He went under the tree and the chadar dropped on him. But he would not wear it. Because, as told, it was dropped by a ghost.

Lord then called Tarananda. He came and stood at the back. Lord asked him if he remembered that chadar story. Tara only nodded his head in the affirmative.

Lord continued : If I ask you, look there is God standing behind you, you will doubt it. But if I say the same thing to a Santhal, he will immediately look back to catch God.

'R' : Thakur, once you told the story of a man who was listening to Ramayan. When the man heard, Ram, Janki & Lakshaman had gone to jungles, he ran home, took a cot and ran to jungles for Ram.

Lord : Yes, it is a true story. He had been running in jungles for many days with the cot on his head calling Ram, Ram Ultimately he had Ram's darshans in the jungles. Ram and Janakiji sat on the cot and he served them. Ultimately he became realised.

Charandas : But Thakur, to be simple to that extent is hardly possible for a man who has to do business and earn. During the course of business and even in service we have to tell so many lies and do and say so many things which even we ourselves do not like.

Lord : Yes, that is very correct. In that case do every thing in the name of the Lord. While you go to sleep, pray to Lord and say, O Lord, whatever good and bad I have done to-day, I place at your lotus feet. O Lord, do kindly excuse me for the mistakes I have made during the course of the day. If you do that only sincerely, Lord will take care of the rest.

'R' : Thakur, during the last five years I have tried and practised a different formula and I have found it to be very successful. The greatest art of telling a lie is to tell the truth. For instance, if I go to an Income Tax officer, I place before him all my weak points or confess before him all the mistakes. It immediately creates in him a confidence, and at once he tries to help me. On the other hand when he catches one of my mistakes and I try to concoct explanations it creates in him all sorts of doubts and he goes on rubbing me further and further and makes it miserable for me. An officer once told me, "Well, there are more things written on the face of the assessee than in his books'.

Lord : That is a very correct formula but how many can have the courage to apply it and to understand its inner implications. Moreover, however much we may try to stick to the principles of righteousness we still make mistakes willingly or unwillingly. We may not become aware or conscious of our mistakes and faults. For instance, when we walk how many insects may be killed under our feet or how many we may eat with the food. The only remedy is to place before our Lord every night when we go to bed our mistakes and faults and pray to Him to excuse us for the same.

Take it as the instructions of your Guru and your Guru's Guru. My Guruji also used to say the same to me.

Sri Charandas immediately bowed his head to Lord in all reverence and accepted His advice.

It was already very late—past 11-30 P. M.

Kirtan, reading of Gita and Kathamrita and prayers were performed.
Lord then distributed Charanamrita.

Dewan : Thakur, Lalita has conveyed her pranams to you She has written that she reads Gita but it does not interest her.

Lord : Gita is for knowledge and philosophy. It is not necessary for her. She should only do Japam.

Dewan : But she wants to know about Hindu Religion.

Lord : She must follow her Guru's instruction.

Convey to her my Asirvad and ask her to do only Japam.

Lord than left His Asan. All the devotees prostrated before Him and left after He entered the Temple. Jai Thakur !

Swami Satyananda Dev 75th Birth Anniversary Committee

Sree Sree Ramkrishna Sevayatan

2, P. K. Saha Lane, Calcutta-36

Members of the Central Committee

Swami Nirbedananda ... President
" Sambuddhananda ... General Secretary.

" Umananda
" Bhupananda
" Paramananda
" Sureswarananda
" Arunananda
" Bimalananda
" Amalananda
" Mahananda
" Dhyanananda
" Bhadreswarananda

Sri J. N. Mallik
" B. R. Gupta
" Amiyaprasad Das
" S. M. Chatterjee
" M. R. Ghosh
" R. L Goel
" P. N. Mukherjee
" D. N. Agarwal
" Jatil Mukherjee
" K. L. Chowdhury
" Jagadish Daga
" Ramen Mullick
" N. G. Chakraverty
" K C. Kohli
" K. K. Ray
" P. S. Rao
Dr. R. N. Bhattacharjee
Sri P. Sengupta.

Contd.....

Members of the Local Celebration Committee

Swami Umananda
Dr. Sushil Kr Dasgupta
Sri Baman Das Lahiri
" Sushil Kumar Mukherjee
" Khagendra Nath Ganguly
" Manada Charan Saha
" Rai Biswendra Nath Chowdhury
" Nemai Charan Maity
Sm Nandarani Banerjee
Sri Gobordhan Roychowdhury
Sm. Kalyani Mukherjee
Sri Apurba Mukherjee
" Mana Kumar Sen
" Sashanka Sekhar Chakraverty
" Pratul Chandra Chatterjee
" Jnan Maity
" Biswanath Banerjee
" Amiya Ranjan Gunguly
Sm Basana Rakshit
Sri Pranatosh Chatterjee
" Bireswar Prasad Moitra
" Anil Chandra Roy
Sm. Mridula Biswas
" Minati Ganguly
Sri Nalin Behari Banerjee
" Panchu Sunder Banerjee
" Robin Bhattacharjee
" Kanu Gopal Chakravarty
" Sailen Chowdhury
" Bhabesh Das
" Manas Roy
" Manindra Nath Sarkar
Sm. Sabita Chatterjee
" Sudhangsu Moitra
Sm Sova Dutta
" Shefali Sengupta
Sri Biswanath Mukherjee
Dr Subhas Kr. Das
Sri Tincori Moitra
" Shib Shankar Ghosal
" Kalipada Des
" Bikash Majumdar
" Robin Day
" Gopal Bhattacharjee
" Subodh Kumar Choudhury
Sri Samapada Hazara
Sri Prafulla Chakraborty
" Manindra Nath Sarkar
Sri Sushil Kr Paul
" Shibapada Bhattacharjee, M.L A.
" Panchudas Bhaduri
Headmaster, Mahendra Nath School
" Baranagar Vidya Mandir
Sri Santosh Kr. Sengupta
" Adhir Kr. Sarkar
" Ashoke Roy Chowdhury
" Sudarshan Biswas
" Durgapada Tarafdar
Sm. Sandhya Ghosh.
Sri Gopal Mondal
" Karuna Bhattacharjee
Dr. Asit Banerjee
Sri Indu Bhusan Nundee

নূতন দিগন্তে

দেবব্রত বিশ্বাস

সঙ্গীত জগতে নূতন অবদান

দিব্যগীতি

রচনা

১। মহাসাগরের ডাক শুনেছি যে
২। বেলাশেষের বাঁশী ওগো
} স্বামী সত্যানন্দ

৩। অনেক রক্ত ঝরেছে মাটির বুকে
৪। আলোর চোখের আলো
} শ্রীঅর্চনাপুরী

সুর ও সঙ্গীত পরিচালনায়
শ্রীপ্রবীর মজুমদার

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্-এর
45 R. P. M. এক্সটেণ্ডেড প্লে রেকর্ড
25242/25243 LH 163

HG

Quality Galvanizing & Manufacturing

- Drums, Kegs, Barrels ● Heavy Duty Drums ● Hamilton Tubular Poles
- Sheet Metal Work ● Aluminium & Stainless Steel Fabrication
- Transmission Towers ● Structurals
- Mechanical Fabrication
- Platework-Pressing, Bending & Rolling
- Pressed Steel Tanks ● Forging and Stamping
- Chemical Plant and Equipment
- Welding : Stop-Arc-Resistance-Argon-Acetylene
- Heat Treatment, Painting & Stoving ● Galvanizing

OFFICE :
96, Garden Reach Road
Calcutta-23
Phone : 45-3991 (3 Lines)

FACTORY :
11, Goho Road,
P. O. Ghusuri, Howrah.
Phone : 66-3635 (2 Lines)

HIND GALVANIZING AND ENGINEERING CO. LTD.

All Round Service To Your Satisfaction

Life is a Spark of God

—Sree Sree Thakur Satyananda

NEW HOWRAH TRANSPORT CO.

218-B, Chittaranjan Avenue,

Calcutta-700006

সারা পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৪-৭৫ সালে স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ
আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ
স্বর্ণপদক বিজয়ী এবং
জেলার সব থেকে বড় কৃষি ঋণের প্রতিষ্ঠান

হুগলী ডিস্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

নেতাজী সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলী

সুদের হার :

সঞ্চয়ী আমানত :	$5\frac{1}{2}$ % বাৎসরিক হারে
স্থায়ী আমানত :	
৯১ দিন থেকে, ৬ মাস পর্যন্ত	$6\frac{1}{4}$ % " "
৬ মাস উর্দ্ধে ৯ মাসের কম	$7\frac{1}{4}$ % " "
৯ মাস থেকে ১ বছরের কম	$7\frac{1}{2}$ % " "
১ বছর " ৩ বছরের কম	$8\frac{1}{4}$ % " "
৩ বছর " ৫ বছরের কম	$9\frac{1}{4}$ % " "
৫ বছর এবং তদূর্দ্ধে	$10\frac{3}{4}$ % " "
রিজার্ভ ফাণ্ড আমানত	৯ % " "

প্রতি ছ' মাস অন্তর সুদের হিসাব করা হয়।

আমরা রি-ইনভেস্টমেণ্ট প্রকল্পে আমানত গ্রহণ করছি।

আমাদের শাখা অফিস :

আরামবাগ (সেফ ডিপজিট লকার সহ)		খানাকুল
চাঁপাডাঙ্গা	(ঐ)	তারকেশ্বর
খামারগাছি	(ঐ)	জাঙ্গীপাড়া
পাণ্ডুয়া	(ঐ)	ধনিয়াখালী
		চুঁচুড়া ॥

With the best compliments of :

ANGELO BROS., LIMITED.

WORLD'S LARGEST MANUFACTURER OF MACHINE MADE SHELLAC

Scientifically Manufacturing For International Consumption

Since 1855

SHELLACS

Regd. & Hd. Office:
11, Brabourne Road,
Calcutta-1

Phone : 22-1566
22-2389

"আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারও থাকে, তা সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দীপশিখার, দীপের নয়।"

'তন্তুজ'

বাংলার তাঁতের কাপড়

॥ গ্রামীন কর্মসংস্থান ও তাঁতশিল্পের প্রসারে বাংলার এই কুটীর শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করুন ॥

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

গ্রাম : কো-হ্যাণ্ডলুম

ফোন : ৩৫-৩৬৫৮
৫৫-৬৩৪৮

The Future belongs to the young. It is a young and new world which is now under process of development and it is the young who must create it India alone can lead the world to peace and a new world order. Our call is to young India. It is the young who must be the builders of the new world. I believe firmly that a great and united future is the destiny of this nation and its peoples.

—Sri Aurobinda

AMIN CHAND PAYARE LAL LTD.

APEEJAY HOUSE

15, PARK STREET,

CALCUTTA-7.0016

Space Donated by :

BALAGARH THANA LARGE-SIZED PRIMARY CO-OPERATIVE AGRICULTURAL MARKETING SOCIETY LTD.

P. O. PATULIGRAM　　DIST. HOOGHLY

BRANCHES : KHAMARGACHI, INCHURA, KAMARPARA

Dealers in all kinds of agricultural inputs, authorised agent of JUTE CORPN. OF INDIA LTD.

Whether the circumstance makes a man or man makes the circumstance is a riddle of the Sphinx.

—*Sree Sree Thakur Satyananda*

Reliance Firebrick & Pottery Co. Ltd.

CHANCH, POTTERIES, CHIRKUNDA, BEHAR.

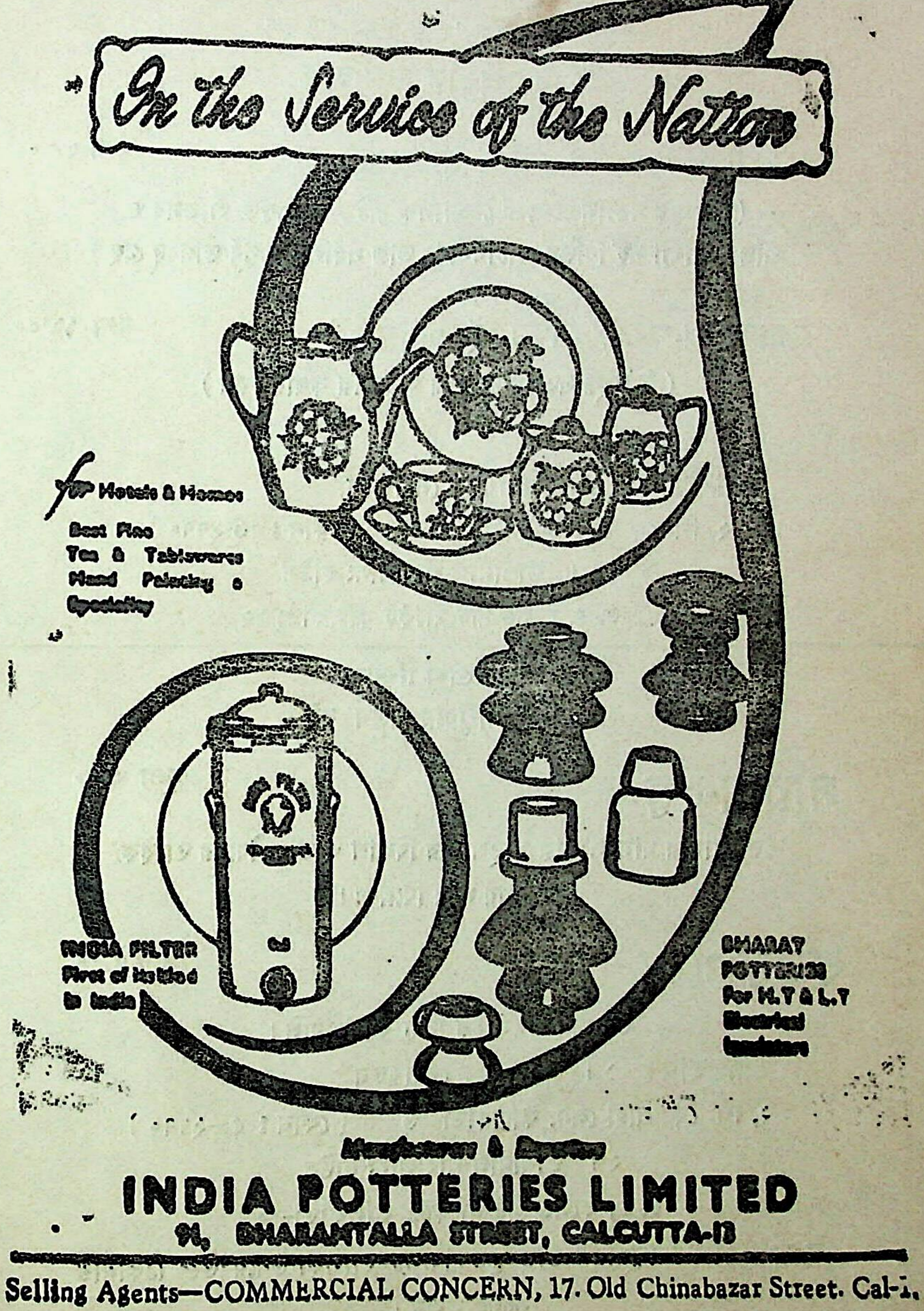

In the Service of the Nation
for Hotels & Homes
Best Fine Tea & Tablewares Hand Painting a Speciality
INDIA FILTER
First of its kind in India
BHARAT POTTERIES
For H.T & L.T Electrical Insulators
Manufacturers & Exporters
INDIA POTTERIES LIMITED
91, DHARAMTALLA STREET, CALCUTTA-13
Sole Selling Agents—COMMERCIAL CONCERN, 17. Old Chinabazar Street. Cal-1.

বহু আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থ প্রকাশিত হল

সাধনাপুরীর সঙ্কলিত

গীতার বাণী (২য় খণ্ড)   মূল্য ২০·০০

(শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত অভিনব ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সহ বিভিন্ন আচার্যগণের ভাষ্য সম্বলিত অপূর্ব ভাগবদ্ গ্রন্থ)

শ্রবণ-মঙ্গলম্ (৩য় খণ্ড)   মূল্য ১২·০০

(শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের অমৃতময় কথার চয়ন)

প্রাপ্তিস্থান : ১। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন,
২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ (ফোন : ৫৬-২৭৭০)
২। ন্যাশানাল পাবলিসিং হাউস,
৬৮এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

সদ্য প্রকাশিত

শ্রীঅর্চ্চনাপুরীর নতুন বই

সারদা-তত্ত্ব   মূল্য ৩·০০

শ্রীশ্রীমার মানবলীলায় মাতৃশক্তির বিকাশ ও ভাবজীবনের তাত্ত্বিক স্বরূপের মধুর বিশ্লেষণ।

কতকগুলো ঢেউ   মূল্য ৫·০০

উচ্চভাব ব্যঞ্জনাময় দিব্য কবিতাবলি।

প্রাপ্তিস্থান : ১। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ (ফোন : ৫৬-২৭৭০)
২। ন্যাশানাল পাবলিসিং হাউস,
৬৮এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

বিঃ দ্রঃ—শ্রীঅর্চ্চনাপুরীর অন্যান্য পুস্তকাবলির তালিকা উপরে উক্ত ঠিকানায় সংগ্রহ করুন।

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS

TOUGHENED GLASS

"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

Manufactured by :—

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,

CALCUTTA-22.

Gram : "DEVGLASS" PHONE : 45-0125 (3 Lines)

For

Complete Works

of

Swami Satyananda

In eight volumes

Under print

Price : Rs. 120·00

Please contact : Phone 56-2770

SREE RAMKRISHNA SEVAYATAN

2, P. K. SAHA LANE.

Calcutta-700036

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সেবায়তন, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও কমলা প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত (ফোন : ৩৪-২০৮৪)। মুদ্রাকর ও প্রকাশক-স্বামী উমানন্দ

বার্ষিক মূল্য টাঃ ৮·০০

মূল্য : তিন টাকা

We

DESIGN

and build industrial and domestic structures, warehouses, bridges incorporating Precast prestressed concrete components

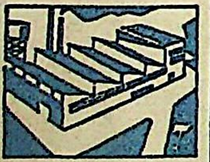

MAKE

TARFELT and SHALIMOID and other roofing felts and waterproof and damp-proof roofs, floors and basements

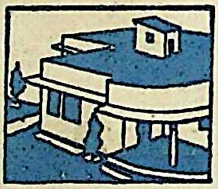

SUPPLY

anti-corrosive Bitumastic compositions for rust prevention

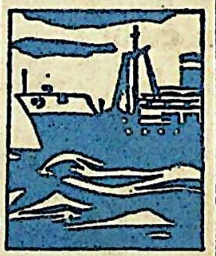

BUILD

roads with our Road Tar and Bitumen Emulsions

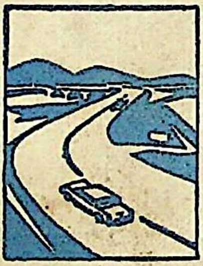

PROTECT

under-carriages of motor vehicles and insulation on vessels and pipes with our SHALIKOTES

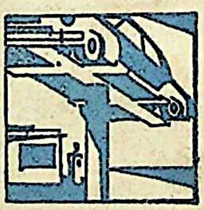

Stp SHALIMAR TAR

PRODUCTS (1935) LIMITED

CALCUTTA DELHI BOMBAY LUCKNOW CHANDIGARH

Sole Selling Agents—COMMERCIAL CONCERN | 17, Old Chinabazar Street, Calcutta-1

প্রচ্ছদ-শিল্পী :—ব্রঃ শঙ্কর চৈতন্য। যুগ্ম-পত্রিকা সচিব—স্বামী অরুণানন্দ ও স্বামী উমানন্দ। যুগ্ম-সম্পাদক—স্বামী নীলানন্দ ও ডক্টর সমীর ভট্টাচার্য্য। সহ-সম্পাদক—স্বামী হীরানন্দ ও স্বামী মৃগানন্দ। প্রচার সচিব—স্বামী সমানন্দ, স্বামী ভবেশ্বরানন্দ, স্বামী অমলানন্দ ও ব্রঃ তারক চৈতন্য।